Peace কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেন-দেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে
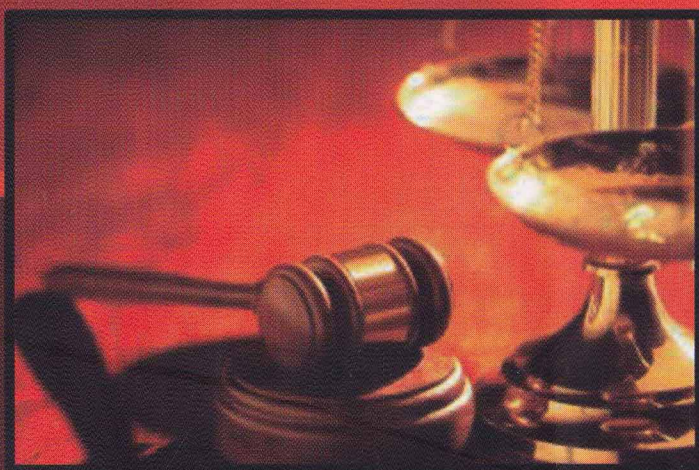
পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

রাসূল ﷺ লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতেন যেভাবে

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রাসূল ﷺ লেনদেন ও বিচার ফায়সালা করতেন যেভাবে

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

প্রকাশকাল : নভেম্বর – ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২২০.০০ টাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

২. মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান
গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

৩. মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

৪. আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ

৫. শহীদুল্লাহ খান আব্দুল মান্নান
সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

স ম্পা দ কী য়

হামদ ও সানা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যে যিনি তাঁর করুণার মাধ্যমে রাসূল ﷺ লেনদেন ও বিচার ফায়সালা করতেন যেভাবে নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতি। রুহের মাগফেরাত কামনা করছি যারা রাসূলের রেখে যাওয়া বিধানকে মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

মাবনতার মুক্তির জন্য রাসূল ﷺ এর বিচার ফায়সালা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যতদিন রাসূল ﷺ-এর বিচার ফায়সালার সমাজে বাস্তবায়িত না হবে ততদিন এ সমাজে শান্তি আসবে না। বর্তমান সমাজে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে অশান্তির দাবানল জ্বলছে।

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় যৎসামান্যই ইসলামের বিধান আছে। তাও সুযোগ-সুবিধার আলোকে আমরা গ্রহণ করে থাকি। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে আছে, কোন হত্যাকারীকে আদালত যদি ফাঁসির আদেশ দেয় রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিতে পারেন। এটা কুরআন ও হাদীসের খেলাফ। এ ফাঁসির আসামীকে কেবল নিহত ব্যক্তির ভাইই মাফ করতে পারে। রাষ্ট্রপ্রতির এ ক্ষেত্রে কোন অধিকার নেই।

আরেকটি বিষয় হলো পিতার মৃত্যুর পূর্বে যদি সন্তান মারা যায় তাহলে সন্তানের ছেলে-মেয়েরা অর্থাৎ নাতি-নাতনীরা শরীয়াত কর্তৃক তারা দাদার সম্পদ থেকে পাবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিষয়টিকে দাদার নৈতিক ভিত্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতিম নাতি-নাতনীরা দাদার ওয়াসিয়াতের মুখাপেক্ষী। দাদা সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করে যেতে পারেন। যদি নাতি-নাতনীরা এই অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠবে। কারণ যদি নাতি-

নাতনীরা ভিক্ষা করে তাহলে সমাজ বলবে অমুকের নাতি-নাতনীরা ভিক্ষা করছে। এখানে মূলত দাদারই অসম্মান হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষেত্রে অসিয়াতের সুযোগ রেখেছেন দাদার উপর এতিম নাতি-নাতনীর কল্যাণার্থে।

আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানের আলোকে বিচার ফায়সালা করিনা। কিন্তু দেখা গেছে মৌমাছিরা তাদের বাসায় মধু সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু তাদের মাঝে যে মৌমাছি মধু না এনে অন্য কিছু আনে রাণী মৌমাছি তার এ অপরাধের জন্য তার ঘাড় আলাদা করার নির্দেশ দেয়। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে লূত (আ) এর জাতি সমকামিতার কারণে ধ্বংস হয় আর সালেহ (আ) এর জাতি ওজনে কম দেয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। মূলত: এসব কারণে আল্লাহ্ তাআলা বিচার ফায়সালা করার পদ্ধতি দিয়েছেন মানবাধিকার সংরক্ষণ করার জন্য।

বইটি পরিমার্জনা করতে ইসলামের আলো, সৌদী আরব; ইসলামী প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ্, রিয়াদ ও ইসলাম হাউসের সহযোগিতা নিয়েছি বলে তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা।

বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে রাসূল (সা)-এর বিচার ফায়সালার পদ্ধতি আমাদের সমাজে বাস্তবায়িত করে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করার তাওফিক দিন আমিন।

সূচিপত্র

১. লেনদেন

হালাল ব্যবসায় কিছু চিত্র

কতিপয় হারাম বাণিজ্যের চিত্র

ফর্মা–০২; লেনদেন

২. কেসাস : অপরাধসমূহ

৩. দিয়াতসমূহ

৪. সাজা-দণ্ডবিধি

৫. বিচার-ফয়সালা

৬. ফরায়েজ

৭. বিবিধ

১. লেনদেন

আল্লাহর বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে দৌড়াও এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ছেড়ে দাও। উহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খোঁজ করবে। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। [সূরা–৬২ জুমু'আ আয়াত- ৯-১০]

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য

এবাদত ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ককে সুসংহত করে এমন সব এবাদতগুলোর মাধ্যমে যেগুলো আত্মা ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। অনুরূপভাবে সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে যেমন: বাণিজ্য, বিবাহ, উত্তরাধিকার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি। এ ছাড়া মানুষ ভাই ভাই হিসেবে নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে বসবাস করতে পারে।

দ্বীনের সর্ববৃহৎ মঙ্গল : আসমানী শরিয়তের মঙ্গলের মূল তিনটি :

প্রথম : বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিনিসকে দূরকরণ। একে জরুরিয়াত তথা আবশ্যকীয় বিষয় বলে।

দ্বিতীয় : কল্যাণ আমদানি করা। একে হাজিয়াত তথা প্রয়োজনীয় বিষয় বলে।

তৃতীয় : উত্তম চরিত্রের ওপর চলা। একে তাহ্সীনাত তথা সৌন্দর্য বিষয় বলে। আর আবশ্যকীয় বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করবে পাঁচটি জিনিস থেকে বিপর্যয় দূর করার মাধ্যমে। তা হলো: দ্বীন, জীবন, বিবেক, ইজ্জত সম্মান ও সম্পদ। আর মঙ্গল আমদানি সম্ভব প্রয়োজনীয় ও মানুষের মাঝের শরিকানাধীন বিষয়সমূহকে শরিয়তে জায়েযকরণে। যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ও অন্যান্যদের থেকে মঙ্গল আমদানি করতে পার। যেমন: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ভাড়া ইত্যাদি। আর উত্তম চরিত্রের প্রতি চলা উত্তম গুণের কার্যাদি করার দ্বারা সম্ভব যা সুন্দর জীবনকে বাড়ায়। এ ছাড়া জীবনে বয়ে আনে শান্তি, ভালবাসা ও নিরাপত্তা।

চুক্তিপত্রের প্রকারভেদ : চুক্তিপত্র তিন প্রকার

১. নিছক বিনিময়ের ওপর ভিত্তিশীল যথা: ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভাড়া ও কোম্পানী ইত্যাদি।

২. শুধুমাত্র অনুদানের ওপর ভিত্তিশীল যথা: হেবা-দান, সাদকা, ধার, জামানত ইত্যাদি।

৩. অনুদান ও বিনিময় উভয়ের ওপর ভিত্তিশীল যথা: ঋণ, এটা এক অর্থে সাদকা আবার অন্যদিকে তা বদলাও বটে কারণ; অনুরূপ বস্তু দ্বারা তা পরিশোধ করা হয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য: ইহা মালের বিনিময়ে মালের আদান-প্রদানের নাম যা মালিকানার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ : ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার। যথা– কতিপয় মানুষ আছে যারা ইনসাফের সাথে ব্যবসায় করে। আর কতিপয় আছে যারা ব্যবসায় জুলুম করে। আর কিছু সংখ্যক আছে যারা ব্যবসায় এহ্সান করে। অতএব, যে ব্যবসায়ী ইনসাফের সাথে বিক্রি করবে এবং ইনসাফের সাথে মূল্য গ্রহণ করবে সে না জুলুম করবে আর না কেউ তার প্রতি জুলুম করবে ইহা বৈধ। আর যে জুলুম ও অন্যায়ভাবে বিক্রি করবে যেমন: ধোকাবাজি, মিথ্যা ও সুদ ইত্যাদি ইহা হারাম। আর যে এহ্সানের সাথে বিক্রয় করবে, কেনাবেচায় উদার

হবে, পরিশোধে সময় দেবে, প্রতিশ্রুতি পূরণে তাড়াতাড়ি করবে এবং মূল্য বাড়াবে না। ইহা সর্বোত্তম প্রকার।

১. আল্লাহ্ তা'আলার বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কথা এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

[সূরা–১৬ নাহ্ল : আয়াত-৯০]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। [সূরা–২ বাকারা : আয়াত-২৭৫]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى -

৩. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়ে উদারপন্থা অবলম্বন করে। (বুখারী হাদীস নং ২০৭৬)

উপার্জনীয় কার্যাদি হালাল করার রহস্য : মুসলমান ব্যক্তি উপার্জনের যে কোন কাজ করলে সে তা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তা করে থাকে।

আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এতে নবী করীম ﷺ-এর সুন্নত জীবিত করাও সর্বোপরি নির্দেশিত উপায় অবলম্বনের কাজের উদ্দেশ্যে তা করে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং তাকে উত্তম খাতে তা ব্যবহার করার তওফিক দান করেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য বিধিবদ্ধ করার রহস্য : যেহেতু টাকা-পয়সা, পণ্য ও পোশাকাদি মানুষের মাঝে একেক ব্যক্তির নিকট একটা রয়েছে। আর এক জনের নিকটে বিদ্যমান বস্তুর প্রতি অন্যজনের প্রয়োজন রয়েছে যা সে প্রতিদান ছাড়া কাউকে দিতে সম্মত নয়। এছাড়াও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। নচেৎ মানুষ ছিনতাই, চুরি, টালবাহানা ও মারামারির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। তাই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সুবিধা অর্জন ও সমস্যা এড়ানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.

আল্লাহ (নির্দিষ্ট) ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। [সূরা–২ বাকারা : আয়াত- ২৭৫]

ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১. ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের সম্মতি থাকা। তবে কাউকে শরিয়তের কোন কারণে বাধ্য করাও জায়েজ হবে।

২. চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের আদান-প্রদানের যোগ্যতা থাকা যথা উভয়কে স্বাধীন, সাবালক ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

৩. বিক্রিত জিনিস এমন প্রকৃতির হওয়া চাই যা দ্বারা সাধারণভাবে উপকৃত হওয়া যায়। তাই যে জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না যেমন : মশা, তেলাপোকা অথবা যার উপকারিতা গ্রহণ করা হারাম যেমন : মদ ও শূকর অথবা যা বিশেষ প্রয়োজন ও কঠিন পরিস্থিতি ব্যতীত জায়েয নয় যেমন : কুকুর ও মৃত লাশ ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। তবে মৃত মাছ ও পঙ্গপালের বিষয় স্বতন্ত্র।

.৪ বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন অথবা বিক্রির সময় সে উদ্দেশ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়া চাই।

.৫ বিক্রিত পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের নিকট দেখে অথবা বিবরণ দ্বারা পরিচিত হওয়া চাই।

.৬ মূল্যের পরিমাণ প্রসঙ্গে জানা থাকা চাই।

.৭ বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর যোগ্য হওয়া চাই। তাই সাগরের পানিতে মাছ অথবা আকাশে উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি অনিশ্চিত পণ্য হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় এ সবের বেচাকেনা নাজায়েয। উল্লেখ্য যে, এসব শর্তাবলী উভয় পক্ষকে জুলুম, ধোঁকা এবং সুদ থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই নির্ধারিত করা হয়েছে।

মুশরেকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম : প্রতিটি মুসলিম ও বিধর্মীর সাথে শরিয়তে বৈধ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً قَالَ : لاَ بَيْعٌ، فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً .

আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম এমন সময় একজন এলোমেলো চুল বিশিষ্ট লম্বা আকৃতির মুশরিক ছাগল নিয়ে উপস্থিত হল। নবী ﷺ বললেন : বিক্রি না দান। লোকটি বলল, না, বরং বিক্রি। নবী করীম ﷺ তার থেকে একটি ছাগল ক্রয় করলেন।

(বুখারী হাদীস নং ২২১৬, মুসলিম হাদীস নং ২০৫৬)

যা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় : ক্রয়-বিক্রয় দু'টি পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়

১. **কথা দ্বারা :** ক্রেতা বলবে, আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম বা তোমাকে মালিক বানালাম ইত্যাদি। জবাবে ক্রেতা বলবে : আমি ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম ইত্যাদি শব্দ যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. **কাজ দ্বারা :** তা হচ্ছে আদান-প্রদান যথা এক পক্ষ বলবে : আমাকে ৫০০ টাকার গোশত দিন ফলে কোন কথা না বলেই তাকে দিয়ে দিল বা এমনি ধরণের প্রচলিত যে কোন পদ্ধতি হতে পারে যা দ্বারা সম্মতি লাভ হয়।

লেনদেনে সংযমের ফজিলত : মুসলমান ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার ও সকল ধরনের লেনদেন সুন্নতী পন্থায় সমাধা হওয়া আবশ্যক। ফলে সে সুস্পষ্ট হালালকে বেছে নিবে এবং এর দ্বারাই লেন-দেন করবে এবং হারাম ত্যাগ করবে

ও তা দ্বারা লেনদেন মোটেই করবে না। আর সন্দেহপর্ণূ বিষয় ত্যাগ করাই উচিত যাতে করে নিজের দ্বীন ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ হয় এবং হারামে যেন পতিত না হয়।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِىْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ، اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে "নিশ্চয় হালাল জিনিস সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দ্বয়ের মাঝে কিছু জিনিস রয়েছে সন্দেহজনক যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। বস্তুত : যে ব্যক্তি সন্দেহজনক জিনিস থেকে মুক্ত থাকল সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে হেফাজতে রাখল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হল সে হারামেই লিপ্ত হল। ইহা যেন ঐ রাখালের মত যে নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্বে পশু চরায় যা অচিরেই সে তাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। জেনে রাখ প্রত্যেক বাদশাহর নির্দিষ্ট চারণভূমি থাকে। আর আল্লাহর চারণ ভূমি হলো হারামকৃত বস্তুসমূহ। জেনে রাখ যে, প্রতিটি দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে সে সংশোধিত হলে দেহ সংশোধন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে বিনষ্ট হলে গোটা দেহ বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আর জেনে রাখ তা হচ্ছে অন্তর।

(বুখারী, হাদীস নং ৫২ ও মুসলিম হাদীস নং ১৫৯৯)

সন্দেহজনক সম্পদ যেখানে ব্যয় করতে হবে : সন্দেহপূর্ণ সম্পদ এমন সবখাতে ব্যয় করা উচিত যা দূর উপকারের কাজে লাগে। আর সর্বাপেক্ষা কাছের উপকার

হচ্ছে আহার্য তথা যা পেটে প্রবেশ করে। অত:পর যা পরিধেয় তথা যা পিঠ ঢেকে রাখা। এরপর যা বাহন জাতীয় যেমন : ঘোড়া ও গাড়ি ইত্যাদি।

হালাল উপার্জনের ফজিলত

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) খোঁজ করবে। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার। [সূরা–৬২ জুমু' আ আয়াত- ১০]

عَنِ الْمِقْدَامِ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَاِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ .

২. মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (রা) বলেন : কেউ তার হাতের কামাই অপেক্ষা উত্তম কোন উপার্জন খায় না। আর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতের কামাই খেতেন। (বুখারী, হাদীস নং ২০৭২)

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাগণ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন; কিন্তু যখনই তাদের সম্মুখে আল্লাহর কোন অধিকার হাজির হত তখন তা ক্রয়-বিক্রয় হোক আর বাণিজ্য হোক তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরাতে পারত না; বরং তাঁরা তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমাধা করেই ফেলতেন।

সর্বোত্তম উপার্জন : লোকভেদে উপার্জন ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তবে যার যার পরিস্থিতি অনুযায়ী তা মানানসই হওয়া উত্তম। এতে করে চাই তা কৃষিকাজ হোক আর শিল্পজাত কাজ হোক অথবা বাণিজ্য হোক বা চাকুরী যাই হোক না কেন তবে যেন শরীয়ত শর্ত সাপেক্ষে হয়। অনেকে আছে চাকুরীর যথাযথ হক আদায় করে না, তাহলে তার জন্য যতটুকু হক আদায় না হবে ততটুকু বেতন হালাল হবে না।

উপার্জন করার হুকুম : মানুষের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জনে পরিশ্রম করা ফরজ। যাতে করে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয় এবং

সেই সাথে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সুযোগ হয় ও মানুষের নিকট চাওয়া থেকে বিরত হতে পারে। বস্তুত : সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের রোজগার ও প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَاْتِىَ رَجُلًا فَيَسْاَلَهٗ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهٗ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে খড়ির বোঝা বেঁধে পিঠে বহন করে উপার্জন করে তাই তার জন্য ভাল, ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে কারো নিকট গিয়ে চাইলে তাকে দেয় অথবা দেয় না।

(বুখারী, হাদীস নং ১৪৭০ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪২)

ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতার ফজিলত : মানুষের জন্য তার লেনদন, আচার-অনুষ্ঠানে নরম ও সহজ এবং উদারতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে করে আল্লাহর দয়া অর্জন করে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضَى-

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দয়া করেন যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ও বিচার ফয়সালাতে উদারতার পরিচয় দেয়। (বুখারী, হাদীস নং ২০৭৬)

বেচা কেনায় অধিক হারে শপথ করার কুফল : বেচাকেনার ক্ষেত্রে শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রি হয় বেশি; অথচ এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلَفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

তোমরা অধিক পরিমাণে শপথ করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা এটা পণ্য বিক্রি করায় ঠিকই; কিন্তু পরিশেষে লাভ বিনষ্ট করে ফেলে। (মুসলিম হাদীস নং ১৬০৭)

ক্রয়-বিক্রয়ে সততা বরকতের কারণ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাচারিতা বরকত বিনষ্ট করে দেয়।

জীবিকার চাবিকাঠি ও উপায়

আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি ও উপায়

গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা

১. আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) প্রসঙ্গে বলেন

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ـ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ـ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا -

আমি বললাম তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের আরো সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে। আর তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদ-নদী প্রস্তুত করবেন। [সূরা নূহ : আয়াত-১০-১২]

২. আল্লাহ তা'আলা হূদ (আ) প্রসঙ্গে বলেন–

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ -

হে আমার সম্প্রদায় তোমরা (স্বীয় গুনাহের জন্যে) তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা চাও। অত:পর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি দ্বারা তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করবেন। আর তোমরা পাপে লিপ্ত থেকে মখু ফিরিয়ে নিও না।

[সূরা–১১ হূদ : আয়াত– ৫২]

২. **জীবিকা অন্বেষণে সকাল সকাল বের হওয়া :** অতি ভোরে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হওয়া প্রয়োজন, কারণ রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا.

হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকাল বেলায় তুমি বরকত দান করুন।

(আবু দাঊদ হাদীস নং ২৬০৬ ও তিরমিযী হাদীস নং ১২১২)

৩. দোয়া করা

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ط أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

আর আমার বান্দাগণ যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার বিষয়ে বস্তুত : আমি রয়েছি অতি নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার বিধান পালন কর এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। [সূরা-১১ বাকারা : আয়াত-১৮৬]

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ -

ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন : হে আল্লাহ, আমাদের রব আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সকলের জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রিযিক দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।
[সূরা-৫ মায়েদ : আয়াত-১১৪]

৪. আল্লাহভীতি

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا لا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্যে বিকল্প পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন পথে জীবিকা দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।
[সূরা-৬৫, তালাক : ২-৩]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের উদ্দেশ্যে আসমান-জমিন থেকে বরকতের দরজাসমূহ খোলে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করলাম। [সূরা- আ'রাফ : আয়াত-৯৬]

৫. পাপ পরিহার করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

জলে-স্থলে বিপর্যয় প্রকাশিত হয়েছে যা মানুষের হাতের কামাই, যেন তিনি (আল্লাহ) তাদের কৃতকর্মের কিছু উপভোগ করান, যাতে করে তারা ফিরে আসে।

[সূরা–৩০ রূম : আয়াত-৪১]

৬. আল্লাহর ওপর ভরসা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَئٍْ قَدْرًا-

যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট অবশ্যই আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

[সূরা–৬৫ তালাক :আয়াত– ৩]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

২. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যদি আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদের এমনভাবে জীবিকা দান করতেন যেমনি দান করেন পাখিকে। পাখি সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে প্রত্যাবর্তন করে।

(তিরমিযী হাদীস নং ২৩৪৪ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪১৬৪)

৭. আল্লাহর এবাদতের জন্যে মনোযোগী হওয়া

এর অর্থ : এবাদতকালে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্তরকে হাজির রাখা ও তাতে মনযোগ ও মিনতির সৃষ্টি করা।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَا قَلْبَكَ غِنًى، وَاَمْلَا يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تَبَاعَدْ مِنِّىْ فَاَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَاَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا.

মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের বরকতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাশীল পালনকর্তা এরশাদ করেন : হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য একান্তভাবে মনোযোগী হও, তবে আমি তোমার অন্তরকে পূর্ণভাবে অভাবমুক্ত করে দিব এবং তোমার হাতকে জীবিকা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব। হে আদম সন্তান! তুমি আমার থেকে দূরে সরে যেওনা। তাহলে আমি তোমার অন্তরকে অভাব দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার হাতকে কাজ দ্বারা পূর্ণ করে দিব।

(হাকেম হাদীস নং ৭৯২৬ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাদীস নং ১৩৫৯)

৮. অধিক পরিমাণে হজ্ব উমরা পালন করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :তোমরা পরপর হজ্ব এবং উমরা করতে থাক। কেননা এ দু'টি কাজ অভাব ও পাপরাশি এমনভাবে দূর করে যেমন হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর কবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত-ব্যতীত আর কিছুই নয়। (তিরমিযী হাদীস নং ৮১০, মুসনাদে আহমাদঃ ৮/২২ ও ৬৫০ নাসাঈ হাদীস নং ২৬৩১)

৯. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ –

তোমরা কল্যাণের রাস্তায় যা খরচ কর আল্লাহ্ তার স্থলে বিনিময় দিয়ে দেন। আর তিনিই উত্তম জীবিকা দানকারী। [সূরা–৩৪ সাবা : আয়াত-৩৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ : تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন : হে আদম সন্তান তুমি খরচ কর তবে আমি তোমার জন্য খরচ করব। (মুসলিম হাদীস নং ৯৯৩)

১০. দ্বীনের জ্ঞানার্জনে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য খরচ করা

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرْزَقُ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিল, তাদের একজন নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হত আর অপরজন বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। ব্যবসায়ী ভাই অপর ভাই প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন : তার কারণেই হয়তো তোমাকে জীবিকা দান করা হয়। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং ২৩৪৫)

১১. আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা

এ হচ্ছে নিকট আত্মীয়দের সাধ্যমত উপকার সাধন করা ও কষ্ট লাঘব করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُبْسَطَ لَهٗ فِيْ رِزْقِهٖ اَوْيُنْسَاَ لَهٗ فِيْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে আনন্দচিত্তে ইহা চায় যে তার জীবিকা বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং তার আয়ু বাড়ানো হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

(বুখারী, হাদীস নং ২০৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ২৫৫৭)

১২. দুর্বলদেরকে সম্মান ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ : رَأى سَعْدٌ (رضى) اَنَّ لَهٗ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ.

১. মুস'আব ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ (রা) তার অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের ওপর তার মর্যাদার কথা চিন্তা করেন। তখন নবী করীম ﷺ তাকে বলেন : তোমরা দুর্বলদের মাধ্যমেই সাহায্য ও জীবিকা পেয়ে থাক। (বুখারী, হাদীস নং ২৮৯৬)

اِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاِخْلَاصِهِمْ.

২. হাদীসের অপর বর্ণনায় রয়েছে : আল্লাহ্ এ উম্মতকে কেবল দুর্বলদের দোয়া, সালাত ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই সাহায্য করে থাকেন।

(হাদীসটি সহীহ্, নাসাঈ হাদীস নং ৩১৭৮)

১৩. আল্লাহর রাস্তায় হিজরত

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً - وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

আর যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে সে জগতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতাপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হিজরত করত: মৃত্যু মুখে পতিত হবে, নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত হবে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [সূরা–৪ নিসা : আয়াত- ১০০]

১৪. লেনদেনে সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার হুকুম : মানুষের মাঝের সকল লেনদেনে সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ওয়াজিব। সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতা ও অন্যান্য সকলের প্রতি সততা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা ওয়াজিব। এর দ্বারা ব্যবসায় বরকত অর্জন হয় এবং তা এবাদতে পরিণত হয় যার ফলে এতে প্রতিদান ও সওয়াব মিলে। বিক্রেতার পক্ষ থেকে সততা হলো : কাংখিত গুণাগুন এবং দরদাম কত ইত্যাদি বর্ণনা করা। এর সাথে অপছন্দনীয় দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো : সঠিকভাবে মূল্য পরিশোধ করা। বর্ণনা অনুযায়ী যদি পণ্য হয় তাহলে সত্যবাদী হবে আর যদি কাংখিত গুণাগুনের বর্ণনা অনুযায়ী না হয় তাহলে মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি ত্রুটি প্রকাশ করে পণ্য বিক্রি করে তাহলে বিক্রেতা প্রকাশকারী ও গোপন করে না বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করে তাহলে গোপনকারী ও অপ্রকাশকারী বলে প্রমাণিত হবে। আর বরকত শুধুমাত্র সত্যবাদি ও প্রকাশকারীর জন্যেই নির্দিষ্ট।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

হাকীম ইবনে হেজাম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (রা) ইরশাদ করেছেন : বিক্রেতা ও ক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রিত বস্তু নেয়া না নেয়ার এখতিয়ারে থাকবে। যদি দুজনে সত্য বলে ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হবে। আর যদি দুজনে গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।

(বুখারী হাদীস নং ২০৮২, মুসলিম হাদীস নং ১৫৩২)

হালাল ব্যবসার কিছু চিত্র

১. **তাওয়াল্লিয়াহ ব্যবসা :** ইহা হচ্ছে বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে পণ্যটি যে মূল্যে ক্রয় করেছি সেমূল্যেই মালিক বানিয়ে দিলাম।

২. **মুরাবাহাহ ব্যবসা :** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা পঞ্চমাংশ লাভে বিক্রয় করলাম।

৩. **মুও য়াযা'য়াহ ব্যবসা :** বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, আমি তোমাকে উহা দশমাংশের লোকসানে বিক্রয় করলাম।

৪. **মুসাওয়ামাহ ব্যবসা :** পণ্যের মূল্য উল্লেখ করা থাকবে। অত:পর বিক্রেতা সে মূল্যে রাজি হলে ক্রেতা উহা ক্রয় করবে।

৫. **শরীকের ব্যবসা :** ক্রেতা পণ্য কব্জা করে বলবে, আমি যা ক্রয় করেছি তোমাকে তার অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশের শরীক বানালাম।

৬. **মুবাদালাহ ব্যবসা :** একটি পণ্যের বিনিময়ে অপর একটি পণ্য বিক্রি করা। একে মুকায়াযাহও বলে।

৭. **মুজায়াদাহ ব্যবসা :** পণ্য মানুষের মাঝে ডাকে উঠিয়ে সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা বিক্রি করা।

কতিপয় হারাম বাণিজ্যের চিত্র

ইসলাম প্রত্যেক ঐ বস্তুকে জায়েয ঘোষণা করেছে যা কল্যাণ-বরকত ও বৈধ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে এমন কিছু ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছে যাতে রয়েছে দাগাবাজি, ধোঁকাবাজি অথবা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি বা মনোমালিন্য বা ঠকবাজি, মিথ্যাচারিতা অথবা দেহ ও বিবেকের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি। এ সব ব্যাপার যা পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, মনোক্ষুন্নতা ও ক্ষতির জন্ম দেয়। ফলে এসব ব্যবসায় হারাম হয়ে যায় এবং তা মোটেও সঠিক হয় না তন্মধ্যে যেমন :

১. **মুলামাসা তথা স্পর্শ করা জাতীয় ব্যবসা :** যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে : তুমি যে কাপড়টি স্পর্শ করবে তা তোমাকে দশ টাকাতে দেয়া হবে। এ জাতীয় ব্যবসায় হারাম; কারণ এতে অজানা ও ধোঁকার বিষয়ে রয়েছে।

২. **মুনাবাজা তথা ঢিল মারা জাতীয় ব্যবসা :** যেমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলবে : তুমি যে কাপড়টিই আমার প্রতি ছুড়ে মারবে তাই আমি এত টাকা দিয়ে নিতে বাধ্য। এ ব্যবসায়ও হারাম কারণ, এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৩. **হাসাত তথা পাথর নিক্ষেপ জাতীয় ব্যবসা :** যেমন বিক্রেতা বলবে এ পাথরটি নিক্ষেপ কর, ফলে পাথর যে কাপড়টির উপর পড়বে তা তোমাকে এত টাকায় দেয়া হবে। এ ব্যবসায়ও সঠিক নয় কারণ; এতেও অজানা ও ধোঁকা রয়েছে।

৪. **নাজাশ তথা মূল্য বৃদ্ধি জাতীয় ব্যবসা :** এটা হলো ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীতই দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বাড়ানো। এ ব্যবসায়ও হারাম কারণ; এতে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা রয়েছে।

৫. **গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রি :** গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজার দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করা। এ জাতীয় বিক্রয় সঠিক নয়; কেননা এতে লোকজনের ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি শহুরে ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের আবেদন জানায় তাহলে সে তা করতে পারে।

৬. **পণ্য হাতে বুঝে না পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা :** এটি হালাল ব্যবসা নয়; কেননা এটা ঝগড়া ও লেনদেন ভঙ্গ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত: বিক্রেতা যখন দেখবে যে ক্রেতা এতে লাভবান হতে যাচ্ছে।

৭. **ঈনা ব্যবসা :** ইহা হলো : কারো নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বাকিতে কোন পণ্য বিক্রয় করত : উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম দামে নগদ মূল্যে তা ক্রয় করা। ফলে এতে এক ব্যবসাতে দুই ব্যবসায় একত্র করা হয় যা হারাম; কেননা এ হচ্ছে সুদের পথ প্রদর্শক। কিন্তু যদি তার মূল্য হাতে পাওয়ার পর অথবা পণ্যের গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার পর তা ক্রয় করে অথবা ক্রেতা ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে।

৮. **কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় (মুসলমান) ভাইয়ের ব্যবসার ওপর নিজ ব্যবসা চালিয়ে দেয়া :** যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে কোন পণ্য ক্রয় করল ইতিমধ্যে লেনদেন শেষ না হতেই অপর এক ব্যক্তি এসে বলল : আমি তোমার নিকট উক্ত পণ্য নয় টাকাতে বা ক্রয় মূল্যের কমে বিক্রয় করব। এমনিভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি দশ টাকায় বিক্রয়কারী ব্যক্তিকে বলে আমি তোমার নিকট থেকে এটা পনের টাকায় ক্রয় করব, যাতে প্রথম ব্যক্তি তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। উক্ত ব্যবসাও হারাম; কারণ এতে মুসলমানদের ক্ষতি ও পারস্পরিক মনোমালিন্য বিদ্যমান আছে।

৯. **দ্বিতীয় আজানের পর ব্যবসায় করা হারাম :** যার ওপর জুমার নামাজ ফরজ দ্বিতীয় আজানের পর তার জন্য ব্যবসা করা হারাম এবং তার জন্য কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করাও চলবে না।

১০. **প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসায় হারাম :** যেমন : মদ, শূকর, মূর্তি-প্রতিমা। অথবা যা হারামের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় যেমন : বাদ্যযন্ত্র এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম।

১১. **অজানা ও ধোকার ব্যবসায় :** আরো হারাম ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা হচ্ছে : "হাবলুল হাবলা" ও "মালা-কীহ" তথা মায়ের গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়। ঠিক তদ্রুপ "মাযামীন" তথা ষাঁড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্যের ব্যবসায়, নর উটের পাল দিয়ে উপার্জন এবং পাল দেওয়ার জন্য নর পশু ভাড়া দেয়া। অনুরূপভাবে কুকুর, বিড়ালের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন, জ্যোতিষীর কামাই। এমনিভাবে অস্পষ্ট ও ধোঁকার সাহায্যে ব্যবসা। অনুরূপ যে জিনিস অর্পণ করা অসম্ভব যেমন : আকাশে উড়ন্ত পাখি।

১২. **পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় :** ফল বা ফসল পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি করা হারাম। পরবর্তীতে এর বিধান আসবে।

শরীয়তে হারাম জিনিসের প্রকার : শরীয়তে হারাম জিনিস দুই প্রকার

১. **বস্তুটির মূল হারাম :** যেমন মৃত জীবজন্তুর রক্ত, শূকরের মাংস, নোংরা ও অপবিত্র জিনিস ইত্যাদি।

২. **ব্যবহার নীতিমালায় হারাম :** যেমন সুদ, জুয়া, বাজি খেলা, মজুদদারী, প্রতারণা ও ঠকবাজি এবং ধোঁকা ইত্যাদি ব্যবসায়। এগুলোতে রয়েছে জুলুম ও বাতিল উপায়ে মানুষের মাল ভক্ষণের ব্যবস্থা। বস্তুত : প্রথম প্রকারটিকে অন্তর ঘৃণা করে পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারটিকে অন্তর পছন্দ করে। তাই এটি এমন হুমকিধমকি ও শাস্তির দাবী রাখে যা তাতে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

এজমালী বস্তুর ব্যবসার বিধান : যখন কোন অংশীদার তার শরিকানা জিনিস বিক্রয় করবে তখন তার অংশের মূল্য দ্বারা সে অংশের বিক্রয় জায়েয হবে। আর ক্রেতা অজ্ঞতাবশত : ক্রয়ের ফলে তার এখতিয়ার থাকবে।

পানি, ঘাস ও আগুন বিক্রয় করার হুকুম : তিনটি বিষয়ে মুসলমান সমাজ সমানভাবে অংশীদার। যথা : পানি, ঘাস ও আগুন। তাই আসমান ও ঝর্ণার পানির ব্যক্তি মালিকানা নাজায়েয এবং তার বিক্রয় ও নাজায়েয। তবে তাকে

নিজ মশকে অথবা পুকুর ইত্যাদিতে আটক করলে জায়েয। ঠিক ঘাস জমিতে থাকা পর্যন্ত চাই তা তাজা হোক আর শুকনা হোক তার বিক্রি নাজায়েয। এমনিভাবে আগুন চাই তা ইন্ধন জাতীয় হোক যেমন কাঠ অথবা অগ্নিশিখা হোক যেমন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাও বিক্রয় করা নাজায়েয। কেননা এসব জিনিস এমন যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক করে দিয়েছেন। তাই এর প্রয়োজন বোধকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা খরচ করা উচিত এবং এ থেকে বারণ করা হারাম।

বিক্রীত পণ্যে কম বা বেশি হওয়ার হুকুম

১. যখন কোন ব্যক্তি ঘর বিক্রয় করবে তখন এতে জমি, তার উপর বিদ্যমান জিনিস ও নিচে যা রয়েছে সহ প্রত্যেক বস্তুকে বুঝাবে। আর যদি বিক্রিত জিনিস জমি হয়, তবে এতে কোন বস্তুকে পৃথকভাবে উল্লেখ না করলে তাতে বিদ্যমান সব বস্তুই বুঝাবে।

২. যখন কোন ঘর এ ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে যে, তার পরিমাণ ১০০ মিটার। পরে দেখা গেল যে তা কম বা বেশি তবে তা বিশুদ্ধ হবে। বেশি অংশ বিক্রেতার পাওনা থাকবে। আর কমের হিসাবও তার ওপর বর্তাবে। আর যে তা জানবে না তার উদ্দেশ্যেও অর্জন হবে না। তার জন্য লেনদেন করা না করারও এখতিয়ার থাকবে।

বিক্রয় ও ভাড়া একত্রে করার হুকুম : যখন বিক্রয় ও ভাড়া উভয়কে এক সাথে করে বলবে আমি উক্ত ঘর তোমার নিকট এক লক্ষ টাকা দ্বারা বিক্রয় করলাম এবং এ ঘরটি দশ হাজার দ্বারা ভাড়া দিলাম। অত:পর প্রতিপক্ষ বলল : আমি গ্রহণ করলাম তবে বিক্রয় ও ভাড়া উভয়ই বিশুদ্ধ হবে। বিনিময়ভাবে যদি বলে আমি তোমার নিকট এ ঘরটি বিক্রয় করলাম ও এ ঘরটি ভাড়া দিলাম এক লক্ষ টাকা দ্বারা তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর প্রয়োজনে উভয়ের বিনিময় কিস্তিতে দেওয়া চলবে।

ব্যবসায়ী দোকান-পাট থেকে হাদিয়া গ্রহণের হুকুম : ব্যবসায়ী দোকানগুলো থেকে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যে সব পুরস্কার ও উপহার দেওয়া হয় তা হারাম; কারণ ইহা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে অন্যদের ছেড়ে তাদের নিকট থেকে ক্রয় করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আর পুরস্কারের লোভে অপ্রয়োজনীয় বা হারাম জিনিস ক্রয় করে অপর ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মু'মিনগণ! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এসব অপবিত্র, শয়তানের কাজ তাই তা পরিহার কর যেন তোমরা কৃতকার্য হতে পার।

[সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-৯০]

অশ্লীল ও বেহায়া পত্র-পত্রিকা বিক্রি করার হুকুম : যে সব পত্র-পত্রিকায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রতি ডাকে এবং ভিডিও বা সিডি ও অডিও ক্যাসেট যাতে গান-বাজনা রয়েছে। ঠিক যে সব (যন্ত্রের পর্দায়) গান-বাদ্য, নাটক ও বেপর্দাভাবে নারীদের ছবি প্রকাশ পায়। এ ছাড়া কাজে, কথা ও নির্লজ্জজনক আলাপ-আলোচনা যা নোংরা পথে ডাকে তার ক্রয়-বিক্রয় সবই হারাম। অনুরূপভাবে তার শ্রবণ, দর্শন তা দ্বারা উপার্জন বলতে যা বুঝায় সবই হারাম যা মোটেও জায়েয নয়।

ব্যবসায়িক বীমার হুকুম : ব্যবসায়িক বীমা এমন একটি বন্ধনের নাম যেখানে যার জন্য বীমা করা হয়, সে কোন বিপদ বা ঘাটতিতে পতিত হলে যার নিকট বীমা করা হয় সে ব্যক্তি তাকে নির্দিষ্ট আর্থিক বিনিময় দিবে। বীমাকারীর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের বিনিময়ে বীমা হয়। ইহা হারাম; কারণ এতে ধোঁকা ও অজানার বিষয় বিদ্যমান। এ হচ্ছে এক ধরনের জুয়া যা দ্বারা বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণ করা হয়। চাই তা জীবনের উপর হোক বা কোন পণ্য কিংবা হাতিয়ারের উপর হোক।

যা দ্বারা ক্ষতি হয় তা বিক্রয় করার হুকুম : যে ব্যক্তি রস দ্বারা মদ তৈরী করবে তার নিকট তা বিক্রয় করা নাজায়েয। ঠিক ফিৎনার কাজে অস্ত্র বিক্রয় করা বা মৃত ব্যক্তির সাথে জীবিত ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও নাজায়েয।

ব্যবসায় শর্ত করার হুকুম : যে ব্যবসা এমন শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয় যা দ্বারা কোন হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল না করা হয় তা সঠিক। যেমন বিক্রেতা ঘরে এক মাস অবস্থানের শর্ত করল অথবা ক্রেতা কাঠ-খড়ি নেয়া ও ভাঙ্গা ইত্যাদির শর্ত করল।

মাশ'আরুল হারামের কোন ভূমি ভাড়া বা বিক্রয় করার হুকুম : মিনা, মুযদালিফা ও আরাফা এগুলো মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থান যা সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই এসব স্থানের বিক্রয় কিংবা ভাড়া কোনটাই বৈধ নয়। যে এমনটি করবে সে অপরাধী, পাপী ও জালিম এবং তার উপর গৃহীত অর্থ তার জন্য হারাম হবে।

কিস্তিতে বিক্রয়ে হুকুম : কিস্তিতে বিক্রি এটি বাকিতে বিক্রির একটি প্রকার। (পার্থক্য শুধু এই) বাকিতে বিক্রি এক মেয়াদ দেরী হয়। আর কিস্তিতে বিক্রয় একাধিক মেয়াদে দেরী হয়ে থাকে।

১. দেরীতে ও কিস্তির ফলে পণ্যের মূল্য বাড়ানো জায়েয । যেমন : নগদে বিক্রিত যে পণ্য একশত টাকায় আসে তা একশত বিশ টাকায় বিক্রয় করা। এক মেয়াদ বা একাধিক মেয়াদের ভিত্তিতে। তবে শর্ত এই যে, খুব বেশি যাতে বাড়ানো না হয় এবং অপারগদের (দুর্বলতাকে) ব্যবহার না করা হয়।

২. দেরীতে বা কিস্তিতে বিক্রিতে ক্রেতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকলে তা হবে মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। তাই মেয়াদের কারণে যেন মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটায় এর ফলে বিক্রেতাকে এহসানের ওপর প্রতিদান দেয়া হবে। তবে লাভ ও পরিবর্তনের ইচ্ছা করলেও তা বৈধ হবে এমতাবস্থায় মেয়াদের উপর মূল্য বাড়াতে পারবে যা নির্দিষ্ট মেয়াদী নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

৩. ক্রেতা কিস্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করতে পারলে বিক্রেতার পক্ষে মূল্য বৃদ্ধি নাজায়েয। তবে সে পূর্ণ মূল্য আদায় করা পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য নিজের কাছে জমা রাখতে পারে।

বাগান বিক্রির হুকুম

১. যদি এমতাবস্থায় কোন জমি বিক্রি করে যে, তাতে খেজুর বা অন্য কোন গাছ রয়েছে, তবে খেজুর গাছের বাঁধন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও গাছের ফল প্রকাশ পেয়ে গেলে তা বিক্রেতার জন্য থাকবে। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে থাকে, তাহলে এটা তার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি খেজুর গাছের বাঁধন কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে আর তাতে ফল প্রকাশ না পায়, তবে তা ক্রেতার জন্য থাকবে।

২. খেজুর বৃক্ষসহ অন্য কোন গাছের ফল-ফসল না পাকা পর্যন্ত তার বিক্রি বৈধ নয়। তবে গাছ-পালাসহ ফল ও জমিসহ সবুজ ফসল যদি পোক্ত না হতেই বিক্রি করে তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৩. কোন ব্যক্তি ফল ক্রয় করে তা কাটা কিংবা ভাগ করা পর্যন্ত কোনরূপ গড়িমসি বা বিলম্ব ছাড়া বৃক্ষের উপর রেখে দেয়া অবস্থায় যদি কোন আসমানী আপদ যেমন : বাতাস বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি দ্বারা তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তবে এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা ফেরত নিতে পারবে। আর যদি কোন মানুষ তা বিনষ্ট করে তবে ক্রেতার পক্ষে চুক্তি ভঙ্গ করা, বাস্তবায়ন করা ও বিনষ্টকারীর নিকট তার ক্ষতিপূরণ চাওয়া এর যে কোনটার অধিকার থাকবে।

মুহাকালার হুকুম : এ হচ্ছে পুক্ত শস্য শিষে থাকা অবস্থায় অনুরূপ শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা। ইহা জায়েয নয়, কেননা এতে দু'টি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে।

এক : পরিমাণ ও উৎকৃষ্টতা প্রসঙ্গে অজানা।

দুই : সমান সাব্যস্ত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকা।

মুজাবানার হুকুম : এ হচ্ছে মাপা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রয় করা। এটাও মুহাকালার মতই নাজায়েয।

'আরায়া বিক্রির হুকুম : খেজুর গাছে বিদ্যমান খেজুরের পরিবর্তে পুরানো খেজুর ক্রয় করা নাজায়েয; কেননা এতে ধোঁকা ও সুদ রয়েছে। তবে প্রয়োজনে "আরায়া" তথা পাঁচ অসকের কমে উক্ত লেনদেন এ শর্তে চলবে যে, চুক্তি বৈঠকে যেন লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায়।

মানুষের কোন অংশ বিক্রয় করার হুকুম

১. মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ জীবিত বা মৃত অবস্থায় বিক্রি করা নাজায়েয। তবে একান্ত বাধ্য হয়ে কেউ নিতে চাইলে যদি মূল্য ছাড়া তা না পায়, তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে তা দেয়া বৈধ হবে। তবে ক্রেতার পক্ষে তা গ্রহণ করা হারাম। যদি মৃত্যুর পরে দান বলে কোন মুখাপেক্ষীকে কোন অংশ দান করে থাকে এবং তার জীবদ্দশায় কোন পুরস্কার গ্রহণ করে তবে তাতে কোন বাধা নেই।

২. চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রক্ত বিক্রি করা নাজায়েয। কিন্তু যদি কেউ তার মুখাপেক্ষী হয় এবং মূল্য ছাড়া তা অর্জন করতে না পারে তাহলে বিনিময় দিয়ে তা গ্রহণ বৈধ; কিন্তু দানকারীর পক্ষে তা গ্রহণ হারাম।

ধোঁকার অর্থ : গারার (ধোঁকাবাজি) বলতে বুঝায় যার সঠিক তথ্য মানুষ থেকে গোপন রাখা ও তাকে মূল রহস্য জানতে না দেওয়া। যেমন : অস্তিত্বহীন জিনিস কিংবা অসম্ভব জিনিস। এ সব বিষয় ধোঁকা হিসেবে পরিগণিত।

ধোঁকার ব্যবসা ও জুয়া খেলার হুকুম : ধোঁকা, জুয়া ও বাজিধরা ইত্যাদি এমন সব লেনদেনের নাম যা ভয়ানক ধ্বংসাত্মক এবং হারাম। এ সব বড় বড় ব্যবসায়ীর ঘরকে বিনষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে কত মানুষকে পরিশ্রম ছাড়াই ধনাঢ্য বানিয়েছে। আবার কত মানুষকে পথের ফকির বানিয়ে আত্মহত্যা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের পথে ঠেলে দিয়েছে। এক কথায় এ সব হচ্ছে শয়তানের কাজ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ –

শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে। তবে কি তোমরা ফিরে আসবে? [সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-৯১]

ধোঁকার ব্যবসার বিপর্যয় : ধোঁকার ব্যবসায় দু'টি সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে–

১. মানুষের ধন-সম্পত্তি বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা। তাই কেউ কোন ধরনের লাভ ছাড়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকে অথবা ক্ষতি ছাড়াই লাভবান হতেই থাকে; কেননা এটা বাজি ও জুয়ার নামান্তর।

২. ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মধ্যে ঘৃণা, হানাহানি আর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

২. খিয়ার (চুক্তি ভঙ্গের অধিকার)

"খিয়ার" বিধিবদ্ধকরণের রহস্য : বাণিজ্যে চুক্তিভঙ্গের অধিকার এটি ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম একটি দিক। কেননা কখনও মূল্যের কথা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ করে ক্রয়-বিক্রয় কাজ সমাধা হয়ে থাকে। ফলে উভয় পক্ষ অথবা এক পক্ষ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছে একেই "খিয়ার" বলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা বহাল রাখার যে কোন একটি মত বাছাই করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

হাকীম ইবনে হিজাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত আলাদা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে (চুক্তি রাখা, না রাখার) অধিকার রাখে। ফলে যদি উভয়ে সত্য বলে ও সব কথা খুলে বলে তাহলে উভয়ের বেচা-কেনায় বরকত দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তবে উভয়ের ব্যবসার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস নং ২০৭৯, মুসলিম হাদীস নং ১৫৩২)

খিয়ারের প্রকারভেদ : "খিয়ার"-এর বহু প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে–

১. **বৈঠকের খিয়ার :** এটা ব্যবসায়, মীমাংসা ও ভাড়া ইত্যাদি মাল সংক্রান্ত আদান-প্রদান সাব্যস্ত রয়েছে। এটি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার। এর মেয়াদ হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া থেকে সশরীরে আলাদা হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু উভয়ে যদি তা বাদ করে দেয় তবে বাদ হয়ে যাবে। আর একজন বাদ করলে অপরজনের অধিকার থেকে যাবে। তাই যখন আলাদা হয়ে যাবে চুক্তি চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আর বৈঠক থেকে এ ভয়ে উঠে পড়া হারাম যে, না জানি (অপর পক্ষ) চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে।

২. **শর্তের খিয়ার :** এটা এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা যে কোন একজন নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত "খিয়ারের" শর্ত করলে তা সঠিক হবে যদিও সময়সীমা দীর্ঘায়িত হয়। এর সময়সীমা চুক্তির সময় থেকে শর্তকৃত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। সময়সীমা পার হওয়া পর্যন্ত শর্তারোপকারী যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে তবে লেনদেন নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়ে মেয়াদের ভেতরে "খিয়ার"-এর শর্ত তুলে নেয় তবে "খিয়ার" বাতিল বলে বিবেচিত হবে কেননা এখানে অধিকার তাদেরই ছিল।

৩. **ক্রেতা-বিক্রেতার মতনৈক্যের "খিয়ার" :** যেমন : মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য হল কিংবা মূল পণ্য অথবা তার গুণাগুণে মতবিরোধ দেখা দিলে এবং তাতে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেল এমতাবস্থায় বিক্রেতার কথাই

শপথসহ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে ক্রেতাকে তা গ্রহণ কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে।

৪. **ক্রটির খিয়ার :** এ হচ্ছে ঐ খিয়ার যা দ্বারা পণ্যের দাম কমে আসে তাই যখন কেউ কোন পণ্য কিনে তাতে কোন ক্রটি দেখতে পাবে তখন সে দু'টি বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে। এক : সে পণ্য ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিবে। দুই : অথবা পণ্য নিবে ঠিকই; কিন্তু ক্ষতিপূরণসহ। ফলে ক্রটিমুক্ত ও ক্রটিযুক্ত দুই অবস্থায় কি মূল্য আসে তা নির্ণয় করে যে ব্যবধানটুকু সাব্যস্ত হয় সে পরিমাণ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় যে, কার নিকট ক্রটি সংঘটিত হয়েছে যেমন বাঁকা অথবা খাবার বাসি হওয়া, তবে তা শপথসহ বিক্রেতার কথা গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কিংবা উভয়ে সিদ্ধান্ত তুলে নিবে।

৫. **ধোঁকার খিয়ার (স্বাধীনতা) :** তা হচ্ছে এই যে, বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা অস্বাভাবিকভাবে পণ্যে ঠকে যাওয়া। এ ধরনের ঠকানোর কাজ হারাম। এমন ঠকে পড়ে গেলে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে। ধোঁকা খাওয়া কখনও মাঝ পথে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাতকারীর মাধ্যমে হয় অথবা ঐ দালালের মূল্য বৃদ্ধি থেকে যে ক্রয় করতে চায় না অথবা মূল্য প্রসঙ্গে অজানা অপর দিকে দামাদামীতে অনভিজ্ঞ। অতএব, তার স্বাধীনতা থাকবে।

৬. **ধামা-চাপা ভিত্তিক "খিয়ার" :** তা হচ্ছে এই যে, ক্রেতা পণ্যকে আকর্ষণীয় আকারে পেশ করবে অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। যেমন : (প্রাণীর) স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা বেশি দুধের ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত আচরণ হারাম। তাই এ ধরনের কাজ সংঘটিত হলে (ক্রেতা) চুক্তি বলবত রাখা কিংবা ভঙ্গ করা উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অধিকার রাখে। তবে যদি দোহন করে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ফেরত দিতে গেলে পণ্যের সাথে এক সা' তথা আনুমানিক আড়াই কেজি খেজুর দুধের বিনিময় হিসেবে দিয়ে দিবে।

৭. **খিয়ানতের খিয়ার :** ক্রয় মূল্য প্রসঙ্গে ব্যতিক্রম বা কম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিয়ে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন : কেউ এক শর্ত দিয়ে একটি কলম কিনল, অত:পর তাকে কেউ এসে বলল তুমি কলমটি ক্রয় মূল্যে আমার নিকট বিক্রি কর। সে বলল এর ক্রয় মূল্য একশত পঞ্চাশ এবং উক্ত মূল্যে তা

বিক্রি করে ফেলল। পরবর্তী সময়ে বিক্রেতার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল। এবার ক্রেতার স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেল। উক্ত স্বাধীনতা প্রতিনিধিত্বে কোম্পানীতে, লাভ- লোকসানের উভয় চুক্তিতে সাব্যস্ত হবে। আর এ সবের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মূল পুঁজি প্রসঙ্গে অবহিত হতে হবে।

৮. **অভাবের জন্য খিয়ার :** যখন পরিস্কার হয়ে যাবে যে, ক্রেতা অভাবী কিংবা টালবাহানাকারী তখন বিক্রেতা চাইলে তার পণ্য রক্ষণের তাকিদে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে।

৯. **দেখার খিয়ার :** না দেখে কোন জিনিস ক্রয় করার সময় এ শর্ত করে যে যখন দেখবে তখন তার স্বাধীনতা থাকবে। দেখার পর ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে, ইচ্ছা করলে মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে আর ইচ্ছা করলে ফেরত দেবে।

প্রতারণার ভয়াবহতা : প্রতারণা যে কেউ ইচ্ছা করলে যে কারো সাথে হারাম। তাই এটা প্রত্যেক লেনদেন, পেশা, ইন্ডাষ্ট্রি, চুক্তিপত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে মিথ্যা ও ধোঁকা রয়েছে যা বিদ্বেষ ও হানাহানির সৃষ্টি করে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মুসলিম হাদীস নং ১০২)

একালা বা চুক্তি তুলে নেয়া : এ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার নিজ নিজ পাওনা ফেরতসহ চুক্তি তুলে নেয়ার নাম। এটা নিজ নিজ পাওনা অপেক্ষা কম বা বেশিতেও করা চলে। উক্ত "একালা" ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অনুতপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া সুন্নত। তবে যার নিকট তা চাওয়া হয় তার পক্ষে তা সুন্নত এবং যে তা চায় তার পক্ষে তা চাওয়া জায়েয। আর উভয় পক্ষের যে কেউ অনুতপ্ত হলে তা করা বিধিবদ্ধ। ঠিক পণ্যের দরকার না থাকলে বা মূল্য আদায়ে অপারগ ইত্যাদি হলে তা করতে পারবে।

একালার হুকুম : বিক্রেতা ও ক্রেতার যে লজ্জিত হবে তার জন্য একালা করা সুন্নত। ইহা যে বাতিল করতে চায় তার জন্যে সুন্নত আর যে অব্যাহতি পেতে

চায় তার জন্যে জায়েয। দু'পক্ষের কোন একজন লজ্জিত হলে বা পণ্যের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কিংবা মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম ইত্যাদি হলে ব্যবসার চুক্তি বাতিল করা বিধান সম্মত।

"একালা" হচ্ছে মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার মুখাপেক্ষী ভাইয়ের প্রতি সদাচারণ। যার প্রতি নবী করীম ﷺ এ বলে উৎসাহ দিয়েছেন–

مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে চুক্তি তুলে নেয়ার সুযোগ দান করল আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তার ভুল-ভ্রান্তি তুলে নিবেন।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ৩৪৬০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২১৯৯)

বাকিতে বিক্রয়ের হুকুম

১. যদি পণ্য নগদ হয় আর মূল্য পরে দিতে হয় তাহলে একে বাকিতে বা কিস্তিতে ব্যবসা বলে।

২. আর যদি মূল্য নগদ হয় আর পণ্য পরে তাহলে একে সালাম ব্যবসা বলে। এ দুই প্রকার ব্যবসা শরিয়তে জায়েয।

৩. সালাম-অগ্রিম ক্রয়

চুক্তির প্রকারভেদ : হস্তান্তরের দিক থেকে চুক্তি চার প্রকার–

১. দেওয়া ও নেওয়া নগদে যেমন : নগদে একটি বই দশ টাকাতে বিক্রয় করা, ইহা জায়েয।

২. দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি বাকিতে যেমন : নির্দিষ্ট গুণের একটি অমুক গাড়ি এক বছর পরে দশ লক্ষ টাকা মূলে বিক্রেতা হস্তান্তর করবে যার মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবে এক বছর পর। এ ব্যবসা নাজায়েয; কারণ ইহা বাকি দ্বারা বাকি বিক্রি যা শরিয়তে জায়েয নেই।

৩. মূল্য নগদে পরিশোধ এবং পণ্য বাকিতে, একে 'সালাম' ব্যবসা বলে, ইহা জায়েয।

৪. পণ্য নগদে এবং মূল্য পরিশোধ বাকিতে যেমন : এক লক্ষ টাকায় একটি গাড়ি বিক্রয় করা যার মূল্য পরিশোধ করবে এক বছর পরে। ইহা জায়েয।

সালাম হচ্ছে : চুক্তির মজলিশে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট গুণাগুনের পণ্য জিম্মায় অঙ্গীকার সাপেক্ষে বাকিতে বিক্রয় করা। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সুবিধা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য এটি জায়েয করেছেন। একে "সালাম" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সালাম বলতে ইহা এমন ব্যবসা যা মূল্য অগ্রিম দেওয়া হয় এবং পণ্য পরবর্তীতে বিনিময় করা হয়।

"সালাম" এর হুকুম : এ জাতীয় ক্রয়বিক্রয় জায়েয। এর উদাহরণ হচ্ছে : যেমন কাউকে একশত টাকা এ শর্তে দেওয়া যে, এক বছর পরে সে অমুক প্রকৃতির পঞ্চাশ কিলো খেজুর দেবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَفِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অগ্রিম সন্ধি ভিত্তিক ব্যবসায় করবে তা যেন মাপে, ওজনে ও মেয়াদে জানা-শুনা হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ২২৪০, মুসলিম হাদীস নং ১৬০৪)

সালাম ব্যবসার শর্তাবলী : একে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসার শর্তাবলি ছাড়াও আরো কিছু শর্তারোপ করা হয়। যেমন সালামকৃত পণ্য ও মূল্যের জ্ঞান লাভ এবং চুক্তির মজলিশে মূল্য হাতে গ্রহণ। এ ছাড়া জিনিসের চুক্তি হচ্ছে তা জিম্মায় থাকবে এবং এমনভাবে পরিচিত করা যার কিছুই অজানা থাকবে না। এর মাঝে মেয়াদ ও বিনিময় স্থানসহ উল্লেখ থাকবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের কতিপয় হুকুম

সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে মূল্য নির্ধারণ করা : প্রয়োজনে পণ্যের উপর এমন সুনির্ধারিত মূল্য ধার্য করা যাতে মালিকের উপর জুলুম না হয় এবং ক্রেতার ওপরও ভারী বোঝা না চাপে।

মূল্য নিধারণ করার হুকুম

১. মানুষের ওপর জুলুম নিশ্চিতকারী মূল্য নির্ধারণ বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন কিছুতে বাধ্য করা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালালকৃত বিষয় থেকে তাদেরকে নিষেধ করা সবই হারাম।

২. মানুষের সুবিধা মূল্য নির্ধারণের ওপর ভিত্তিশীল হলে তা নির্ধারণ জায়েয। যেমন : মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পণ্যধারীরা বেশি মূল্য ছাড়া তা বিক্রিতে দ্বিমত পোষণ করলে, এমতাবস্থায় অনুরূপ পণ্যের মূল্য ধরে মূল্য নির্ধারণ করা চলবে। কেননা এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

মওজুদদারীর হুকুম : এ হচ্ছে পণ্য ক্রয় করে আটক রাখা যেন বাজারে তা কম পরবর্তীতে মূল্য বাড়ে। এ জাতীয় মওজুদদারী হারাম; কেননা এতে লোভ-লালসা চরিতার্থ এবং লোকজনের ওপর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। তাই যে মওজুদদারীর কাজ করে সে ভুলকারী।

তাওয়াররুক : কোন পণ্য বিক্রেতার নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করে পরবর্তীতে তার চেয়ে কমদামে অন্যের নিকট বিক্রয় করাকে তাওয়াররুক বলে।

তাওয়াররুকের হুকুম : যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে কোন ঋণদাতা পাবে না। এমতাবস্থায় তার জন্য এটি বৈধ যে, সে বাকিতে কোন পণ্য ক্রয় করে যার নিকট থেকে ক্রয় করেছে সে ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করবে এবং উক্ত মূল্য দ্বারা তার প্রয়োজন মিটাবে।

উরবুন বা বায়না নামা : এ হচ্ছে বিক্রেতাকে ক্রেতার পক্ষ থেকে কিছু অর্থ দিয়ে পণ্য বিনিময় করা এ শর্তে যে, পণ্য নিলে এ অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে তা না নিলে দায়েরকৃত বায়না ঐ বিক্রেতার জন্য বাকী থাকবে। এমন লেনদেন অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে থাকলে জায়েয হবে।

মুজায়াদাহ তথা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করা : মুজায়াদার চুক্তি বিনিময় ভিত্তিক। টেণ্ডার দ্বারা মানুষ বা কোম্পানিকে আহ্বান করে পণ্য ডাকে উঠিয়ে বিক্রেতার সম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ মূলে বিক্রয় করার নাম। এ ব্যবসা প্রচলিত ব্যবসার শর্ত অনুযায়ী জায়েয। চাই পণ্যের মালিক কোন ব্যক্তি হোক বা সরকারি কোন পক্ষ হোক কিংবা কোন কোম্পানি হোক।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ غُلَامًا لَهٗ دُبُرٍ
فَاحْتَاجَ، فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى؟ فَاشْتَرَاهُ
نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার গোলাম আজাদ করে মারা যান। (মৃত ব্যক্তির পরিবারের গোলামটির) প্রয়োজন থাকায় নবী করীম ﷺ তা নিয়ে বলেন : একে আমার থেকে কে ক্রয় করবে? তখন গোলামটি নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ এত এত দামে ক্রয় করে নেন। নবী করীম ﷺ গোলমটিকে তার নিকট হস্তান্তর করেন।

(বুখারী হাদীস নং ২১৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ৯৯৭)

৪. সুদ

ধন-সম্পদের তিনটি হুকুম : ইনসাফ, অনুগ্রহ ও অন্যায়। ইনসাফ হচ্ছে ব্যবসায়, অনুগ্রহ হচ্ছে দান আর অন্যায় হচ্ছে সুদ ইত্যাদি।

হারাম লেনদেনের উসূল : হারাম লেনদেনের মূল নীতিমালা তিনটি– ১. সুদ, ২. জুলুম, ৩. ধোঁকা। অতএব, যে কোন লেনদেনে এ তিনটির কোন একটি থাকবে সেটিকে শরিয়ত হারাম করে দিয়েছে। আর এর বাইরে হলে হালাল করে দিয়েছে; কারণ লেনদেনে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ। আল্লাহর বাণী–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যাকিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। অত:পর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন। বস্তুত : তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। তিনি সকল বিষয়ে অবগত।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৯]

সুদ : সুদ প্রযোজ্য হয় এমন দুই বস্তুর মধ্যকার বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে সুদ বলে। সুদখোর একটি জিনিসের উপর আরেকটিতে বেশি করে নেয় অথবা বেশির মোকাবেলাই দেরীতে কব্জা করে।

সুদের হুকুম

১. সুদ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রতিটি আসমানী ধর্মে হারাম; কেননা এতে রয়েছে বড় ধরণের ক্ষতি। সুদ মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং গরিবদের ধন নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে ইন্ধন যোগায়। এতে মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি জুলুম রয়েছে এবং ধনীকে ফকিরের উপরে

প্রভাবশালী করা হয়। দান ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি মানব মন থেকে দয়া-মায়ার অনুভূতি সমূলে তুলে ফেলার কুফল বিদ্যমান আছে।

২. সুদ হচ্ছে মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায়গ্রহণ বা খাওয়ার নাম। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় আয়, ব্যবসায় ও শিল্প কাজ অচল হয়ে পড়ে। তাই সুদি লেনদেনকারীর মাল কোনরূপ পরিশ্রম ব্যতীতই বৃদ্ধি পায়। ফলে সে ব্যবসায় ও এমন সব লাভজনক কাজ পরিহার করে বসে যা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। আর যে যত বেশি সুদ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত তার ধন ততো বেশি কমে যায়, যার বাস্তব প্রমাণ বিশ্বের বড় বড় ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হওয়া। এ সুদের গুনাহের তেহাত্তরটি স্তর রয়েছে যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজটি হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে যেনা করার সমতুল্য।

সুদের শাস্তি : সুদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের একটি। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য সকল গুনাহের মধ্যে শুধু এ পাপের ওপর তথা সুদ দাতা ও গ্রহীতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ .

হে মুমিনগণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিন হয়ে থাকলে বাকি সুদ টুকুও ত্যাগ কর; কিন্তু যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তওবা কর তবে তোমাদের জন্য মূল সম্পদ প্রাপ্য থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৮-২৭৯]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, তার লেখক ও উভয় সাক্ষীকে লা'নত করেছেন এবং বলেছেন তারা পাপে সবাই সমান। (মুসলিম হাদীস নং ১৫৯৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে সতর্ক থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল সেগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক), যাদু, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, সুদ গ্রহণ, এতিমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন এবং অবলা সতি-সাধ্বি নারীকে যেনার অপবাদ দেওয়া। (বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬, মুসলিম হাদীস নং ৮৯)

সুদের প্রকারভেদ

১. বাকিজাত সদু বা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ : এটি সেই বর্ধিত পরিমাণ যা বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ থেকে মেয়াদ পেছানোর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। যেমন : নগদ এক হাজার টাকা এ ভিত্তিতে দেওয়া যে, এক বছর পর এক হাজার একশত টাকা ফেরত দিতে হবে।

অভাবী ব্যক্তির গৃহীত ঋণে পরিবর্তন সৃষ্টি করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ে কারো পাওনা রয়েছে। সময় শেষ হলে প্রাপক তাকে বলল : তুমি কি পরিশোধ করতে চাও না কি সময় বাড়িয়ে নিতে চাও? জবাবে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করে দেয় নচেৎ এ পক্ষ সময় বাড়িয়ে দেয়। আর ঐ পক্ষ মালের পরিমাণ বর্ধিত করে ফলে ঋণগ্রস্তের দায়িত্বে মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আর এটিই ছিল জাহিলী যুগের মূল সুদ। আল্লাহ তা'আলা ইহাকে হারাম করেছেন এবং এর পরিবর্তে অভাবীর জন্য বিনিময় ছাড়াই মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ

জারি করেছেন। এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম সুদ; কারণ এর ভয়াবহতা মারাত্মক এবং এতে সকল ধরনের সুদ একত্রিত হয়ে থাকে যথা : বাকি, বেশি ও ঋণ ভিত্তিক সুদ।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মু'মিনগণ তোমরা বহুগুণে বর্ধিত হারে সুদ গ্রহণ কর না, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে কৃতকার্য হতে পার। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩০]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

যদি সে অভাবী হয়ে থাকে তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, আর যদি তোমরা দান করে দাও তবে তাই হবে উত্তম যদি তোমরা জানতে।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৮০]

এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আরো রয়েছে প্রত্যেক এমন দুই ধরনের বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা যার কারণ বেশিজাত সুদ। সেই সাথে উভয়টা কিংবা একটা বুঝে পাওয়ার কাজ বিলম্বে হওয়া। যেমন : সোনার বিনিময়ে সোনা ও গমের বিনিময়ে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এ জাতীয় কোন বস্তুকে অন্যটির সাথে দেরীতে বিনিময় করা।

২. বেশিজাত সুদ : এটি হচ্ছে মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে অথবা খাবারকে খাবারের বিনিময়ে পরিমাণে বেশি দিয়ে বিক্রয় করা। ইহা হারাম। আর শরীয়তে নির্দিষ্ট ছয়টি বস্তুতে সরাসরি সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا

بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا.

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ প্রকার ও পরিমাণে এক জাতীয় হতে হবে এবং হাতে হাতে উপস্থিত বিনিময়ে হতে হবে। (তাহলে বৈধ হবে নচেৎ নয়) কিন্তু যদি প্রকার ভিন্ন হয় তাহলে তোমাদের ইচ্ছাধীন (কম বেশি) বিনিময় করতে পারবে তবে এ শর্তে যে, তা হাতে হাতে হতে হবে। (বাকিতে চলবে না) (মুসলিম হাদীস নং ১৫৮৭)

উপরিউক্ত ছয় প্রকারের ওপর প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনুমান হবে যা সেগুলোর সাথে কারণে এক (অভিন্ন) স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে : মূল্য আর বাকী চারটি উপাদানে মাপ ও খাদ্যজাত অথবা ওজন ও খাদ্যজাত হওয়া ধর্তব্য। মাপ হিসেবে মদীনার মাপ এবং ওজন হিসেবে মক্কাবাসীর ওজনই প্রযোজ্য হবে। আর যা এদুয়ের মধ্যে কোনটার অন্তর্ভুক্ত নয় তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম প্রয়োজ্য হবে। আর যে বস্তুতে বেশিজাত সুদ হারাম হবে সে বস্তুতে বাকিজাত সুদও হারাম বলে বিবেচিত হবে।

৩. ঋণজাত সুদ : এর পরিচয় এই যে, কোন ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দিয়ে এ শর্তারোপ করা যে, সে যেন এ অপেক্ষা আরো উত্তম বিনিময় দেয় অথবা যে কোন উপকারিতার শর্তারোপ করা যেমন : তার ঘরে এক মাস থাকতে দেয়া। এটা হারাম তবে শর্ত না করা অবস্থায় যদি ঋণ গ্রহীতা নিজেই কোন মুনাফা বা অধিক কিছু দিয়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং তার জন্য সে নেকী লাভ করবে।

বেশিজাত সুদের বিধি-বিধান

১. সুদের ভিত্তিতে একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময়ে বেশি কিংবা বাকি দ্বারা লেনদেন করা হারাম। যেমন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা গমের বিনিময়ে গম বিনিময় ইত্যাদি। তাই উক্ত ব্যবসায় জায়েয হওয়ার শর্ত হচ্ছে এই যে, পরিমাণে সমান ও তাৎক্ষণিক বিনিময় হতে হবে যেহেতু প্রকৃতি ও কারণে উভয় বিনিময়ের জিনিস এক (অভিন্ন)।

২. যখন এমন দুই বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা বেশিজাত সুদের কারণ হিসেবে এক তবে প্রকৃতি হিসেবে ভিন্ন তবে বাকিজাত বিনিময় হারাম ও বেশিজাত

বিনিময় জায়েয হবে। যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা অথবা যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা ইত্যাদি। এগুলোতে তাৎক্ষণিক হাতে হাতে বিনিময় হলে বেশি দ্বারা তা করা চলবে যেহেতু এগুলো কারণে অভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে আলাদা।

৩. যখন সুদ জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যার কারণ এক নয়, তখন বেশি ও বিলম্বজাত মুনাফা জায়েয হবে। যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে খাবার বিক্রয় করা অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে খাবার বিক্রয় করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বাকিজাত বিনিময় জায়েয; কেননা উভয় দ্রব্যের প্রকৃতি ও কারণ আলাদা।

৪. যখন এমন দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা সুদ জাতীয় নয়, তবে বেশি ও দেরী উভয় প্রকারের বিনিময় জায়েয হবে। যেমন : দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট বিক্রয় করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি উট বিক্রয় করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি কাপড় বিক্রয় করা ইত্যাদি। এগুলোতে বেশি ও বিলম্বজাত বিনিময় জায়েয।

একই ধরনের দ্রব্যে দুই ধরনের বস্তুতে বিনিময় নাজায়েয। তবে গুণে এক হলে চলবে যেমন : তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় নাজায়েয। কেননা তাজা খেজুর শুকিয়ে কম হয়ে যায়। ফলে বেশিজাত সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

স্বর্ণের অলংকার বিক্রয় করার হুকুম : সোনা বা রূপার অলংকার গিনি সোনা-রূপার সাথে বেশিতে বিনিময় নাজায়েয যদিও অলংকারে বানানোর খরচ বেশি হয়েছে। অনুরূপ পুরাতন অলংকার নতুন অলংকারের সাথে বেশিতে বিনিময় করা চলবে না। এক প্রকার অলংকার বিক্রয় করে টাকা দ্বারা অন্য অলংকার কিনবে।

ব্যাংক যেসব উপকারিতা গ্রহণ করে তার হুকুম : বর্তমান বিশের ব্যাংকগুলো ঋণের বিনিময়ে যে মুনাফা গ্রহণ করে থাকে তা সুদ। অনুরূপ ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা রাখার বিনিময়ে যে লাভ ব্যাংক দিয়ে থাকে তাও সুদ। কারো পক্ষে এ থেকে উপকৃত হওয়া নাজায়েয; বরং উচিত হচ্ছে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা।

সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখার হুকুম

১. মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, তারা প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে ও ড্রাফট ইত্যাদির কাজ সমাধা করবে। তবে যদি তা না

থাকে তবে অন্য ব্যাংকে মুনাফা ব্যতীত টাকা জমা রাখবে এবং শরীয়ত লঙ্ঘন না হয় এমন পদ্ধতিতে টাকা ড্রাফট ইত্যাদি করবে।

২. মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন সব ব্যাংক বা সংস্থায় চাকুরী করা হারাম যাতে সুদী লেনদেন রয়েছে। এগুলোতে চাকুরীরত ব্যক্তির উপার্জন হারাম, যার ওপর শাস্তি বর্তাবে।

সুদ গ্রহণের হুকুম : যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। অত:পর ব্যাংক তাকে সুদ দিলে তা তার জন্যে গ্রহণ করা নাজায়েয এবং তা খরচ করাও নাজায়েয; কারণ ইহা হারাম পন্থায় উপার্জন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আর এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ হলো : তা ছেড়ে দেওয়া ও গ্রহণ না করা। যদিও তারা তা কোন হারাম কাজে ব্যয় করে অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচ করে; কারণ তুমি তাদেরকে সে নির্দেশ কর নাই এবং তাদের তা প্রদানও কর নাই; কারণ তুমি তার মালিক হও নাই।

সুদ গ্রহণ কবিরা গুনাহ। আল্লাহ্ তা'আলা যে তা গ্রহণ করে তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। আর তার পরিণতি সর্বদা ধ্বংস এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ যেমনটি হাছিল হয়েছে ও হাছিল হবে।

কুরআনের বাণী−

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ .

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করা তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।

[সূরা বাকারা : ২৭৮-২৭৯]

সুদযুক্ত সম্পদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় : সুদ হচ্ছে জঘন্য অপরাধগুলোর একটি। আল্লাহ তা'আলা যখন সুদগ্রহণকারীকে অনুগ্রহ করেন ফলে সে তওবা করে। কিন্তু তার নিকট তার সুদযুক্ত সম্পদ বাকী থেকে যায় যা থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ পরিস্থিতিতে দুটি অবস্থা দেখা দিবে।

১. যদি সুদযুক্ত সম্পদগুলো অন্যদের হাতে থাকে যা সে নিজ দখলে নেয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় মূল সম্পদ গ্রহণ করে সুদি অংশকে প্রত্যাখ্যান করবে।

২. যদি সুদযুক্ত সম্পদ তার নিকট থাকে তাহলে এমতাবস্থায় সে তা প্রাপকদেরকে ফেরত দিবে না এবং নিজেও গ্রহণ করবে না; কেননা এ হচ্ছে নোংরা উপার্জন। তবে ইহা কোন গরিবকে খাবার ও পোশাক ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয়ের জন্য দিয়ে দিবে। অথবা কোন কল্যাণমূলক প্রকল্পে খরচ করে ফেলবে।

পশু বিক্রয় করার হুকুম : প্রাণী জীবিত থাকা অবধি (তার মধ্যে) সুদ হয় না। অনুরূপভাবে প্রত্যেক গণনাকৃত বস্তুর অবস্থাও তাই। ফলে দুই ও তিনটি উটের পরিবর্তে একটি উট বিক্রয় করা জায়েয। কিন্তু ওজনকৃত বস্তুর মধ্যে সুদ হবে; তাই এক কেজি ছাগলের মাংসকে দুই কেজি ছাগলের মাংসের বিনিময়ে বিক্রয় করা চলবে না। কিন্তু এক কেজি ছাগলের মাংস দুই কেজি গরুর মাংসের বিনিময়ে বিক্রয় করা চলবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে (আর জায়েয এজন্য হবে যে,) এতে প্রকার আলাদা।

সংরক্ষণ কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ক্রয় করা জায়েয। যেমন : সস্তা দামের সময় ক্রয় করে চড়া দামের সময় তা বিক্রয় করা।

মুদ্রা বিনিময় ও বিক্রয় করার হুকুম : মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এক মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রা বিক্রয় করা, চাই প্রকার এক হোক অথবা ভিন্ন হোক। অনুরূপভাবে মুদ্রা স্বর্ণের হোক লেনদেন সুদ কিংবা রৌপ্যের হোক অথবা বর্তমানে প্রচলিত কাগজের নোট হোক। ইহা মূল্যের দিক থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধান রাখে।

যখন কোন মুদ্রাকে তার সজাত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করবে। যেমন : স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ অথবা কাগজের নোট মুদ্রার বিনিময়ে তার স্বজাত মুদ্রা যেমন : রিয়ালের পরিবর্তে কাগজ কিংবা কয়েনের রিয়াল, তবে তাতে পরিমাণ সমান হওয়া ও চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান হতে হবে।

যখন কোন মুদ্রাকে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করবে। যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে টাকা তবে পরিমাণে বেশি করা চলবে; কিন্তু চুক্তির মজলিশে আদান-প্রদান করতে হবে।

উভয় লেনদেনকারী পূর্ণ কিংবা আংশিক আদান-প্রদানের পূর্বে পৃথক হয়ে পড়লে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সে পরিমাণে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে এবং বাকী অংশের লেনদেন বাতিল বিবেচিত হবে। যেমন : কাউকে দশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা উপস্থিত গ্রহণ করল। এমতাবস্থায় অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রায় লেনদেন সঠিক হবে এবং বাকি অর্ধেক বিক্রেতার নিকট আমানত হিসেবে জমা থাকবে।

৫. ঋণ

চুক্তির প্রকারভেদ : লেনদেনের চুক্তি তিন প্রকার :

প্রথম : বিনিময়ের দ্বারা চুক্তি। যেমন : ব্যবসায় ও ভাড়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় : দানের চুক্তি। যেমন : হেবা, অসিয়ত, ওয়াক্ফ, ঋণ, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব এহসান ও দানের চুক্তি।

তৃতীয় : সত্যায়নের চুক্তি। যেমন : বন্ধক, জামানত, দায়িত্ব, সাক্ষী ইত্যাদি। এসব সাব্যস্ত ও সত্যায়ন করার চুক্তি।

ঋণ : আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ দেওয়া চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহিতা তার প্রদান করুক অথবা না করুক।

ঋণ প্রবর্তনের তাৎপর্য : ঋণ হচ্ছে একটি উৎসাহযুক্ত এবাদত যেহেতু এতে মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে। আরো রয়েছে তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা। আবার প্রয়োজন যত বেশি হবে এবং পাশাপাশি আমল বেশি একনিষ্ঠ হবে তাতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বস্তুত: কাউকে ঋণ দান সালফে সালেহীনদের নিকট সাদকার অর্ধেক বিবেচিত হত।

ঋণের ফজিলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً. وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

কে আছে এমন যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা দিবে। ফলে তিনি তাকে বহুগুণে তা বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহই সংকট ও সচ্ছলতা সৃষ্টিকারী এবং তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [বাকরা : আয়াত-২৪৫]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ-

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়া বিষয়ক কোন সমস্যা দূর করবে আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের সমস্যা দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে সহজতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (মুসলিম হাদীস নং ২৬৯৯)

ঋণের হুকুম

১. ঋণ দেয়া মুস্তাহাব ও তা গ্রহণ করা জায়েয। আর যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয তার ঋণও জায়েয যদি তা জানা-শুনা হয়। ঋণ দাতার পক্ষ থেকে কোন দান করা জায়েয। আর ঋণ গ্রহীতার ওপর ঋণের বিনিময় ফেরত দেয়া উচিত সমমানের বস্তুতে সমমানের জিনিস দ্বারা। আর এ ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে মূল্য দ্বারা।

২. যে ঋণই লাভ বয়ে নিয়ে আসে তা হারাম ও সুদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : কাউকে কিছু ঋণ দিয়ে এ শর্তারোপ করা যে, তার ঘরে বাসবাস করবে। অথবা লাভের ওপর কাউকে অর্থ দেয়া যেমন : এক বছর পরে এক হাজার দুই শত টাকার বিনিময়ে বর্তমানে তাকে এক হাজার ঋণ দেয়া।

ঋণে এহসান করার হুকুম : ঋণে শর্ত ছাড়া এহসান দেখানো মুস্তাহাব। যেমন : কাউকে ছোট উট ঋণ দেয়ার বিনিময়ে সে বড় উট ফেরত দিল। কেননা এটি হচ্ছে উত্তম পরিশোধ ও উত্তম চরিত্র। যে ব্যক্তি কোন মুলসমানকে দু' বার ঋণ দেবে সে যেন তাকে একবার দান-খয়রাত করল।

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ : اَعْطِهِ اِيَّاهُ اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ছোট উট ধার নেন। অত:পর তাঁর নিকট সাদকার উট আসলে তিনি আবু রাফে'কে উক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের আদেশ করেন। আবু রাফে' ফিরে এসে বলে, আমি উট পালে উত্তম-বড় উট ছাড়া অন্য কিছু দেখছিনা। তিনি বললেন : এটিই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পরিশোধে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

(মুসলিম হাদীস নং ১৬০০)

উপস্থিত ঋণ পরিশোধে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার হুকুম : সময় সাপেক্ষ ঋণে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে কম করা জায়েয। চাই তা ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে হোক বা ঋণদাতার পক্ষ থেকে হোক। আর যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে ঋণ বা খোরাকি পরিশোধ করবে সে ইচ্ছা করলে তা ফেরত নিতে পারবে।

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া ও ক্ষমা করার ফজিলত : অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া উত্তম চরিত্রের পরিচয়। এর চেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

আর যদি সংকটাপন্ন হয় তবে সাবলম্বিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি তোমরা দান কর তবে তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা জানতে।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৮০]

عَنْ اَبِى الْيَسَرِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ : مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ.

২. আবূল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্নকে সময় দেবে কিংবা ক্ষমা করে দেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে (কিয়ামতের দিন) আপন ছায়াতে আশ্রয় দিবেন। (মুসলিম হাদীস নং ৩০০৬)

ঋণগ্রহীতার চার অবস্থা

১. যার নিকট কিছুই নেই। তাকে সময় দেয়া ও তার পেছনে না লেগে থাকা উচিত।

২. যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদ অধিক। তার নিকট দাবী করা যাবে এবং পরিশোধে বাধ্য করা উচিত হবে।

৩. যার নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একেও পরিশোধে বাধ্য করা যাবে।

৪. তার নিকট ঋণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। ঋণ দাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকলের ঋণের পরিমাণ হিসেবে তাদের মধ্যে তা ভাগ করা হবে।

ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকলে তার শাস্তি : ঋণগ্রহিতার প্রতি ওয়াজিব হলো : ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেন–

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মানুষের সম্পদ ঋণ নেয় আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে তা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। (বুখারী, হাদীস নং ২৩৮৭)

৬. বন্ধক

চুক্তির প্রকারভেদ : চুক্তি মোট তিন প্রকার

১. উভয় পক্ষের মধ্যকার অবধারিত চুক্তি। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া ইত্যাদি।

২. উভয় পক্ষের মধ্যকার জায়েয চুক্তি। ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। যেমন : দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির চুক্তি।

৩. এক পক্ষের ওপর জায়েয ও অপর পক্ষের ওপর অবধারিত চুক্তি। যেমন : বন্ধক যা গ্রহীতার পক্ষে জায়েয ও দাতার পক্ষে অবধারিত। এ ছাড়া এমন সব বিষয় যেগুলোতে একজনের ওপর আরেক জনের অধিকার বর্তায়।

বন্ধক : এমন কোন বস্তুর বিনিময়ে ঋণের চুক্তি করা যা দ্বারা কিংবা তার মূল্য দ্বারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়।

বন্ধক প্রবর্তনের তাৎপর্য : বন্ধক মূলত: সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যেন ঋণ দাতার অধিকার বিনষ্ট না হয়। মেয়াদপূর্ণ হলে বন্ধক দাতার পক্ষে (ঋণ) পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি সে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অনুমতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত জিনিস বিক্রয় করে ঋণ আদায় করবে। আর এমন না হলে বিচারপতি তা পরিশোধ কিংবা বন্ধককৃত জিনিস বিক্রয় করতে তাকে বাধ্য করবে। যদি তাতে সে সম্মত না হয়, তবে বিচারপতি নিজে তা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ.

আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বুঝে পাওয়া বন্ধক গ্রহণ করবে। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৩]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদে এক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তিনি তার নিকট এক লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। (বুখারী, হাদীস নং ২০৬৮ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৩)

বন্ধক হচ্ছে তার গ্রহীতার নিকট অথবা আমানত হিসেবে অন্য কারো নিকট রাখা আমানত, সে অবহেলা কিংবা অপব্যবহার (দ্বারা নষ্ট না করে থাকলে) তার জামিনদার হবে না।

বন্ধক সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ : বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো : বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব করার বৈধতা থাকা, দু' পক্ষের মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া, বন্ধক ও তার প্রকার জানা, বন্ধককৃত বস্তুর উপস্থিতি থাকা যদিও এজমালি জিনিস হয় না কেন, বন্ধককৃত বস্তুর মালিক হওয়া, বন্ধক হিসেবে রক্ষিত জিনিস ঋণগ্রহীতাকে কজা করা। এসব শর্তাবলি যখন পূরণ হবে তখন বন্ধক সঠিক ও জরুরি হবে।

বন্ধকের ওপর খরচ করবে যে : বন্ধককৃত বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার ওপর বর্তাবে আর যা খরচের দরকার তা সে করবে। বন্ধক যদি কোন আরোহী হয় তাহলে বন্ধক গ্রহীতা তার উপর আরোহণ করবে এবং দুধ দোহনের পশু হলে দুধ দোহন করবে। আর যে পরিমাণ লাভ ভোগ করবে সে পরিমাণ খরচ সে বহন করবে।

বন্ধক বিক্রি করার হুকুম : বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকৃত জিনিস বিক্রয় করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রি করে ফেলে আর বন্ধক গ্রহীতা তাকে সমর্থন করে তবে বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে। এ ছাড়া তা অশুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হবে।

বন্ধকের চুক্তি শেষ হওয়া : বন্ধকের চুক্তি শেষ হবে ঋণগ্রহীতা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে, বন্ধক হিসেবে রাখা জিনিস তার মালিকের নিকট সোপর্দ করলে, বিচারকের নির্দেশক্রমে ঋণদাতার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করলে, ঋণদাতার পক্ষ থেকে বন্ধক বাতিল করলে, যে কোনভাবে ঋণ থেকে মুক্ত হলে, বন্ধক হিসেবে রাখা জিনিস ধ্বংস হলে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তুতে বিক্রয় বা হেবার মাধ্যমে হেরফের করলে। অতএব, যখন এসবের কোন একটি সংঘটিত হবে তখন বন্ধক শিথিল হয়ে পড়বে এবং শেষ হয়ে যাবে।

৭. জামিনদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণ

জামিনদারী : অন্যের ওপর জামানত ও তৎসংক্রান্ত আবশ্যকীয় জিনিস বহাল থাকা পর্যন্ত তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

জামিনদারীর হুকুম : ইহা হচ্ছে কল্যাণের কাজ। আর সুবিধা তার চাহিদা রাখে বরং কখনও তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এটি নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। এতে মুসলমান ব্যক্তির চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন রয়েছে তার সমস্যা দূরীকরণের উপায়।

জামিনদারী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত : জামিনদার ব্যক্তিকে লেনদেনের উপযুক্ত হওয়া এবং সন্তুষ্টচিত্তে ও বাধ্যকৃত হওয়া।

যা দ্বারা জামিনদারী বিশুদ্ধ হবে

১. প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা জামিনদারী বিশুদ্ধ হবে যা দ্বারা তা বুঝা যায়। যেমন : আমি তার জামিন হলাম অথবা আমি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম ইত্যাদি।

২. জামিনদারী কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর হতে পারে। যেমন : এক হাজার টাকা অথবা কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর ওপর হতে পারে যেমন বলা : আমি অমুকের নিকট তোমার প্রাপ্য সম্পদের জামিনদার। অথবা বলা : সে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় তার ওপর বর্তানো সবকিছুর জন্য আমি জামিনদার।

জামিনদারীর কারণে যা বর্তাবে : কোন জামিনদার ঋণের জামিনদারী গ্রহণ করলেই ঋণ গ্রহীতা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় না; বরং ঋণ উভয়ের ওপর বাকী থাকে। ফলে ঋণদাতা যে কোন একজনের নিকট তা চাইতে পারে।

জামিনদারীর চুক্তি শেষ হওয়া : ঋণদাতা স্বীয় ঋণ বুঝে পেলে অথবা দায়মুক্ত করে দিলে জামিনদার দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দায়িত্বভার গ্রহণ : কোন বুদ্ধিমান সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অধিকার গ্রহীতাকে তার প্রাপকের নিকট হাজির করার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম।

জামিনদার প্রবর্তনের তাৎপর্য : এর দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

জামিনদারের হুকুম : ইহা বৈধ যা পূর্ণ ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। ইহা দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য মুস্তাহাব (উত্তম); কারণ এর দ্বারা মাকফূল তথা যার দায়িত্ব নিয়েছে তার প্রতি এহসান।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ.

ইয়াকুব (আ) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে প্রেরণ করব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্ত অসহায় না হয়ে যাও। অত:পর যখন সবাই তাকে প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন : আমাদের মধ্যে যা কথাবর্তা হলো সে বিষয়ে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। [সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৬]

কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতাকে উপস্থিত করার দায়িত্ব নিয়ে যদি তাকে উপস্থিত না করতে পারে তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে।

দায়িত্ব গ্রহণকারী যখন দায়িত্বমুক্ত হবে : দায়িত্ব গ্রহণকারী নিম্নোক্ত কারণ সাপেক্ষে দায়িত্বমুক্ত হবেন

১. দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে।

২. দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজেকে অধিকার প্রাপকের হাতে সোপর্দ করলে।

৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনভাবে দায়িত্বকৃত জিনিস বিনষ্ট হয়ে গেলে।

জামানতদারী ও দায়িত্ব গ্রহণের মাঝে পার্থক্য : জামানতদারী হলো : শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের প্রতি ওয়াজিব এমন হক আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করার নাম। আর কাফালাত তথা দায়িত্ব গ্রহণ নেওয়া হলো : কোন স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার প্রতি অন্যের হক রয়েছে তাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। অতএব, কাফালত হলো : ঋণগ্রহীতাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ এবং জামানতদারী হলো : ঋণ হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ। তাই কাফালত জামানতদারীর চেয়ে ছোট দায়িত্ব; কারণ তা দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ঋণের সাথে নয়। কাজেই কাফীল যখন যার দায়িত্ব নিয়েছিল তাকে হাজির করবে তখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। চাই সে ব্যক্তি পূরণ করুক বা না করুক।

ঋণী ব্যক্তির ভ্রমণ করার হুকুম : কোন ব্যক্তির উপর অন্যের কোন অধিকার থাকা অবস্থায় সে ভ্রমণ করতে চাইলে প্রাপক তাকে নিষেধ করতে পারবে যদি সফরের পূর্বে পরিশোধ যোগ্য হয়। আর যদি সাবলম্বি কোন জামিনদার ঠিক করে

কিংবা এমন বন্ধকী রেখে যায় যা পরিশোধের সময় হলে ঋণ পরিশোধের কাজ করবে, তাহলে সে ক্ষতির পথ বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে ভ্রমণ করতে পারবে।

ব্যাংকের ইস্যুকৃত জামানত লেটার : জামানাত যদি পূর্ণ আবরণে বেষ্টিত হয়ে থাকে অথবা পূর্বেই জামানতের পূর্ণ এ্যামাউন্ট ব্যক্তির ফান্ডে জমা হয়ে থাকে, তবে সেবার বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু যদি তা আবরণে বেষ্টিত না থাকে তাহলে ব্যাংকের পক্ষে তা ইস্যু করা ও তার ওপর মজুরি গ্রহণ করা নাজায়েয।

৮. ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ

হাওয়ালা : ঋণ গ্রহীতার পরিবর্তে অন্যের ওপর দায়িত্ব অর্পণের নাম।

হাওয়ালার হুকুম : ইহা জায়েয।

হাওয়ালার প্রবর্তনের তাৎপর্য : আল্লাহ্ তা'আলা হাওয়ালাকে প্রবর্তন করেছেন যাতে সম্পদের সংরক্ষণ ও মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হয়। কেননা সে কখনও তার যিম্মায় থাকা ঋণ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। আবার কখনও সে নিজে প্রয়োজনবোধ করতে পারে। আবার কখনও স্বীয় সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করার সম্মুখীন হতে পারে অথবা এ কাজ তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। একে স্থানান্তরিত বা বহন করা কঠিন হওয়ার কারণে কিংবা আয়তনের দূরত্ব অথবা পথের নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে। এসব সুবিধা প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ্ তা'আলা হাওয়ালার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

হাওয়ালার শর্তসমূহ : হাওয়ালা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো

১. যে দায়িত্ব নেবে আর যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়া হবে উভয়ের হস্তক্ষেপ করা জায়েয এমন ব্যক্তি হতে হবে।
২. যে দায়িত্ব নেবে সে যেন যার দায়িত্ব নেবে তার ঋণ পরিশোধকারী হয়।
৩. দায়িত্ব গ্রহণকারী এমন ঋণের দায়িত্ব নেবে যা পরিশোধের সময় হয়ে গেছে।
৪. যার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে সে ঋণের পরিমাণ, শ্রেণি ও গুণাগুন যেন সমান হয়।
৫. যে দায়িত্ব নেবে এবং যার পক্ষ থেকে নেবে প্রচলিত নিয়মে তাদের মাঝে ইজাব কবুল হতে হবে।

হাওয়ালা কবুল করার বিধান : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কোন সাবলম্বি ব্যক্তির হাওয়ালা করবে তখন তাকে তার স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তার নিকট অজানা কোন দরিদ্র ব্যক্তির হাওয়ালা করলে সে হাওয়ালাকারীর প্রতি তার অধিকার ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যদি জেনে শুনে একাজ করে ও তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবেনা। আর ধনী ব্যক্তির পক্ষে টালবাহানা করা হারাম, কেননা ইহা জুলুমের নামান্তর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম সমতুল্য। তোমাদের কাউকে কোন সাবলম্বির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তার স্মরণাপন্ন হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭, মুসলিম হাদীস নং ১৫৬৪)

হাওয়ালার কারণে যা বর্তাবে : হাওয়ালা করা হয়ে গেলে পাওনা হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব থেকে হাওয়ালাকৃত ব্যক্তির দায়িত্বে এসে যায় এবং হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ফজিলত : হাওয়ালা সুসম্পন্ন হওয়ার পর হাওয়ালাকৃত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব কিংবা ক্ষমা করা যা আরো উত্তম কাজ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : এক ব্যবসায়ী মানুষকে ঋণ দিত, যখন কোন অভাবগ্রস্ত দেখত তখন তার যুবকদের বলত : তাকে ক্ষমা করে দাও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

(বুখারী, হাদীস নং ২০৭৮, মুসলিম হাদীস নং ১৫৬২)

ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রেরণের হুকুম : এক দেশে বা স্থানে ব্যাংকের নিকট মুদ্রা দিয়ে অন্য দেশে বা স্থানে গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক থেকে চেক বা ড্রাফ্‌ট কিংবা স্পিড ক্যাশ নেওয়াকে ব্যাংক মানি এক্সচেঞ্জ বলে। এ জাতীয় কাজ জায়েয; কারণ এর দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ সহজ হয় এবং সম্পদ চুরি ও ধ্বংস থেকে হেফাজতে থাকে। চাই প্রেরিত মুদ্রা ও গ্রহণ মুদ্রা একই ধরনের হোক বা ভিন্ন ধরনের হোক। আর এ অবস্থায় চেক বা ড্রাফ্‌ট অর্থ কব্জা করার স্থলাভিষিক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯. মীমাংসা বা সন্ধি

মীমাংসা : এমন চুক্তির নাম যার মাধ্যমে উভয় বিবাদকারীর ঝগড়া মিটে যায়।

মীমাংসা-সন্ধি প্রবর্তনের তাৎপর্য : আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় সন্ধিকে এ জন্যে প্রবর্তন করেছেন যে, উভয় বিবাদকারীর মধ্যে মীমাংসা সৃষ্টি হয়, দ্বন্দ্ব দূর হয়, এর মাধ্যমে আত্মা পরিষ্কার হয় ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে সন্ধি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও নৈকট্যের স্থান অধিকার করে।

মানুষের মাঝে মীমাংসা করার ফজিলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন−

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

তাদের বেশির ভাগ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি দান, সৎকাজ কিংবা লোকজনের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে একাজ করে আমি তাকে মহাবিনিময় দান করবো। [সূরা নিসা : আয়াত-১১৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের প্রতিটি জোড়ের ওপর সাদকা আবশ্যক প্রত্যেক সেই দিনে যাতে সূর্য উদিত হয়। (তবে) মানুষের মাঝে মীমাংসা করা একটি সদকা।

(বুখারী, হাদীস নং ২৭০৭ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৯)

মীমাংসার হুকুম : মীমাংসা মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে হতে পারে। ঠিক ইনসাফকারী ও জালিমদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ হলে, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু- বান্ধবের সাথে সম্পদে বা অন্যন্যা জিনিসে বিবাদকারী উভয় ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে।

মীমাংসার প্রকারভেদ

মীমাংসা দুই প্রকার : সম্পদে মীমাংসা ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসে মীমাংসা।

সম্পদে মীমাংসা দুই প্রকার

১. **স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মীমাংসা :** যেমন একজনের ওপর অন্য জনের কিছু জিনিস বা ঋণের বিষয়ে উভয়ে কেউ তার পরিমাণ জানে না কিন্তু স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় কোন জিনিসের ওপর মীমাংসা করলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি তার ওপর হাল নাগাদ পরিশোধযোগ্য ঋণ থাকে এবং সে স্বীকার করে তবে তার কিছু অংশ ক্ষমা আর অবশিষ্ট অংশ পরে পরিশোধের মীমাংসা করলে, ক্ষমা করা ও পরে পরিশোধ করা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি পরে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ এখনই পরিশোধের ওপর মীমাংসা করে তবুও বিশুদ্ধ হবে। আর শুধুমাত্র এ মীমাংসা তখনই বিশুদ্ধ হবে যখন স্বীকারোক্তিতে কোন ধরনের শর্ত থাকবে না। যেমন : আমি স্বীকার করছি এ শর্তে যে তুমি আমাকে অমুকটা দিবে। শর্তকৃত জিনিস না হলেও তার মূল হক থেকে বঞ্চিত হবে না।

২. **অস্বীকারের ওপর মীমাংসা :** যেমন বিবাদির ওপর বাদির এমন হক রয়েছে যা বিবাদি জানে না এবং সে অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কোন জিনিসের ওপর দু'জনে মীমাংসা করলে বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি দু' জনের একজন মিথ্যা বলে তাহলে মূলত তার হকে মীমাংসা হবে না এবং যা সে গ্রহণ করবে তা হারাম হবে।

জায়েয মীমাংসা : মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালন করতে বাধ্য। আর মুসলমানদের মাঝে সকল ধরনের সন্ধি করা জায়েয। কিন্তু যে সন্ধি-মীমাংসাতে

হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম রয়েছে তা নাজায়েয। জায়েয সন্ধি হলো যার মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন। আর তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। এরপর দুই পক্ষের সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা এর প্রশংসা করেছেন তাঁর ভাষায়–

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

আর সন্ধি-মীমাংসা করাই সর্বোত্তম। [সূরা নিসা : আয়াত-১২৮]

মীমাংসার শর্তাবলি : ন্যায়-ইনসাফ মীমাংসার কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : সন্ধিকারী দুই জনের শরিয়তের কার্যাদি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা। সন্ধি যেন কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল করা না হয়। কোন একজন তার দাবিতে যেন মিথ্যা দাবি না করে। সন্ধিকারী যেন মুত্তাকী। বাস্তবতা প্রসঙ্গে জ্ঞাত, ওয়াজিব বিষয়ে ওয়াকেফহাল এবং ন্যায়-ইনসাফের সৎ ইচ্ছুক হন।

বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের মীমাংসার হুকুম : যদি কোন মানুষ তার বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের কিছু অংশ বর্তমানে পরিশোধের জন্য মীমাংসা করে তাহলে বিশুদ্ধ হবে।

عَنْ كَعْبٍ (رضى) اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهٖ فَنَادٰى (يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَيِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهٖ.

কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবী হায়দার থেকে মসজিদে নিজের ঋণ গ্রহণের সময় দু' জনের গলার আওয়াজ হয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ (রা) তাঁর ঘর থেকে শুনতে পান। তিনি ﷺ তাঁর হুজরার পর্দা খুলে তাদের নিকট বের হয়ে এসে আহ্বান করেন : হে কা'ব! তিনি ﷺ বলেন, হাজির হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ﷺ বলেন : তুমি তোমার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ কর। তিন (কা'ব) বলেন,

তাই করলাম হে আল্লাহর রাসূল! তিনি ﷺ তাকে (ইবনে আবী হায়দারকে) বললেন : যাও তাই পরিশোধ কর। (বুখারী হাদীস নং ৪৫৭, মুসলিম হাদীস নং ১৫৫৮)

প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ : বাড়ির মালিকের জন্য তার মালিকানাধীনে এমন কাজ করা হারাম যাতে পড়শীর ক্ষতি হয়। যেমন শক্তিশালী মেশিন বা চুলা ইত্যাদির ব্যবহার। কিন্তু যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়েয। একজন পড়শীর ওপর অপর প্রতিবেশীর ওপর অনেক হক রয়েছে তন্মধ্যে গুরুতপূর্ণ হলো : আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা, এহসান ও সদ্ব্যবহার করা, কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকা, কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জিবরাইল (আ) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশী প্রসঙ্গে অসিয়ত করেন। এমনকি আমি ধারণা করছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫ মুসলিম হাদীস নং ২৬২৫)

১০. বিধিনিষেধ আরোপকরণ

শরিয়তের কারণে কোন মানুষকে তার সম্পদের যদেচ্ছাভাবে ব্যয় করার ওপর নিষেধ আরোপ করাকে "হাজ্‌র" তথা বিধিনিষেধ আরোপ করা বলে।

বিধিনিষেধ আরোপের বিধি-বিধান করার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা সম্পদের সংরক্ষণ করার নির্দেশ করেছেন এবং সে জন্যই ব্যক্তি তার সম্পদ ঠিক মত ব্যয় করতে পারে না। যেমন : পাগল তার প্রতি নিষেধ আরোপের বিধান চালু করেছেন। অনুরূপ যার সম্পদে স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ছোট শিশুরা অথবা যার সম্পদ হেরফের করাতে অপচয় হতে পারে। যেমন : নির্বোধ ব্যক্তি অথবা তার হাতে যে সম্পদ আছে তা তার পুরোটায় ব্যয় করলে অধিক ক্ষতি সাধন হতে পারে যেমন : যে নিঃস্ব ব্যক্তিদের ওপর ঋণের বোঝা চেপে বসেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মানুষের সম্পদকে সংরক্ষণ করার জন্যই বিধিনিষেধ আরোপের হুকুম আহকাম প্রবর্তন করেছেন।

বিধিনিষেধের প্রকারভেদ : বিধিনিষেধ আরোপ দুই প্রকার

১. অন্যের অংশের জন্য নিষেধ আরোপ করা। যেমন : নিঃস্ব দেউলিয়া ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঋণ দাতাদের অংশের জন্য।

২. নিজের অংশের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা। যেমন : ছোট শিশু, নির্বোধ ও পাগলের সম্পদের সংরক্ষণের জন্য নিষেধ আরোপ করা।

দেওলিয়া ব্যক্তির হুকুম : নিঃস্ব দেউলিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার সম্পদের চেয়ে ঋণের পরিমাণ অধিক। এমন ব্যক্তির ওপর তার ঋণদাতাদের সকলের পক্ষ থেকে বা কারো পক্ষ থেকে বিচারকের নিকট নিষেধ আরোপ চাওয়া হলে, তিনি সে ব্যক্তির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। যে সকল সম্পদের ঋণের বিষয়ে ঋণদাতাদের ক্ষতি রয়েছে তার ওপর নিষেধ আরোপ করা যাবে। আর তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না হলেও তার জন্য সম্পদ ব্যয় করা ঠিক হবে না।

দেওলিয়া ব্যক্তির বিধিবিধান

১. যার সম্পদ তার ঋণ পরিমাণ অথবা তার সম্পদের চেয়ে ঋণ অধিক তার ওপর নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তবে তাকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য আদেশ করতে হবে। যদি সে পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তবে তখন ঋণদাতা ইচ্ছা করলে তাকে আটক করে রাখতে পারে। এরপরেও সে যদি পূর্বের অবস্থায় স্থির থাকে এবং তার সম্পদ বিক্রয় না করে তবে বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্রয় করে ঋণ পারিশোধ করে দিবেন।

২. যে ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণের চেয়ে কম সে দেউলিয়া, তার ওপর নিষেধ আরোপ করা এবং জনসমাজকে জানানো আবশ্যক; যাতে করে মানুষ তার বিষয়ে ধোঁকায় না পড়ে। আর তার ঋণ দাতাদের ঋণ পরিশোধের সময় হলে কিংবা কিছু সংখ্যকদের চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

৩. যখন দেউলিয়া ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে তখন তার নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। তার সম্পদে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্রয় করবেন এবং তার বর্তমান ঋণদাতাদের মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ভাগ করে দিবেন। যদি তার ওপর আর কোন দাবি না থাকে তবে তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ রহিত হয়ে যাবে; কেননা তার কারণ দূর হয়ে গেছে।

৪. বিচারক সাহেব দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ তার ঋণ দাতাদের মাঝে ভাগ শেষ করলে তার থেকে চাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর তার এ ঋণের জন্য তাকে আটক করা বা জবরদস্তি করা জায়েয নেই। বরং তার রাস্তা খুলে দিতে হবে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তার ঋণদাতাদের অবশিষ্টাংশ রাজস্ব সম্পদ থেকে বিচারক সাহেব পরিশোধ করে দেবেন।

যে তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার হুকুম : যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে অপারগ তার থেকে ঋণ পরিশোধ চাওয়া যাবে না এবং তাকে আটক রাখাও যাবে না। বরং অপেক্ষা করা ওয়াজিব এবং তাকে জিম্মামুক্ত করাই উত্তম; কারণ কুরআন কারীমের ঘোষণা–

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

আর যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর যদি দান করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৮০]

বড় লোকের প্রতি বর্তমান পরিশোধযোগ্য ঋণ আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি অভাবী হয় তাহলে তার জন্যে অভাবমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে এবং তাকে আটক করে রাখা যাবে না। আর ক্ষমা করে দেওয়া সর্বোত্তম। আর যদি বড় লোক টালবাহনা করে তাহলে তাকে বিচারক আটক করে রাখবে; কারণ বড় লোকের টালবাহনা করা জুলুম। তাই তাকে আদাব দেওয়ার জন্য বন্দী করে রাখবে; যাতে তার প্রতি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য ঋণ পূর্ণ করতে তাড়াতাড়ি করে।

ঋণগ্রহীতাকে বন্দী রাখার শর্তাবলী : ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করে রাখার শর্ত হলো : ঋণ যেন বর্তমান পরিশোধযোগ্য হয়, ঋণগ্রহীতা পূরণ করতে সক্ষম ও টালবাহনাকারী হওয়া এবং ঋণদাতা বিচারকের নিকট তাকে বন্দী করার জন্য খোঁজ করে।

অভাবগ্রস্তদের সময় দেওয়ার ফযিলত : অভাবী ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের সময় হওয়ার পরেও তাকে সুযোগ দেওয়াতে অসংখ্য নেকী রয়েছে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন –

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهٗ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় তার জন্য প্রতি দিনের বদলায় দ্বিগুণ নেকী রয়েছে।

(হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং ২৩৪৩৪, ইরয়াউল গালিল দ্রঃ হাদীস নং ১৪৩৮)

দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট যে তার নির্দিষ্ট সামগ্রি পাবে তার হুকুম : যে দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট তার নির্দিষ্ট সামগ্রি পাবে সেই তার অধিক হকদার, যদি সে তার মূল্য কিছুই গ্রহণ না করে থাকে এবং দেউলিয়া ব্যক্তি জীবিত থাকে ও তার মালিকানায় সে জিনিস কোন পরিবর্তন ছাড়াই পাওয়া যায়।

নির্বোধ শিশু ও পাগলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির হুকুম : নির্বোধ শিশু ও পাগলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য বিচারক সাহেবের দরকার নেই। তাদের উকিল হচ্ছে বাবা যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান হয়। এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অত:পর বিচারক সাহেব। উকিলের কর্তব্য হলো এমনটি করা যা তাদের জন্য কল্যাণকর।

ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি যখন রহিত হবে : দুইভাবে ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত হবে

১. সাবালক হলে : এর বর্ণনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২. বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে : সম্পদে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হওয়া।

তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পরীক্ষা করতে হবে; যতক্ষণ সে পরীক্ষায় পাশ না করবে ততক্ষণ তাকে বুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ.

তোমরা এতিমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাহের উপযুক্ত না হয়। যদি তোমরা তাদের বুদ্ধির পরিপূর্ণতা দেখতে পাও তবে তাদের নিকট তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। [সূরা নিসা : আয়াত-৬]

নির্বোধ ও পাগলের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত যখন হবে: যখন পাগল ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে আসবে এবং বুদ্ধিজ্ঞান হবে অথবা নির্বোধ বুদ্ধিমান হবে। যার ফলে সম্পদের সুন্দর কর্তৃত্ব করতে পারে, ধোঁকায় পড়ে না এবং কোন হারামে ব্যয় করে না অথবা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে না, তখন তাদের দুজনের ওপর থেকে বিধিনিষেধ আরোপ রহিত হয়ে যাবে। আর তাদের যাবতীয় সম্পদ তাদের নিকট ফেরত দেওয়া হবে। ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে চালাকি বা টালবাহনা করা জুলুম। এ অবস্থায় তার সম্মান নষ্ট করা ও তাকে শাস্তি দেওয়া জায়েয। তাই স্বচ্ছল ঋণী ব্যক্তির টালমাটলকারীকে আদব দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটক রাখা জায়েয। আর অভাবী ব্যক্তিকে যে অংশের হকদার তা এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম ও কল্যাণকর।

১১. ওয়াকালতি

ওয়াকালতি : যেসব কাজে কারো পরিবর্তে কর্তৃত্ব করা জায়েয তাতে উকিল (অভিভাবক) নিয়োগ করাকে ওয়াকালতি বলে।

উকিল নিয়োগ করা বৈধকরণের রহস্য : ওয়াকালতি বৈধকরণ ইসলামের সৌন্দর্যের বহি:প্রকাশ। প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে কখনো তার কিছু অধিকার অন্যের প্রতি রয়েছে। আবার অন্যের অধিকার তার ওপর আছে। তাই নিজেই নেওয়া দেওয়া নিজেই করবে অথবা অন্যজনকে তা করার জন্য দায়িত্ব দেবে। আর অনেক মানুষ তার বিষয়াদি নিজেই করতে সক্ষম না। তাই ইসলাম তাকে উকিল নিয়োগ করার অনুমতি দিয়েছে, যাতে করে উকিল তার প্রতিনিধি হিসেবে তা সম্পন্ন করতে পারে।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا .

তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার পরিবার হতে একজন ও উহার পরিবার হতে একজন নিযুক্ত করবে: তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৫)

ওয়াকালতির হুকুম : ইহা একটি জায়েয আক্‌দ তথা চুক্তি। এ চুক্তি উকিল ও মুয়াক্কেল উভয়ের জন্য যে কোন সময় ভঙ্গ করা জায়েয।

ওয়াকালতি এমন কথা বা কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যা ওয়াকালতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যেসব কাজে ওকালতি জায়েয : অধিকার তিন প্রকার–

১. এমন অধিকার যাতে সর্বাবস্থায় ওয়াকালতি বিশুদ্ধ হয়। আর তা হচ্ছে যে সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব চলে যেমন : সকল ধরনের চুক্তিকরণ, চুক্তিভঙ্গণ, দণ্ডসমূহ ও এর মত আরও যা রয়েছে।

২. এমন জিনিস যাতে ওয়াকালতি কোনভাবেই বিশুদ্ধ হয় না। আর তা হচ্ছে দৈহিক এবাদতসমূহ। যেমন : পবিত্রতা অর্জন ও সালাত ইত্যাদি। অনুরূপ হারাম কাজে ওকালতি যেমন : মদ বিক্রয় অথবা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য ওকালতি।

৩. এমন জিনিস যাতে অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াকালতি চলে। যেমন : ফরজ হজ্ব ও উমরা।

ওয়াকালতির অবস্থাসমূহ : ওয়াকালতি কিছু সময়ের জন্য হতে পারে যেমন : বলা, তুমি আমার এক মাসের জন্য উকিল। আর শর্ত করেও ওকালতী সঠিক হতে পারে যেমন বলা : যখন আমার বাড়ীর ভাড়া শেষ হবে তখন তা বিক্রয় করবে। হাল অবস্থার জন্যও ওয়াকালতী বিশুদ্ধ হয় যেমন বলা : এখন তুমি আমার উকিল। ওয়াকালতী তাড়াতাড়ি এবং বিলম্ব করে গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হবে।

উকিল অন্য কাউকে ওকালতির দায়িত্বভার দেওয়ার হুকুম : উকিলের জন্য যে বিষয়ে তাকে ওয়াকালতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না। তবে মুয়াক্কেল অনুমতি দিলে পারবে। যদি ওয়াকালতি করতে অক্ষম হয় তবে আর্থিক ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিতে উকিল নিয়োগ করতে পারবে। তবে অবশ্যই মুয়াক্কেলের অনুমতি নিতে হবে।

ওকালতি বাতিল যখন হবে : নিম্নলিখিত কারণ দ্বারা ওয়াকালতি বাতিল হয়–

১. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল তথা রহিত করলে।

২. মুয়াক্কেলের পক্ষ থেকে উকিলকে অপসারণ করলে।

৩. দু' জনের মধ্যে কোন এক জনের মৃত্যু বা পাগল হলে।

৪. কোন এক জনের ওপর নির্বোধ এমন হওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ হলে।

উকিল নিয়োগের নিয়ম : পারিশ্রমিক দ্বারা বা কোন বিনিময় ব্যতীতই উকিল নিয়োগ করা জায়েয। যে বিষয়ে উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে উকিল আমানতদার। তার হাতে কিছু নষ্ট হলে এবং তার পক্ষ থেকে কোন ধরনের অবহেলা প্রদর্শিত না হলে সে খেসারত দিবেনা বা জিম্মাদার হবে না। আর যদি তার পক্ষ থেকে কোন ধরনের সীমালংঘন বা অবহেলা প্রদর্শিত হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দিবে। সে অবহেলা করেনি এমন কথা বললে কসম দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ওকালতি খোঁজ করার হুকুম : যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে পরিপূর্ণতা ও আমানতদারী জানে এবং নিজের ওপর ও আমানতের বিষয়ে খিয়ানতের আশঙ্কা করে না এবং এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ওয়াকালতীর ফলে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য ওয়াকালতী করা মুস্তাহাব; কারণ এতে রয়েছে অনেক প্রতিদান ও সওয়াব। এমনকি যদি পারিশ্রমিক গ্রহণের মাধ্যমে ভাল নিয়তে কাজ শেষ করে তবুও সে সওয়াব পাবে।

১২. কোম্পানি

কোম্পানি : দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোন অধিকার বা লেনদেনে একত্রিত হওয়াকে কোম্পানি বলে।

কোম্পানি বিধি-বিধান করার রহস্য : কোম্পানির ভিত্তি ও কোন কাজ করার বিধি-বিধান করা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের একটি। একত্রে কোন কাজ করা বরকত নাযিল ও সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তবে শর্ত হলো যদি সততা ও আমানতদারীর সঙ্গে হয়। বিশেষ করে বড় ধরণের কাজের জন্য আমনতদারী খুবই দরকার; কারণ বড় প্রকল্প এক জনের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। যেমন : শিল্প প্রকল্প, নির্মাণ কাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাষাবাদ ইত্যাদি।

কোম্পানির হুকুম : মুসলিম হোক বা বিধর্মী হোক তার সাথে কোম্পানি ভিত্তিক কাজ করার চুক্তি করা জায়েয। তাই যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা জায়েয। তবে শর্ত হলো : মুসলিম ব্যক্তি ছাড়াই বিধর্মী একাই যেন কর্তৃত্ব বা লেনদেন না করে; কারণ করলে সে হারাম কাজের কারবারী করবে। যেমন : সুদ, ধোঁকাবাজি এবং আল্লাহর হারামকৃত ব্যবসায়। যেমন : মদ, শূকর, মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসায়।

কোম্পানির প্রকার : কোম্পানি দুই প্রকার

১. **মালিকানাভুক্ত কোম্পানি :** ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তির কোন অর্থনৈতিক কাজে অংশীদারিত্ব করা যেমন : কোন ঘর-বাড়ীর মালিক হওয়ার বিষয়ে অংশীদার হওয়া। অথবা কোন শিল্প কারখানার মালিকানায় অংশগ্রহণ করা। অথবা গাড়ি ইত্যাদির মালিকানায় অংশীদার হওয়া। দু' জনের কোন একজন অপর জনের অনুমতি ছাড়া কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। যদি হস্তক্ষেপ করতে চায় তবে শুধুমাত্র নিজের শরিকানা অংশে করতে পারবে। কিন্তু যদি তার অংশীদার তাকে অনুমতি দেয় তবে সবকিছুতে পরিচালনা করতে পারবে।

২. **চুক্তি আবদ্ধ কোম্পানি :** পরিচালনায় ও লেনদেনে অংশীদার হওয়া। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা আবার কয়েক প্রকার

ক. **আমান কোম্পানি :** ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তি অংশীদার ও নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা একত্রে কোম্পানি খোলা। আর এতে কম বেশি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। দু' জনেই শ্রম দিবে অথবা একজন শুধু কাজ করবে যার লভ্যাংশ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশী হবে। এতে শর্ত হলো মূল পুঁজির পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। চাই নির্দিষ্ট টাকা হোক বা নির্দিষ্ট অবস্থানের ব্যবসায় সামগ্রী হোক। আর লাভ ও ক্ষতি দু' জনের সম্পদের পরিমাণ ও শর্ত এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হবে।

খ. **মুদারাবা কোম্পানি :** ইহা হচ্ছে কোন একজন অংশীদার অপর অংশীদারের নিকট ব্যবসার জন্য অর্থ দেবে। আর প্রচলিত কোন নিয়মের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের লাভের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌছবে। যেমন : অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এর যে কোন একটাতে ঐক্যমত ও সম্মত হবে তাই সঠিক হবে। আর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় জনের জন্য হবে। যদি ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান হয় তবে তা লভ্যাংশ থেকে পূরণ করতে হবে এবং যিনি কাজ করবে তার ওপর কিছুই আসবে না। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ব্যতীতই সম্পদ নষ্ট হয় তবে মুদারাবাকারী ব্যবসায়ী জিম্মাদারী হবে না। মুদারাবাকারী সম্পদ কব্জা করার বিষয়ে আমানতদার আর পরিচালনার বিষয়ে উকিল এবং কাজের বিষয়ে শ্রমিক ও লাভে অংশীদার।

সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা : ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যা জায়েয না এমন কাজ করা সীমালঙ্ঘন। আর অবহেলা প্রদর্শন হলো : যা করা ওয়াজিব তা ত্যাগ করা।

অজুহ (খ্যাতি দ্বারা) কোম্পানি : কোন সম্পদ ছাড়া নিজেদের দু' জনের পরিচিতি ও ব্যবসায়ীদের মাঝে বিশ্বাসের দ্বারা নিজেদের জিম্মায় কোন কিছু কিনে যা লাভ হবে তা দু'জনের মাঝে বন্টন করা। এদের একে অপরের উকিল ও জিম্মাদার। আর তাদের মাঝে মালিকানা হবে যে শর্তাদির ওপর তারা ঐক্যমত হয়েছে। তাদের মালিকানা অনুপাতে লোকসান নির্ধারণ হবে এবং লাভ বন্টন হবে তাদের মাঝে যে শর্ত একমত ও সন্তুষ্টি হয়েছে সে হিসেবে নির্ধারণ হবে।

আবদান তথা দৈহিক কোম্পানি : দু'জন বা অধিক ব্যক্তি দৈহিকভাবে হালাল উপার্জনে অংশীদার হওয়া। যেমন : কাঠ কাটা ও সকল ধরনের পেশা ও কাজ কর্ম। এর দ্বার আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রুজিদান করবেন তা তাদের মাঝে যে ভাবে ঐক্যমত ও সম্মত হবে সে হিসেবে বন্টন হবে।

মুফাওয়াযা কোম্পানি : প্রত্যেক অংশীদার তার অপর অংশীদারকে অর্থনৈতিক ও দৈহিক যত ধরনের অংশীদারিত্ব ও জিম্মাদারিত্ব আছে সব তার জিম্মায় কর্তৃত্ব দেওয়া। ইহা পূর্বের চার প্রকারের অংশীদার ভিত্তির সমন্বয়। আর লাভ তাদের মাঝের শর্ত অনুযায়ী এবং লোকসান কোম্পানির মালিকানার পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ হবে।

কোম্পানির উপকার : আমান, মুদারাবা, ওজুহ, ও আবদান কোম্পানির পদ্ধতি সম্পদ বৃদ্ধি করার এক উত্তম মাধ্যম এবং উপকার পৌছানোর ভাল আস্থা ও ইনসাফ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। আনানে উভয় পক্ষ থেকে সম্পদ ও কাজ সমান হবে। মুদারাবাতে রয়েছে এক পক্ষের সম্পদ আর অপর পক্ষের পরিশ্রম। আর আবদানে রয়েছে দু' জনের পক্ষ থেকে কাজ এবং ওজুহতে রয়েছে মানুষের মাঝে সুপরিচিতি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা।

এ জাতীয় কোম্পানিগুলো লেনদেনে সুদি কারবার যা জুলুম ও বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট। আর হালাল পন্থায় সীমা রেখার মধ্যে থেকে উপার্জনের পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ ঘটে। শরিয়ত মানুষকে একাকি বা যৌথভাবে শরিয়ত সম্মত উপায়ে উপার্জন করা জায়েয করে দিয়েছে।

বৈধ কোম্পানির জন্য শর্তাবলী : শরিয়ত যেসব কোম্পানিকে বৈধ করেছে তার জন্য শর্ত হলো

১. প্রত্যেক অংশীদারের মূলধন যেন জানাশুনা হয়।

২. প্রত্যেক অংশীদারের মূলধন হিসেবে লাভের অংশ ভাগ হতে হবে। অথবা একজনের এক তৃতীয়াংশ বা একাংশ আর বাকি অপরের জন্য।

৩. কোম্পানির কারবার এমন কাজ ও বিষয়ে হতে হবে যা শরিয়তে জায়েয।

ব্যবসায় কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করার হুকুম : যদি কোন বিধর্মী কোম্পানি কোন দেশের কোন নাগরিকের সাথে একমত পোষণ করে যে, সে তার নাম ও পরিচিতি ব্যবহার করবে এবং তার নিকট থেকে কোন ধরনের সম্পদ ও কাজ চাইবে না। আর এর বিনিময়ে তাকে কিছু নির্দিষ্ট টাকা বা লাভের কিছু অংশ দেবে, তাহলে এ ধরণের কাজ নাজায়েয এবং এ ধরণের চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। কারণ এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষতি যা শরিয়তে হারাম। আর পূর্বে উল্লেখিত কোম্পানিগুলো এ জাতীয় কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা।

১৩. শস্যক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষাবাদ

ক্ষেতে সেচ দেওয়া : যে গাছের ফল হয় যেমন : খেজুর ও আঙ্গুর গাছ কাউকে এ শর্তে দেওয়া যে, এর ফল পাকা পর্যন্ত সেচ দিবে এবং যা কিছু দরকার তা করবে। এর পরিবর্তে তাকে প্রচলিত নিয়মে ফলের কিছু নির্দিষ্ট অংশ দিবে যেমন : অর্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ অথবা অন্য কোন পরিমাণ। আর অবশিষ্টাংশ মালিকের থাকবে।

বর্গায় জমি চাষ : প্রচলিত নিয়মে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের পরিবর্তে আবাদ করার জন্য ভূমি দেওয়া। যেমন : অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি আর অবশিষ্টাংশ জমির মালিকের।

জমিতে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদের ফজিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে বা কোন শস্যক্ষেত চাষাবাদ করবে। আর তা থেকে পাখি বা মানুষ কিংবা জীবজন্তু খাবে ইহা সে ব্যক্তির জন্য সদকায় পরিণত হবে।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩২০ মুসলিম হাদীস নং ১৫৫৩)

বদলার বিনিময়ে গাছে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বিধিবিধান করার রহস্য : কিছু সংখ্যক মানুষ এমন আছে যে জমিন ও গাছের মালিক অথবা জমিন ও বীজের মালিক। কিন্তু সে নিজে সেচ দেওয়া ও পরিচর্যা করতে অক্ষম। তা না জানার কারণে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে করতে পারে না। অন্য দিকে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে সে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার মালিকানাভুক্ত কোন গাছ বা জমি নেই। তাই উভয় পক্ষের উপকারার্থে ইসলাম বদলে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ জায়েয করেছে। আর এর ফলে জমিনের চাষাবাদ, সম্পদের বৃদ্ধি ও খেটে খাওয়া মানুষ তথা যারা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু সম্পদ ও গাছের মালিক না তাদের হাতকে কাজে লাগানো হয়।

একত্রে বিনিময়ে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষের হুকুম : বিনিময়ে সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের চুক্তি একটি আবশ্যকীয় চুক্তি। ইহা অন্য পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতীত রহিত বা সম্পাদন করা জায়েয নেই। এর জন্য শর্ত হলো সময় নির্দিষ্টকরণ যদিও তা দীর্ঘ হয় না কেন। আর দু'পক্ষের সন্তুষ্টিচিত্তে হতে হবে। একই বাগানে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের সমন্বয় ঘটানো জায়েজ আছে। যেমন প্রচলিত নিয়মের নির্দিষ্ট ফলের এক অংশ দ্বারা পানি সেচ দেবে আর শস্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বিনিময়ে জমিন চাষ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ খয়বারের জমিন চাষাবাদ করার জন্য অর্ধেক অংশের বিনিময়ে কৃষক নিয়োগ দেন। সে জমিন থেকে যে ফল বা শস্য উৎপাদন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩২৮, মুসলিম হাদীস নং ১৫৫১)

মুখাবারা : ভূমির মালিক এ শর্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া যে, যে অংশ পানির ড্রেন ও সেচের পার্শ্বের সে অংশ তার। অথবা ক্ষেতের কোন নির্দিষ্ট অংশ কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া। ইহা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে রয়েছে ধোঁকাবাজি ও অজ্ঞতা এবং বিপদ। দেখা যাবে যে, কখনো এ অংশ ভাল হবে ও অন্য অংশ নষ্ট হয়ে যাবে; যার ফলে দু' জনের মাঝে ঝগড়া বাধবে।

জমি ভাড়া দেওয়ার হুকুম : টাকার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেওয়া জায়েজ। অনুরূপ প্রচলিত নিয়মে শস্যের কিছু নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যেমন : অর্ধেক বা এক তৃতীয় অংশ ইত্যাদিও জায়েয।

ভূমি চাষে, শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও ঘর বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে বিধর্মীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন করা জায়েয। তবে শরিয়তের সাথে কোন ধরনের দ্বন্দ্ব যেন না হয়।

কুকুর পোষার হুকুম : কোন প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পোষা মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারাম। প্রয়োজন যেমন : শিকারী কুকুর, পশু চরানোর জন্য কিংবা ক্ষেত পাহারা ও দেখা শুনার জন্য। কারণ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَّلا مَاشِيَةٍ وَلاَ مَاشِيَةِ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.

যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা শিকার করার জন্য বা পশু চরানো কিংবা ক্ষেত পাহারার জন্য না এমন কুকুর রাখে তার প্রতি দিন দু' কিরাত সওয়াব কমে যায়।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩২২ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭৫)

অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো সম্পদ জ্বালানোর হুকুম : যদি কোন ব্যক্তি তার নিজ মালিকানাভুক্ত স্থানে সঠিক কোন উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর পর বাতাসে তা উড়িয়ে নিয়ে অন্যের সম্পদ জ্বালিয়ে দেয় এবং বাঁধা দেওয়ার কোন পন্থা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার জিম্মাদার হবে না।

১৪. ভাড়া

ভাড়া : উপকারি কোন বৈধ বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট বদলার বিনিময়ের চুক্তিকে ভাড়া বলে।

ভাড়ার হুকুম : ভাড়া দুই পক্ষের মধ্যের একটি আবশ্যকীয় চুক্তি। যে সকল শব্দ ভাড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে তা দ্বারা ভাড়া সংঘটিত হয়। যেমন : তোমাকে ভাড়া দিলাম বা যে সকল প্রচলিত শব্দ দ্বারা সমাজে ভাড়া নির্দিষ্ট হয়।

ভাড়ার হুকুম শরিয়ত সম্মত করার রহস্য : ভাড়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের মাঝে উপকারী জিনিসের বিনিময় করতে পারে। কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ির দরকার মনে করে। আর জীবজন্তু গাড়ি ও মেশিনারী ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয় বহন ও যাত্রা এবং উপকারের জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা ভাড়া পদ্ধতিকে মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য জায়েয করেছেন। আর অল্প মালের বিনিময়ে মানুষের দুই পক্ষের প্রয়োজন পূরণ ও উপকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কাজেই সকল প্রসংশা ও এহসান এক মাত্র আল্লাহরই।

ভাড়ার প্রকারভেদ : ভাড়া দেওয়া দুই প্রকার–

১. জানা-শুনা জিনিসের ভাড়া দেওয়া। যেমন : তোমাকে এ বাড়িটি বা গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিলাম।

২. নির্দিষ্ট কাজের উপর ভাড়া নেওয়া যেমন : কোন মানুষকে প্রাচীর নির্মাণ বা জমি চাষ ইত্যাদির জন্য ভাড়া নেওয়া।

ভাড়া দেওয়ার শর্তসমূহ : ভাড়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. এমন ব্যক্তির দ্বারা হওয়া যার কর্তৃত্ব জায়েয।

২. উপকার কি তা জানা-শুনা হওয়া। যেমন : বসবাসের বাড়ি বা মানুষের খিদমত ইত্যাদি।

৩. ভাড়ার পরিমাণ জানা-শুনা হওয়া।

৪. উপকারী বৈধ জিনিসের জন্য ভাড়া দেওয়া। যেমন : বাড়ি ভাড়া বসবাসের জন্য। তাই কোন হারাম জিনিসের উপকারিতার জন্য ভাড়া দেওয়া চলবে না। যেমন : কোন বাড়ি বা দোকান মদ বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া। অথবা পতিতালয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া। অনুরূপ কোন বাড়িকে মন্দির বা গির্জা বানানো কিংবা হারাম জিনিস বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া।

৫. দেখে বা বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট ভাড়ার জিনিসকে জানা শর্ত। আর চুক্তি উপকারের সমষ্টির উপর হবে তার কোন অংশের প্রতি না। ভাড়ার জিনিস হস্তান্তর যোগ্য ও বৈধ উপকারী জিনিস হতে হবে। আর ভাড়ার জিনিস ভাড়াদাতার মালিকানাভুক্ত অথবা সে ভাড়া দেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

ভাড়াটিয়া জিনিস অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়ার হুকুম : ভাড়াটিয়া নিজে নির্দিষ্ট উপকারিতা গ্রহণ করতে পারবে। ভাড়াটিয়ার জন্য তার অনুরূপ বা তার চেয়ে কম উপকার অর্জনকারীকে ভাড়াকৃত জিনিস ভাড়া দেওয়া জায়েয। তবে তার চেয়ে বেশি উপকার অর্জনকারীকে ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই; কারণ এতে মূল মালিকের ক্ষতি রয়েছে।

প্রচলিত জিনিসের ভাড়া পরিশোধের অবস্থাসমূহ : যদি কেউ কোন চুক্তি ছাড়াই বিমানে বা গাড়িতে কিংবা পানি জাহাজে আরোহণ করে অথবা সেলাই করার জন্য দর্জিকে কাপড় দেয় কিংবা কুলি ভাড়া নেয় তবে এগুলো প্রচলিত ভাড়ার নিয়মে বিশুদ্ধ হবে।

ওয়াকফকৃত বস্তুর ভাড়া দেওয়ার হুকুম : ওয়াকফকৃত জিনিস ভাড়া দেওয়া বৈধ, ভাড়াদাতা মৃত্যুবরণ করলে ও তার প্রতিনিধির নিকট তা হস্তান্তর হলে তাতে ভাড়ার চুক্তি ভঙ্গ হবেনা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদানে অংশ পাবে।

যে জিনিস বিক্রয় করা হারাম তা ভাড়া দেয়াও হারাম। কিন্তু ওয়াকফকৃত বস্তু স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস পুত্রের মা ব্যতীত হতে হবে।

ভাড়া যখন ওয়াজিব হবে : চুক্তির সাথে সাথেই ভাড়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তা বুঝিয়ে দেয়া ফরজ হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু উভয় পক্ষ যদি তা পেছানো অথবা আগানো কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের ওপর একমত হয়, তবে তা জায়েয। শ্রমিক তার কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করার পর প্রতিদানের অধিকারী হয়। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করা উচিত হয়ে পড়ে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শেষ বিচারের দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব : ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে হলফ করে প্রতিশ্রুতি দিল। অত:পর সে তা ভঙ্গ করল। এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ভাড়া করে কাজ আদায় করে নিল অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না। (বুখারী, হাদীস নং ২২৭০)

ভাড়া দেওয়া জিনিস বিক্রয় করার হুকুম : ভাড়ায় আছে এমন জিনিস বিক্রয় করা বৈধ যেমন ঘর, গাড়ী ইত্যাদি।

ভাড়াটিয়া তার মেয়াদ শেষ করার পর ক্রেতা তা বুঝে নিবে।

ভাড়াটিয়া বস্তুর আমানতদারীর হুকুম : ভাড়াকৃত ব্যক্তির অবহেলা কিংবা অপব্যবহার ব্যতীত কোন জিনিস বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কোন নারীর পক্ষে স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন কাজ কিংবা দুধ পান করানোর কাজে নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা নাজায়েয।

শিক্ষা দানে ও মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে বদলা গ্রহণ জায়েয।

এবাদতের কাজ করে ভাতা গ্রহণ করার হুকুম : ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে ভাতা গ্রহণ জায়েয। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা করবে তার জন্য তাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে। আর যারা রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করবে তা সওয়াবের কাজে সহযোগিতা হিসেবে নিবে প্রতিদান বা বদলা হিসেবে নয়।

মুসলিমের জন্য কোন কাফেরের নিকট কাজ করার হুকুম : কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে কাফিরের কাজ করা তিনটি শর্তে জায়েয−

১. এমন কাজ হওয়া যা মুসলিমের জন্য করা জায়েয।

২. এমন কাজে সহযোগিতা করবে না যার ক্ষতি মুসলমানদের প্রতি বর্তাবে।

৩. এমন কাজ করবে না যাতে মুসলিমের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে।

বিশেষ প্রয়োজনে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরকে ভাড়া করে নিতে পারে যেমন : মুসলমান না পাওয়া অবস্থায়।

হারাম কাজে ব্যবহারকারীদের নিকট কিছু ভাড়া দেয়ার হুকুম : যারা হারাম কাজে ব্যবহার করে তাদের নিকট ঘর-বাড়ি, দোকানপাট ভাড়া দেয়া নাজায়েয। যেমন : গান-বাদ্যের হারাম যন্ত্রপাতি, উলঙ্গ ফিল্ম, মনভুলনো ছবি। এমনিভাবে

যারা হারাম লেনদেন করে যেমন : সুদী ব্যাংক। এ ছাড়া যে ব্যক্তি দোকানকে মদ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিণত করবে অথবা গায়ক ও ব্যভিচারীদের থাকার স্থান নির্মাণ করবে কিংবা বিড়ি-সিগারেট বিক্রয়, দাড়ি মুন্ডানোর সেলুন, গান ও সিনেমার অডিও, ভিডিও, সিডির আড্ডাখানা বানানোর কাজে সহযোগিতা করা হয় যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

তোমরা সওয়াব ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা মায়েদা : আয়াত-২]

ভাড়ার স্থান খালি করার বিনিময়ে কিছু দেওয়ার হুকুম : কোন বাসা বা দোকান এর চাহিদা বেশি দেখা দেয় ফলে এমতাবস্থায় ভাড়ার মেয়াদের ভেতর ভাড়াটিয়াকে ভাড়ার মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে হলেও তা দেয়া যাবে তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলে তা করা চলবেনা।

খেসারত বহণমূলক শর্তের হুকুম : খেসারত বহনমূলক শর্ত যা সচরাচর মানুষের মধ্যে চলে বান্দাদের অধিকারে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মেনে নেয়া আবশ্যক। তা চুক্তি সম্পন্ন করার নিমিত্তে তাৎক্ষনিক জায়েয। এতে অরাজকতা ও খেলতামাশার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শরয়ী ওজর না থাকা পর্যন্ত তার অপরিহার্যতা বলবত থাকবে, তবে তা পাওয়া গেলে অপরিহার্যতা বাদ পড়ে যাবে। শর্ত যদি সচরাচর প্রচলিত নিয়মের আলোকে বেশি বিবেচিত হয় তবে বিচারপতির কথা অনুযায়ী ক্ষতি ও লাভ বিলুপ্তির হারে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি ফিরে যেতে হবে। উদাহরণ যেমন : এক ব্যক্তি অপরজনের সাথে এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এক বৎসরে কোন দালান নির্মাণ করে দেয়ার চুক্তি করল এবং সাথে এও বলে রাখল যে, যদি এক বৎসর থেকে মেয়াদ দীর্ঘ হয় তবে প্রত্যেক মাসে এক হাজার (ফেরত) দিতে হবে, ফলে দেখা গেল যে, চার মাস বিলম্ব হল তাহলে ঘরের মালিককে চার হাজার টাকাই দিতে হবে।

১৫. প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কৃতকরণ

প্রতিযোগিতা : অন্যের আগে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার নাম প্রতিযোগিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতা জায়েয। আবার কখনো নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুস্তাহাবও বটে। বিজয়ীর পরিশ্রমের বিনিময় দেওয়াকে সাবাক্ বলে।

প্রতিযোগিতা বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য : প্রতিযোগিতা ও কুস্তিগিরী হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্য থেকে দুটি জায়েয কাজ। এতে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলের ওপর কমলতা ও প্রশিক্ষণ, আক্রমণ ও পলায়ন, শরীরচর্চা, ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহকে প্রস্তুত করার এ সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ : প্রতিযোগিতা দৌড়ের মাধ্যমে হতে পারে, তীর কিংবা অস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে হতে পারে এবং ঘোড়া ও উটের মাধ্যমেও তা হতে পারে।

প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১. বাহন অথবা অস্ত্র একই প্রকৃতির হওয়া।

২. দূরত্ব ও ছুড়ে মারার স্থান নির্ধারণ।

৩. পুরস্কার বৈধ ও পরিচিত হওয়া।

৪. বাহন কিংবা নিক্ষেপকারীদের নির্দিষ্টকরণ।

কুস্তিগিরী ও মুষ্টিযুদ্ধের হুকুম

১. কুস্তিগিরী ও সাতার কাটাসহ দেহকে শক্তিশালী করে এবং ধৈর্য ও সাহসিকতার সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ জায়েয। এর জন্য শর্ত হচ্ছে কোন আবশ্যকীয় কিংবা উক্ত কাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে যেন বিরত না রাখে অথবা সে কাজে কোন নিষেধ না থাকে।

২. বর্তমানে লাগামহীন ব্যয়ামগার গুলোতে যেসব মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির চরিতার্থ করা হয় তা হারাম; কারণ এতে আশঙ্কা, ক্ষতি ও বিশেষ অঙ্গের আওরত প্রকাশ পেয়ে থাকে যা শরিয়তে হারাম।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও লেলিয়ে দিয়ে লড়াই করানো হারাম। যেমন : মোরগ ও ষাঁড় ইত্যাদির লড়াই। অনুরূপ কোন পশুকে তীর ছুড়ে মারার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাও হারাম।

প্রতিযোগিতায় বদলা নেওয়ার হুকুম : বদলা নিয়ে প্রতিযোগিতা উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছুতে নাজায়েয; কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَا سَبَقَ اِلَّا فِىْ نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ.

তীর, ঘোড়া ও উট ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিদানমূলক প্রতিযোগিতা শরিয়ত অনুযায়ী নয়। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা নং ২৫৭৪, তিরমিজী হাঃ নং ১৭০০)

প্রতিযোগিতায় বিনিময় গ্রহণে তিনটি অবস্থা

১. বিনিময় সহকারে যা জায়েয। ইহা হচ্ছে উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা।

২. বিনিময় কিংবা বিনিময় ছাড়া কোন ভাবেই জায়েয নয় যেমন : পাশা খেলা, দাবা খেলা কিংবা জুয়া খেলা ইত্যাদি।

৩. বিনিময় ছাড়া জায়েয কিন্তু বিনিময়সহ নাজায়েয। আর ইহাই হলো আসল ও অধিকাংশ প্রতিযোগিতা। যেমন : দৌড় প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ কিংবা কুস্তিগিরী। এ সবে অনির্দিষ্ট ও নাম ঘোষণা ছাড়া পুরস্কার বা বদলা দেওয়া জায়েয।

জুয়া : এমন প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন যা বিনাকষ্টে অর্জন বা লোকসান অর্জন হয়।

জুয়া ও বাজি খেলার হুকুম : জুয়া, বাজি ও পাশা খেলা হারাম।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ.

অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর অপবিত্র যা শয়তানের কাজ।
[সূরা মায়েদা : ৯০]

عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِىْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ .

২. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি পাশা খেলল সে যেন তার হাতকে শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।

(মুসলিম হাঃ নং ২২৬০)

ফুটবল খেলার হুকুম : ফুটবল খেলা জায়েয বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। যদি ফুটবল খেলা কোন ফরজ ত্যাগ অথবা ফরজ আদায় করতে বিলম্ব কিংবা কোন পাপে পতিত হওয়া বা কোন ক্ষতি বয়ে আনে কিংবা কল্যাণে বাধা হয়, তাহলে ইহা সেই বাতিল খেলার শামিল হবে যা আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখে। তখন এ খেলা হারাম হবে; কারণ শরিয়তে ক্ষতিকর জিনিসকে দূরীকরণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন জিনিসের পূর্বে করা একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই যা হারাম পর্যন্ত পৌছায় তা হারাম। আর মুসলিমের জন্য উত্তম হলো সে যেন তার সময়ের সংরক্ষণ করে। তাই সে নিজের, আল্লাহ্র সৃষ্টির, তাদেরকে দাওয়াতে, শরিয়ত শিক্ষায়, জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি দুনিয়া ও দ্বীনের উপকারী কাজে সময় ব্যয় করবে। এ ছাড়া তার কিছু সময় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের জন্য নিযুক্ত করবে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আপনি বলুন : আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। [সূরা আন'আম : আয়াত-১৬২]

২. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কোন কথা বল না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৩৬]

বাণিজ্যিক বাজার থেকে উপহার গ্রহণ করার হুকুম : বাজারে যেসব উপহার ও পুরস্কার দেয়া হয় বড় অংকের পণ্যের উপর কিংবা শৈল্পিক, বাণিজ্যিক ও শরীরচর্চার মেলার প্রতিযোগিতায় অথবা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ও ছবি গ্রহণ, ফ্যাশন ও বিশ্ব সুন্দরী ইত্যাদি। প্রতিযোগিতায় এমন সব পুরস্কার দেয়া হয় যা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম কাজে পতিত করে। এসব জাতির বিবেককে নিয়ে তামাশা করার নামান্তর এবং তার সম্পদ বাতিল পন্থায় খাওয়া, সময় নষ্ট করা, দ্বীন ও চরিত্র ধবংস করা। আর সর্বোপরি তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিরত রাখা হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এসব কাজ থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।

১৬. ব্যবহারের জন্য বস্তু দান

'আ-রিয়া তথা বস্তু দান : এটি হচ্ছে কোন জিনিস যা থেকে উপকার গ্রহণের পর মূল জিনিস বাকী থাকে এবং কোন বিনিময় ছাড়াই তা ফেরত দেয়া হয়।

ইহা প্রবর্তনের তাৎপর্য : কখনো কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু তার সে জিনিস ক্রয় করা কিংবা ভাড়া করার সামর্থ্য থাকে না। পক্ষান্তরে অপর পক্ষ দান খয়রাতও করে না। এমতাবস্থায় ইসলাম এ জাতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এবং দানকারী ব্যক্তি মূল জিনিস বাকী রেখে শুধু ব্যবহারের সুবিধা দিয়েই প্রতিদান ও সওয়ার পেয়ে যায়।

ব্যবহার্য জিনিস দানের হুকুম : ব্যবহার্য জিনিস দেয়া প্রীতিকর সুন্নত, কারণ এতে রয়েছে অনুগ্রহ, প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা এবং সমপ্রীতি ও ভালোবাসা লাভের পন্থা। ইহা দান জিনিস বুঝানোর জন্য যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

ব্যবহার্য জিনিস দানের শর্ত : বস্তুটির অস্তিত্ব বহাল থাকা অবস্থায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপযোগী হওয়া। এ ছাড়া উপকৃত হওয়ার কাজ জায়েয হওয়া এবং তার হস্তান্তরকারীকে যোগ্যতা ও মালিকানার অধিকারী হওয়া।

যা দান করা জায়েয : প্রত্যেক বৈধ সুবিধা অর্জন করা যায় বস্তুতে উক্ত দান প্রযোজ্য। যেমন : ঘর, বাহন, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

যা দান করা নাজায়েয : আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে জিনিস দান করা হারাম। যেমন : মদের পান পাত্র ও পতিতালয় ইত্যাদি।

দানকৃত জিনিস সংরক্ষণকরণ : জিনিস গ্রহণকারীর প্রতি তার সংরক্ষণ করা ও ক্রটিমুক্ত অবস্থায় মালিকের নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব। জিনিস গ্রহণকারী অন্য কাউকে তা মালিকের অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না।

দানকৃত বস্তুর জামানতদারী : জিনিস গ্রহণকারীর হাতে 'আ-রিয়া নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে, চাই অবহেলা করুক বা না করুক। কারণ যে জিনিস হাত দ্বারা গ্রহণ করা হয় তা তারই জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তা আদায় করে। কিন্তু যদি দাতা ক্ষমা করে দেয় তবে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করতে হবে না।

১. আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে শুরু কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

[সূরা নিসা : আয়াত-৫৮]

عَنْ يَعْلٰى (رضى) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِىْ فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا وَثَلَاثِيْنَ بَعِيْرًا قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّةٌ؟ قَالَ : بَلْ مُؤَدَّاةٌ ـ

২. ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : যখন তোমার নিকট আমার দূতরা আসবে তখন তাদেরকে ৩০টি বর্ম এবং ৩০টি উট দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলোকি ফেরতযোগ্য না অফেরতযোগ্য? তিনি (রা) বললেন : ফেরতযোগ্য।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হা : নং ৩৫৬৬)

দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হওয়া : দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হবে–

১. দানকৃত বস্তু গ্রহণকারী তা ফেরত দিলে।

২. দু' জনের কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে বা পাগল হলে।

৩. দেউলিয়ার কারণে দানকারীর প্রতি বাধানিষেধ আরোপ হলে।

৪. কোন একজনের প্রতি নির্বোধ হওয়ার কারণে বাধানিষেধ আরোপ হলে।

১৭. জবরদখল

জবরদখল : অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উপর জোরপূর্বক অনধিকার চর্চা করে দখল করাকে জবরদখল বলে।

জুলুমের প্রকার : জুলুম সর্বমোট তিন প্রকার

প্রথম : এমন জুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়েন না।

দ্বিতীয় : এমন জুলুম যা আল্লাহ্ ক্ষমা করেন।

তৃতীয় : এমন জুলুম যা ক্ষমা করেন না। যে জুলুমকে আল্লাহ্ মাফ করেন না তা হচ্ছে শিরক। ইহা আল্লাহ কখনো মাফ করেন না। আর যে জুলুম ক্ষমা করা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে বান্দা কৃর্তক যা সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যে জুলুমকে আল্লাহ ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক যা ঘটে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা একজন থেকে অপর জনের প্রতিশোধ আদায় করবেন।

জবরদখলের হুকুম : জবরদখল করা হারাম। কারো পক্ষে অন্যের অসন্তুষ্টিতে তার যে কোন জিনিস আয়ত্ব করা নাজোয়েয।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা পরস্পর বাতিল উপায়ে সম্পদ খেয়ো না। আর এটি নিয়ে বিচারকদের সমীপে উপস্থিত হয়ো না, যাতে জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অপরের কিছু সম্পদ ভক্ষণ করতে পার। [সূরা বাকারা :আয়াত-১৮৮]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

২. সা'য়ীদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জুলুম করে জমিনের এক বিঘত জবরদখল করবে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি পরাবেন। (বুখারী, হাঃ নং ৩১৯৮, মুসলিম, হাঃ নং ১৬১০)

জবরদখল জমিতে যে কিছু করবে তার হুকুম

১. কোন জমি জবরদখল করে কেউ তাতে কিছু রোপণ কিংবা নির্মাণ করলে তা অপসারণ করা আবশ্যক। আর মালিক ইচ্ছা করলে তার ক্ষতিপূরণসহ সমান করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে উভয়জন মূল্যের উপর একমত হলে জায়েয হবে।

২. জবরদখলকারী জমিতে চাষ করার পর ফসল তুলে জমি ফেরত দিলে ফসল তারই থাকবে। কিন্তু জমির মালিককে ভাড়া দিয়ে দিতে হবে। আর ফসল তাতে বিদ্যমান থাকলে মালিককে দু'টি সমাধানের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হবে; ফসল তুলা পর্যন্ত সমমানের ভাড়ার ভিত্তিতে তা থাকতে দিবে অথবা ব্যয় ভার বহন করে নিজে তা নিয়ে নিবে।

জবরদখলকৃত ফেরত দেয়ার হুকুম : জবরদখলকারী বহুগুণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দখলকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে; কেননা তা অন্যের অধিকার ফলে তাকে তা ফেরত দিতেই হবে। আর যদি এটি দ্বারা ব্যবসা করে থাকে তবে এর লাভ উভয়ের মাঝে ভাগ করা হবে। আর জবরদখলকৃত বস্তুর উপর ভাড়া আসতে থাকলে জবরদখলকারী দখলকৃত বস্তুর সাথে সাথে তার হাতে থাকার মেয়াদ অনুযায়ী ভাড়াও বুঝিয়ে দিবে।

জবরদখলকৃত জিনিস পরিবর্তিত হলে তার হুকুম : ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত বস্তু দ্বারা কিছু বুনে থাকলে, কাপড় ছোট করে থাকলে কিংবা কাঠ দ্বারা কিছু প্রস্তুত করলে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। এমনকি ক্ষতিপূরণসহ দিতে হবে এবং এ থেকে অপহরণকারী কিছুই পাবে না।

জবরদখলকৃত জিনিস অন্য বস্তুর সাথে মিশে গেলে তার হুকুম : অপহরণকারী যদি হরণকৃত বস্তুকে এমন বস্তুর সাথে মিশিয়ে ফেলে যা আলাদা করা অসম্ভব যেমন : তেল কিংবা চালকে তার মত তেল বা চালের সাথে মিশানো। এমতাবস্থায় মূল্য কম-বেশী না হলে উভয়ে যার যার পরিমাণ মত অংশীদার বিবেচিত হবে। আর কম হলে হরণকারী তা বহণ করবে আর অধিক হলে যার অংশের মূল্য অধিক হবে সে তা পাবে।

জবরদখলকৃত জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তার হুকুম : অপহরণকৃত জিনিস বিনষ্ট কিংবা দোষযুক্ত হলে যদি তা কোন বস্তুর সমতুল্য হয়ে থাকে, তবে ঐ সমতুল্য জিনিস দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তা এ জাতীয় না হয়, তবে সমতুল্য জিনিস লাভ করা অসম্ভব হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা বর্তাবে।

জবরদখলকারীর কার্যাদির হুকুম : অপহরণকারীর যত কাজ যেমন : বিবাহ, ব্যবসা কিংবা হজ্ব, যাই হোক না কেন মালিকের অনুমতির ওপর ভিত্তিশীল, যদি সে অনুমতি দেয় তবে তা চলবে নচেৎ নয়।

অপহরণের বিষয়ে যার কথা গ্রহণযোগ্য : বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর মূল্য, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যের শপথ সহকারে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কোন সাক্ষ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তা ফেরত দেওয়া ও দোষমুক্ত হওয়াতে মালিকের কথাই চূড়ান্ত হবে যতক্ষণ না কোন সাক্ষ্য এর বিপরীতে পাওয়া যাবে।

অন্যের মালিকানা বিনষ্ট করলে তার হুকুম

১. যদি কেউ কোন পিঞ্জর-খাঁচা, দরজা, ঢাকনা, বন্ধন কিংবা গিরা খুলে দেয় যার ফলে ভেতরের জিনিস চলে যায়, তবে সে দায়িত্বশীল হোক আর নাই হোক ক্ষতিপূরণ দিবে; কেননা সেই অপরের জিনিস হারিয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন পাগল কুকুর বা সিংহ কিংবা নেকড়ে বাঘ অথবা আহতকারী পাখি ইত্যাদি পুষে। আর তা ছেড়ে রাখার ফলে কারো কোন ক্ষতি হলে, মালিককে তার জামানত দিতে হবে।

চতুষ্পদ জন্তু কিছু বিনষ্ট করলে তার হুকুম : চতুষ্পদ জন্তু রাতের বেলায় ফসল জাতীয় কিছু বিনষ্ট করলে মালিক দায়ি হবে। কেননা রাতের বেলা এগুলোকে সংরক্ষণের দায়িত্ব তার। পক্ষান্তরে দিনের বেলায় একাজ ঘটলে সে দায়ী হবে না। কেননা উক্ত সময় পাহারার দায়িত্ব ফসলের মালিকের। কিন্তু পশুর মালিক যদি তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করবে।

জবরদখলকৃত জিনিস ফেরত দেয়ার হুকুম

১. যদি কেউ হরণকৃত জিনিস ফেরত দিতে চায় কিন্তু মালিককে না পায় তাহলে তা সুবিচারক বিচারপতির হাতে জমা দিয়ে দিবে। আর যদি সুবিচারক না পায় তাহলে তার পক্ষ থেকে দান করবে এবং পরবর্তিতে মালিক (পাওয়া গেলে) জানানোর পর মেনে না নিলে ক্ষতিপূরণ দিবে।

২. যখন হরণকারীর নিকট হরণকৃত জিনিস চুরিকৃত মাল, আমানত, গচ্ছিত সম্পদ কিংবা বন্ধকীকৃত ইত্যাদি কিছু জমা থাকবে। আর তার মালিককে জানা না যাবে, তখন সে তা দান করতে পারবে। অথবা মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থে তা খরচ করবে, ফলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদের হুকুম : যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ রোজগার করল যেমন : মদের মূল্য অত:পর তওবা করল, এ অবস্থায় সে যদি হারাম প্রসঙ্গে পূর্ব থেকেই জেনে না থাকে বরং পরে তা জানে তাহলে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু যদি এর হারাম প্রসঙ্গে পূর্ব থেকে জেনে থাকে তবে তা ব্যবহার করতে পারবে না বরং কোন কল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করে দায় মুক্ত হতে হবে।

হারাম জিনিস বিনষ্ট করার হুকুম : গান-বাদ্যের যন্ত্র, ক্রুশ, মদের পাত্র, পথভ্রষ্টতা ও চরিত্র ধ্বংসী গ্রন্থ ও যাদু টোনার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনষ্ট করলে কোন দায়িত্ব বর্তায় না; কেননা এসব হারাম বস্তু যা বিক্রয় করা নাজায়েয। তবে হ্যাঁ এগুলো রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও তার তত্ত্বাবধানে অবশ্যই হতে হবে যাতে অরাজকতার পথ বন্ধ হয় এবং সুবিধার পথ সুনিশ্চিত হয়।

আগুন পুড়িয়ে ফেললে তার হুকুম : যে তার মালিকানাধীন হুকুম আগুন ধরাল এবং তার অবহেলার ফলে অন্যের অধিকার পর্যন্ত তা অতিক্রম করে কিছু নষ্ট করে ফেলল, তবে সে তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে যদি বাতাস তা ছড়িয়ে থাকে তবে সে তার দায়িত্ব বহন করবে না; কেননা এতে তার কোন দখল বা ক্রটি নেই।

চতুষ্পদ জন্তু রাস্তার উপর মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম : চতুষ্পদ জন্তু যখন পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে এমতাবস্থায় তাকে কোন গাড়ি আঘাত করে মেরে ফেললে তার কোন বিচার নেই এবং তাকে নিহতকারী ব্যক্তির ওপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না, যদি সে অবহেলা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে থাকে। পক্ষান্তরে জন্তুর মালিক একে ছেড়ে দেওয়া ও তার বিষয়ে উদাসিনতা প্রদর্শনের ফলে পাপী হবে।

অপহরণকৃত সম্পদের হুকুম : অপহরণকারী ব্যক্তির উপর হরণকৃত জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম, এমনিভাবে যে কোন অধিকার দ্বারা ফায়দা হাসিল করা নাজায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ

قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهٖ، وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তারই ভাইয়ের সম্ভ্রম কিংবা অন্য কিছুতে জুলুম করেছে, সে যেন আজই তা ক্ষমা চেয়ে নেয়; এমন সময় আসার পূর্বে যে দিন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা কিছুই থাকবে না। তার নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের পরিমাণ মত নিয়ে নেয়া হবে। আর তা না থাকলে মাজলুমের পাপ থেকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৯)

কোন ব্যক্তির জান-মালের ওপর হামলা হলে তার জন্য প্রতিহত করা জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهٖ مَالَكَ. قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ؟ قَالَ : قَاتِلْهُ . قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ؟ قَالَ : فَاَنْتَ شَهِيْدٌ . قَالَ : اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهٗ؟ قَالَ : هُوَ فِى النَّارِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি কেউ এসে আমার মাল নিতে চায় তবে তাতে আপনার অভিমত কি? তিনি ﷺ বললেন : তোমার মাল তাকে দিবে না। সে বলল : যদি সে আমার সাথে লড়াই করে তবে আমি কি করব? তিনি ﷺ বললেন : তুমিও তার সাথে লড়াই কর। সে বলল : যদি সে আমাকে হত্যা করে তবে আমি কি করব? তিনি ﷺ বললেন : তবে তুমি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। সে বলল : আর আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি হবে? তিনি ﷺ বললেন : সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম, হাদীস নং ১৪০)

১৮. শরিকানা অংশ ক্রয় ও সুপারিশ

শরিকানা অংশ ক্রয় : কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রয় করলে, অপর অংশীদার উহা বিক্রিত মূল্যে ক্রেতার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়াকে শরিকানা অংশ ক্রয় বলে।

শরিকানা অংশ ক্রয় বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : এটি এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, প্রথমত : সে হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যের একটি দিক যা দ্বারা অংশীদারের উপর থেকে অনিষ্ট দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোন শত্রু কিংবা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অংশীদারের অংশ ক্রয় করলে তার সাথে মনমালিন্য সৃষ্টি এবং প্রতিবেশী কষ্ট পায়। অতএব শরিকানা অংশ ক্রয়ে কষ্ট থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়।

শরিকানা অংশ ক্রয়ের হুকুম : শরিকানা অংশ ক্রয় প্রত্যেক ঐ জমি, ঘর কিংবা প্রাচীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা এখনো ভাগ করা হয়নি। এ অধিকার নষ্ট করার জন্য ছল-চাতুরি অবলম্বন করা হারাম; কেননা এটি তো বিধিবদ্ধ করাই হয়েছে অংশীদারের কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَالٍ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার প্রত্যেক ঐ বস্তুর ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন যা ভাগ করা হয়নি। তাই যখন সীমা দাড় করানো হয় এবং পথ পৃথক করা হয় তখন আর শরিকানা অংশ ক্রয়ের অবকাশ থাকে না।

(বুখারী, হাদীস নং- ২২৫৭ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৮)

শরিকানা অংশ ক্রয়ের সময়

১. শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অংশীদার জানতে পারে। বিলম্ব করলে তার সেই অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে তবে সে অনুপস্থিত কিংবা অপারগ থাকলে যখন সক্ষম হবে তখন তার অধিকার পাওয়ার হকদার হবে। কিন্তু তার দাবীর ওপর সাক্ষী হাজির করা সম্ভব হলে এমতাবস্থায় সাক্ষী হাজির না করলে তার শরিকানা অংশ ক্রয় করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

২. অংশীদার মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে অংশীদার বিক্রত পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে যদি কিছু মূল্য দিতে অপারগ হয় তবে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

শরিকানা অংশ ক্রয় সাব্যস্ত হওয়া : শরিকানা অংশ অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রয় করবে না, যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রয় করে থাকে তবুও অংশীদার এর জন্য অধিক হকদার হবে। তবে জানিয়ে দিয়ে থাকলে এবং প্রতিপক্ষ যদি বলে যে, আমার দরকার নেই তবে বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর সে দাবী তুলতে পারবে না।

প্রতিবেশীর জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের হুকুম : শরিকানা অংশে প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার, উভয়ের পথ-ঘাট অথবা পানি এক হলে উভয়ের জন্য শরিকানা সাব্যস্ত হবে; কারণ নবী করীম ﷺ এর বাণী–

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

যদি উভয়ের রাস্তা একটি হয় এমন প্রতিবেশী শরিকানা অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার। যদি সে অনুপস্থিত হয় তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ৩৫১৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং - ২৪৯৪)

সুপারিশ : অন্যের জন্যে সাহায্য কামনা করা।

সুপারিশের প্রকারভেদ : সুপারিশ দুই প্রকার

১. **ভাল সুপারিশ :** এমন বিষয়ে সুপারিশ করা যা শরিয়ত সমর্থন করে। যেমন : ক্ষতি প্রতিরোধ করা অথবা কোন অধিকারভুক্ত বিষয়ে উপকার সাধন অথবা মাজলুম ব্যক্তির ওপর থেকে জুলুম দূরকরণ। এ জাতীয় সুপারিশ প্রশংসিত এবং এর সম্পাদনকারী প্রতিদানের অধিকারী।

২. **মন্দ সুপারিশ :** এমন বিষয়ে সুপারিশ করা যাকে শরিয়ত হারাম কিংবা অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন : কোন দণ্ডনীয় অপরাধ ক্ষমা করা কিংবা কোন অধিকার বিনষ্ট করা অথবা অধিকার ছাড়াই কাউকে তা দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা। এটি নিন্দনীয় এবং এর সম্পাদনকারী পাপী।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا.

যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করল তার জন্য কল্যাণের অংশ থাকবে আর যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করল তার জন্য অকল্যাণের অংশ থাকবে। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। [সূরা-নিসা : আয়াত-৮৫]

১৯. আমানত

আমানত : কোন ধরনের বিনিময় ছাড়া কারো নিকট কোন মাল সংরক্ষণের জন্য গচ্ছিত রাখা।

এটি বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সম্পদ সংরক্ষণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর তা হয়ে থাকে স্থান না পাওয়া কিংবা সামর্থ না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে অন্য ভাইয়ের নিকট উক্ত সম্পদ সংরক্ষণের সামর্থ্য থাকে। তাই ইসলাম একদিক থেকে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও অপর দিকে যার নিকট তা রাখা হবে তার প্রতিদানের সুযোগ হিসেবে আমানতের বিধান প্রবর্তন করেছে। আমানত সংরক্ষণে অনেক বড় প্রতিদান রয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে নিজ ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।"

আমানত রাখার হুকুম : আমানত একটি বৈধ চুক্তি। মালিক চাওয়া মাত্র তাকে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক। ঠিক তা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তা ফেরত দিয়ে দেয় তবে মালিককে তা গ্রহণ করাও কর্তব্য।

আমানত কবুল করার হুকুম : ঐ ব্যক্তির ওপর আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যে জানবে যে, সে তা সংরক্ষণ করতে সক্ষম; কেননা এতে পূর্ণ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা হয়। এতে আরো রয়েছে মহাপ্রতিদান তবে তা এমন ব্যক্তির কাজ হবে যার পক্ষে এ জাতীয় বিষয়ে জড়ানো জায়েয।

আমানতের জামানত

১. কোনরূপ সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলা ছাড়াই আমানত বিনষ্ট হলে তা গ্রহণকারী দায়গ্রস্ত হবে না। তবে একে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সংরক্ষণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

২. আমানত গ্রহণকারী সফরকালে কোন ধরনের ভয় করলে মালিক কিংবা তার প্রতিনিধির নিকট তা ফেরত দিবে। আর যদি তা অসম্ভব হয়, তবে মালিকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

৩. কারো নিকট কোন চতুষ্পদ জন্তু আমানত রাখা থাকলে সে যদি ঐ জন্তুর সুবিধা ছাড়া অন্য কোন কারণে তাকে আরোহণ বানিয়ে ফেলে, অথবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা অজ্ঞান্তে অন্য টাকার সাথে মিশিয়ে ফেলার পর তার সব টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ দিবে।

৪. আমানত গ্রহণকারী আমানতদার, তাই সে জামিনদার হবে না। কিন্তু যদি সে কোন ধরনের সীমালঙ্ঘন করে বা অবহেলা দেখায় তাহলে জামানত দিতে হবে। আমানত ফেরত ও বিনষ্ট এবং সে কোন প্রকার অবহেলা করেনি এসব বিষয়ে যদি সাক্ষী না থাকে তাহলে আমানত গ্রহণকারীর কথা শপথ সহকারে কবুল করা হবে।

আমানত ফেরত দেওয়ার হুকুম

১. আমানতকৃত জিনিস মাল হোক বা অন্য কিছু তা আমানত গ্রহণকারীর নিকট আমানত। তার মালিক ইচ্ছা করলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিক চাওয়ার পরেও তা ফেরত না দেয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে জামানত দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ـ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন আমানত তার অধিকারীকে বুঝিয়ে দাও। [সূরা নিসা : আয়াত-৫৮]

২. যদি একাধিক আমানতদাতাদের কোন একজন তার অংশ চায় যা ওজন কিংবা সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিস বণ্টন করা যায়, তাহলে তার অংশ তাকে দিতে হবে।

ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখার হুকুম : ব্যাংকে রাখা অর্থ ঋণ আমানত নয়; কারণ ব্যাংক এতে ব্যবসা দ্বারা হেরফের করে। আর আমানত সংরক্ষণ করার জিনিস

হেরফের করার জিনিস নয়। তাই কোন সীমালঙ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ব্যাংক পুড়ে গেলে ব্যাংককে ঋণের জামানত দিতে হবে। কিন্তু আমানতের জামানত নেই; কারণ আমানত রক্ষাকারী আমানতদার সে সম্পদ কব্জা করছে মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তার মালিকের উপকারার্থে। তাই সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ব্যতীত তাকে জামানত দিতে হবে না। আর ঋণগ্রহীতা সম্পদের মালিকের অনুমতিক্রমে তার উপকারিতার জন্য ঋণগ্রহণ করেছে। তাই সম্পদের মালিককে ঋণের জামানত দিতে হবে।

২০. অনাবাদী জমি চাষ

অনাবাদী জমি : ঐ জমিকে বলে যার কোন মালিক নেই। যে জমি বিশেষ কোন কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও কোন মা'সূমের মালিকানা থেকে মুক্ত। বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট যেমন : বৃষ্টির পানির নালা, জ্বালানি ঘড়ির স্থানসমূহ, চারণভূমি, জন সাধারণের জন্য যেমন : বাগান ও কবরস্থান। আর মা'সূমের মালিকানা অর্থাৎ–যা মানুষের মালিকানাভুক্ত। আদম সন্তানের মা'সূম হচ্ছে চারজন : মুসলিম ও চুক্তি আবদ্ধ, যিম্মী ও নিরাপত্তাধারী বিধর্মীরা। এদের কোন মালিকানাভুক্ত জিনিসের প্রতি কারো জুলুম করা বৈধ নয়।

অনাবাদী জমির আবাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : অনাবাদী জমি আবাদে জীবিকার পরিধি প্রশস্ত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে এর খাদ্যজাত ও অন্যান্য উৎপন্ন থেকে মুসলিম মিল্লাত উপকৃত হয়। আরো উপকৃত হয় সেই যাকাত থেকে যা পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

ভাল নিয়তে জমি আবাদের ফজিলত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপন করে কিংবা কিছু চাষ করে অত:পর তার উৎপন্ন থেকে কোন পাখি, মানুষ কিংবা চতুস্পদ জন্তু কিছু খায়, এর বিনিময়ে ইহা তার জন্যে সাদকায় পরিণত হয়।

(বুখারী হাদীস নং- ২৩২০ ,মুসলিম হাদীস নং - ১৫৫৩)

অনাবাদী জমি চাষের হুকুম : যে ব্যক্তি কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করে তা তারই হয়ে যায়। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা জিম্মি (কাফের) হোক, তাতে রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি থাক আর নাই থাক। চাই তা ইসলামী রাষ্ট্রে হোক বা নাই হোক, যতক্ষণ না এটি মুসলিম সমাজের সাধারণ কোন স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়। যেমন : কবরস্থান, কাঠ কাটার স্থান ও হারাম শরীফ এবং আরাফাত ইত্যাদি স্থানের অনাবাদী জমি তথা এসব জমি আবাদ করলেই কেউ তার মালিক হয়ে যায় না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَ : مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ কারো মালিকানাধীন নয় এমন জমি আবাদ করলে সেই তার অধিক হকদার। (বুখারী, হাদীস নং ২৩৩৫)

অনাবাদ জমি আবাদের নিয়ম : জমি আবাদ নিম্মোক্ত পদ্ধতিতে হতে পারে : চিরাচরিত অভ্যাস হিসেবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করা কিংবা পানি প্রবাহিত করা অথবা তাতে কূপ খনন করা কিংবা বৃক্ষ রোপণ করা। মোট কথা এ ব্যাপারে সামাজিক প্রচলনের ভিত্তিতে সমাধান নিতে হবে। ফলে সমাজের লোক যে কাজকে আবাদ বলে বিবেচনা করবে তা দ্বারাই কেউ অনাবাদ জমির মালিক বলে গণ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি শরয়ী বিধান অনুযায়ী জমি আবাদ করবে সে তার মধ্যকার ছোট বড় সবকিছু সহ পূর্ণ জমির মালিক হবে। তবে যদি সে তা সামলাতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রনায়ক তা নিজ দায়িত্বে বাজেয়াপ্ত করে সামলাতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিবেন।

নিকটতম জমির মালিক হওয়ার নিয়ম : শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার জমি রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ব্যতীত কেউ এর মালিক হতে পারবে না। কেননা কখনো মুসলিম সমাজ কবরস্থান, মসজিদ কিংবা স্কুল-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। যার ফলে ব্যক্তি মালিকানা সর্বসাধারণের এ সুবিধা বিনষ্ট করে দিবে।

যে অনাবাদী জমির পানি মালিকানাভুক্ত জমিতে গড়ায় তা উক্ত জমির অন্তর্ভুক্ত, ফলে জমির মালিকদের অনুমতি ব্যতীত তা আবাদ করা কিংবা অন্যদের কর্তৃক একে দখল করা নাজায়েয।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কাউকে যা দেওয়া জায়েয : রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এটি বৈধ যে, তিনি অনাবাদী জমিতে আবাদকারীর জন্য দখলদারী দিতে পারেন। অনুরূপভাবে লোকজনের কষ্ট না হয় সেই অনুযায়ী প্রশস্তপথে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বসার বন্দোবস্ত করতে পারেন। তবে সরকারী বন্দোবস্ত ছাড়াও ঐ ব্যক্তির জন্য তাতে বসা জায়েয যে প্রথমে পৌঁছেছে। আর যদি দুই জনই এক সাথে পৌঁছে তবে লটারী করবে। আর লোকজন যখন রাস্তা-ঘাট নিয়ে মতানৈক্য করবে তখন (রাস্তার জন্য) সাত হাত রেখে দেয়া হবে।

জমি দখল নেয়ার হুকুম : দখল নেয়ার নামই মালিকানা নয় বরং তা কেবল নির্দিষ্ট ও অন্যের উপর অগ্রাধিকার বুঝায়। যেমন : অদুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা কোন জমি বেষ্টন করা অথবা নেট বা শর্ত কিংবা মাটি দ্বারা বেষ্টনি নির্মাণ করা অথবা এমনভাবে কূপ খনন করা যা পানি পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রে সরকার তা আবাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবে যদি (এর ভেতরে) শরয়ী নিয়মে তা আবাদ করা হয় তবে ভাল কথা। আর না হয় তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তা আবাদে আগ্রহী কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে।

যে ব্যক্তি বৈধ পানির নিকট অবস্থান করে যেমন : নদী কিংবা উপত্যকা তার জন্য পানি সেচ ও গিরা পর্যন্ত পানি আটকে রাখা জায়েয। অত:পর তাদের পরে যারা রয়েছে তাদের জন্য তা ছেড়ে দেবে।

সীমা নির্ধারণ করার হুকুম : রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এমন একটি বিশেষ সীমানা থাকা বৈধ যেখানে মুসলিমদের বায়তুল মালের চতুষ্পদ জন্তু ও ঘোড়া বিচরণ করবে। যেমন যুদ্ধের ঘোড়া ও সাদকার উট ইত্যাদি। এর শর্ত হলো যে, মুসলিম সমাজ এর কারণে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে।

যে কোন বৈধ বস্তু পর্যন্ত আগে পৌঁছে গিয়ে তা দখল করে ফেললে তা তারই। যেমন : শিকার, ছাউনি ও কাঠ ইত্যাদি।

মুসলমানরা তিনটি বিষয়ে অংশীদার। যথা : পানি, ঘাস ও আগুন। মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ সীমানা নির্ধারণ নাজায়েয।

অন্যের অধিকারে জবরদখলের হুকুম : মুসলিম ব্যক্তির ওপর অন্যের অধিকার চাই তা সম্পদ কিংবা ভূমি হোক তার জবরদখল হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنْ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

১. আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কারো জমির এক বিঘত জবরদখল করবে (শেষ বিচার দিবসে) তার ঘাড়ে সাত তবক জমিনের বোঝা চাপানো হবে। (বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৩, মুসলিম, হাদীস নং ১৬১২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন জমি জবরদখল করবে শেষ বিচার দিবসে তাকে এর পরিবর্তে সাত তবক জমি পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৪)

২১. পুরস্কৃত করা

পুরস্কৃতকরণ : কোন জানা বা অজানা বৈধ কাজের ওপর সুনির্দিষ্ট পুরস্কার দেওয়া। যেমন : কোন প্রাচীর নির্মাণ করা কিংবা হারানো পশুকে ধরে আনা করা ইত্যাদি।

পুরস্কৃত করার হুকুম : এটি জায়েয; কেননা মানুষ তার মুখাপেক্ষী।

পুরস্কৃত করার পদ্ধতি : কেউ বলবে : যে ব্যক্তি আমার জন্য এ প্রাচীর নির্মাণ করবে অথবা এ পোশাক শেলাই করবে কিংবা এই ঘোড়া ধরে দিবে তার জন্য এ জিনিস পুরস্কার হিসেবে থাকবে। অতএব, যে তা করবে সে পুরস্কারের অংশীদার হবে।

পুরস্কার বাতিল করার হুকুম : পুরস্কার বাতিল করা জায়েয; যদি কাজ সম্পাদনকারী নিজেই তা বাতিল করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর পুরস্কার ঘোষণাকারী বাতিল করলে এমতাবস্থায় কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তা বাতিল করলে কার্য সম্পাদনকারী কিছুই পাবে না। তবে কাজ আরম্ভ করার পর তা বাতিল ঘোষণা করলে তার কাজের বিনিময়ে পাওনা থাকবে।

উপকারকারীর হুকুম

১. যে ব্যক্তি পুরস্কার ঘোষণা ছাড়াই কোন হারানো বা কুড়ানো ইত্যাদি জিনিস মালিককে ফেরত দিবে সে কোনরূপ বিনিময় পাবে না। কিন্তু যথা সম্ভব তাকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব-উত্তম।

২. যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করে, সে অনুরূপ কাজের পারিশ্রমিক লাভের হকদার হবে, যদিও শর্ত ছাড়াই হয় না কেন।

২২. কুড়ানো বস্তু ও শিশু

কুড়ানো জিনিস : এমন সম্পদ বা বস্তু যাকে তার মালিক হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্য কেউ তা কুড়িয়ে পেয়েছে এমন বস্তুকে কুড়ানো বস্তু বলে।

কুড়ানো বস্তুর হুকুম : জিনিস কুড়ানো ও তার ঘোষণা দেয়া ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এতে রয়েছে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ এবং কুড়িয়ে ঘোষণা দাতার জন্য প্রতিদান।

হারানো সম্পদ তিন প্রকার

১. যে সব বস্তুর বিষয়ে মানুষের মাঝে বিশেষ কোন আগ্রহ নেই যেমন : চাবুক, লাঠি, রুটি ও ফল ইত্যাদি। এসব বস্তুর মালিক না পাওয়া গেলে যে কুড়িয়েছে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এর ঘোষণা আবশ্যক নয়। আর উত্তম হচ্ছে একে দান করে দেয়া।

২. এমন সব হারানো পশু-পাখি যেগুলো ছোট-খাট হিংস্র প্রাণি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে যেমন : উট, গরু, ঘোড়া, হরিণ ও পাখি ইত্যাদি। এগুলো কুড়ানো চলবে না। আর যে নিবে তার প্রতি তার দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং সর্বদা তার প্রচার ও ঘোষণা করা আবশ্যক হবে।

৩. সকল ধরনের সম্পদ যেমন : টাকা, সামান-পত্র, ব্যাগ-থলি এবং ঐ সকল জীবজন্তু যারা নিজেদেরকে হিংস্র পশু থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন : ছাগল ও উটের বাচ্চা ইত্যাদি। এসব কুড়ানো এ শর্তে জায়েয রয়েছে যে, লোভ করবে না এবং এর ঘোষণা প্রদানে সক্ষম হবে। সে এর ওপর বিশ্বস্ত দুজনকে সাক্ষী রাখবে। আর তার ঢাকনা ও বন্ধন হেফাজত করবে। অত:পর পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ উন্মুক্ত পরিবেশে বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা তার প্রচার চালাবে। যেমন : হাট বাজারে ও মসজিদের প্রবেশ পথ ইত্যাদি।

জানানোর পরে কুড়ানো বস্তুর হুকুম

১. এক বৎসর যাবৎ যখন কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার পর মালিক পাওয়া যাবে তখন কোন সাক্ষী কসম ব্যতীতই তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। আর তাকে না পেলে বস্তুর ঢাকনা ও পরিচয় জেনে তার মালিকানায় একে নিয়ে ব্যবহার

করবে। কিন্তু যখন এর মালিক (পরে) এসে যাবে তখন তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। এমনকি আংশিক নি:শেষ হয়ে থাকলে তার সমতুল্য জিনিস ফেরত দিবে।

২. কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার বছরেই যদি তা কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

কুড়ানো জিনিস যা করবে : কুড়ানো জিনিস যদি ছাগল কিংবা উটের বাচ্চা অথবা যে জিনিস বিনষ্ট হওয়ার জিনিস এমন হয়, তবে আহরণকারীকে মালিকের জন্য যা অধিক উপকারী তাই করতে হবে। যদি খেয়ে নেয়ার যোগ্য হয় তবে খেয়ে নিবে তখন তাকে তার মূল্য দিতে হবে। আর যদি বিক্রয় করা উত্তম হয় তো বিক্রয় করে তার মূল্য হেফাজত করবে। আর যদি হেফাজত করা ভাল হয়, তবে প্রচার করার সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে। আর এর জন্য যা খরচাদি করবে তা মালিকের উপর বর্তাবে।

عَنْ زَيْدَ بْنِ خَالِدِ نِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ اَوْ الْوَرَقِ فَقَالَ : اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ، فَاِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَاَدِّهَا اِلَيْهِ : وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَاَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ : خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ.

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির কুড়ানো জিনিস প্রসঙ্গে জবাবে তিনি বলেন : তুমি তার বন্ধন ও ঢাকনা চিনে নিয়ে এক বৎসর যাবৎ তার ঘোষণা দিতে থাকবে। যদি তার সন্ধান না পাও তবে তা খরচ করবে এবং একে তোমার নিকট গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে পরিগণিত করবে। যদি জীবনে কোন দিন তার খোঁজকারী আসে তবে তাকে তা বুঝিয়ে দিবে।

আর তাঁকে কেউ হারানো উট প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ﷺ বলেন : তাকে দিয়ে তোমার চিন্তা কিসের? বরং তাকে আপন গতিতে ছেড়ে দাও, তার সাথেই তার জুতা ও পানি রয়েছে। সে পানিতে নামে ও গাছের পাতা খায় পরিশেষে স্বীয় মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আর তাঁকে ছাগল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ বলেন : তুমি তা গ্রহণ কর, কেননা এটি হয় তোমার জন্য কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য। (বুখারী, হাদীস নং ৯১ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭২২)

অবুঝ ও ছোট বাচ্চার কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা অভিভাবকরা দিবেন।

মক্কার হারাম শরীফে পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানোর হুকুম : হারাম শরীফে পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো নাজায়েয। কেবল বিনষ্ট ও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা গ্রহণ করবে এবং মক্কায় থাকা পর্যন্ত গ্রহণকারীকে এর ঘোষণা দেয়া আবশ্যক।

আর যখন মক্কা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কিংবা তার সহকারী অথবা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবে। মক্কার কুড়ানো বস্তুর মালিকানা যে কোন অবস্থায় নাজায়েয। ঠিক যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিবে সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা কুড়ানো নাজায়েয। হাজি সাহেবদের পড়ে থাকা জিনিস হারাম শরীফের ভেতর কিংবা বাহিরে যে কোন স্থান থেকে কুড়ানো হারাম।

মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার হুকুম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজ করতে শুনবে সে যেন বলে : আল্লাহ যেন তোমার নিকট তা ফেরত না দেন, কেননা মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি। (মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৮)

কুড়ানো শিশু : এ হচ্ছে সেই শিশু যার বংশ জানা যায় না অথবা যার মনিবকে কেউ চিনে না এভাবে তাকে কোন স্থানে ফেলে দেয়া হয়েছে কিংবা সে রাস্তা ভুলে গিয়েছে।

পড়ে থাকা শিশুকে কুড়ানোর হুকুম : এ জাতীয় শিশুকে কুড়ানো ফরজে কেফায়া। আর যে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে লালন-পালন করবে তার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

কুড়ানো শিশুর হুকুম : শিশু যদি ইসলামী দেশে পাওয়া যায় তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম অর্পন হবে। আর যেখানেই পাওয়া যাক স্বাধীন বলে হুকুম দেওয়া হবে; কারণ ইহাই তার আসল যতক্ষণ তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর লালন-পালন : কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব যিনি পাবেন তারই প্রতি। যদি তিনি শরিয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ও আমানতদার এবং ন্যায়পরায়ণ হন। আর তার ব্যয়ভার বাইতুল মাল থেকে। আর যদি তার সঙ্গে কিছু পাওয়া যায় তবে তা তার জন্য ব্যয় করতে হবে।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াতের হুকুম : কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াত বাইতুল মালে জমা হবে যদি তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হত্যা করলে তার অভিভাবক হবেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি কেসাস ও দিয়াতের মাঝে যেটা ইচ্ছা নির্দিষ্ট করবেন।

যার নিকট কুড়ানো শিশু সোপর্দ করা হবে : যদি কোন পুরুষ বা নারী যার মুসলিম বা কাফের স্বামী বা স্ত্রী আছে এমন দাবি করে যে বাচ্চাটি তার তাহলে তাকেই দিতে হবে। আর যদি একাধিক ব্যক্তি দাবি করে তবে যার প্রমাণ থাকবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি কারো প্রমাণ না থাকে তবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে কার সন্তান বলতে পারে এমন ব্যক্তি যার জন্যে নির্দিষ্ট করবে সেই পাবে।

২৩. ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফ : মূল জিনিস ধরে রেখে নেকীর উদ্দেশ্যে তার উপকার ফী সাবিলিল্লাহ দান করাকে ওয়াক্‌ফ করা বলে।

ওয়াকফ বিধিবিধান করার রহস্য : ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দিয়েছেন তারা চাই যে বিভিন্ন রকমের ইবাদতের দ্বারা পাথেয় অর্জন করে। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। তাই

তাদের সম্পদের কিছু স্থাবর জিনিসের আসলটা অবশিষ্ট রেখে তার উপকার প্রবাহমান চলতে থাকার জন্য ওয়াকফ করে। যাতে করে তার মৃত্যুর পরে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না এমন ব্যক্তির নিকটে তার হস্তান্তর না হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকফের বিধিবিধান করেছেন।

ওয়াকফের হুকুম : ওয়াকফ করা মুস্তাহাব। ইহা উত্তম দানের একটি যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা উৎসাহিত করেছেন। নৈকট্য লাভ ও সৎ এবং এহসানের এক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আর এর উপকারিতা অধিক ও বিস্তৃত। ইহা এমন একটি আমল যা মৃত্যুর পরেও এর নেকী বন্ধ হয় না বরং চালু থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান, উপকারী জ্ঞান ও সৎসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

(মুসলিম হাঃ নং ১৬৩১)

ওয়াকফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তাবলী

১. নির্দিষ্ট স্থাবর জিনিসে ওয়াকফ হতে হবে, যার আসল অবশিষ্ট থেকে উপকার গ্রহণ করা যাবে।

২. সওয়াবের কাজে হতে হবে যেমন : মসজিদ ও সেতু নির্মাণ এবং আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের জন্য।

৩. নির্দিষ্ট জিনিসের দিক উল্লেখ হতে হবে যেমন : এমন মসজিদ বা অমুক ব্যক্তি তথা যায়েদ অথবা অমুক ধরণের ফকির-মিসকিনরা।

৪. স্থায়ী হতে হবে কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও ঝুলন্ত হবে না। কিন্তু যদি ওয়াকফ দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে চলবে।

৫. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফ হওয়া যার কর্তৃত্ব ও হস্তান্তর গ্রহণযোগ্য।

যা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হয় : কথা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন বলবে : ওয়াকফ করলাম, আটক করে দিলাম, ফী সাবিলিল্লাহ্ করে দিলাম ইত্যাদি। আবার কাজ দ্বারাও হতে পারে যেমন : কোন ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ

করে সেখানে মানুষদেরকে সালাত আদায়ের অনুমতি দান। অথবা কবরস্থান বানিয়ে সেখানে মানুষকে কবরস্থ করার অনুমতি দেওয়া।

ওয়াকফকৃত বস্তুর পরিচালনার পদ্ধতি : ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী জমা করা, আগে করা, তরতীব ইত্যাদি করা ওয়াজিব যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। যদি সাধারণভাবে কোন শর্ত ছাড়াই ওয়াকফ করে তবে অভ্যাস ও প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী করতে হবে যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর না হয় তারা হকদারের দিক থেকে সকলেই সমান।

ওয়াকফকৃত বস্তুতে যা শর্ত : ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতার বিষয়ে স্থায়ী উপকার হওয়াটা শর্ত। যেমন : ঘর-বাড়ি, জীবজন্তু, বাগান, অস্ত্র, বাড়ির আসবাবপত্র ইত্যাদি। আর মুস্তাহাব হলো ওয়াকফ সর্বোত্তম ও সুন্দর সম্পদ দ্বারা হওয়া।

ওয়াকফনামা লিখার পদ্ধতি

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَاْمُرُنِىْ بِهِ؟ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ اَنَّهُ لَا يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রা) খয়বারের কিছু জমি পান। এরপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে পেয়ে বলেন, আমি এমন জমিন পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর আমি কখনো পায়নি। তাই আপনি সে বিষয়ে আমাকে কি নির্দেশ করেন? নবী করীম ﷺ বললেন : "যদি চাও তবে তার আসল ধরে রেখে তার উপকারটা ওয়াকফ করতে পার। এরপর ওমর (রা) তা এ ভাবে দান করেন যে, তার মূল বাকি থাকবে বেচা চলবে না। হেবা ও

উত্তরাধিকার হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমানদারী ও মুসাফিরদের জন্য। যে এর অভিভাবক হবে সে সৎভাবে তা থেকে কিছু খেলে অথবা কোন বন্ধুকে সম্পদশালী বানানো ছাড়া খাওয়ালে পাপী হবে না। (বুখারী, হাদীস নং ২৭৭২, মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩২)

ওয়াকফের বিধি-বিধান

১. যদি কোন দলের প্রতি ওয়াকফ করে আর তাদের গণনা করা সম্ভবপর হয় তবে তাদের সকলকে দেওয়া ও সমান করা ওয়াজিব। আর যদি সম্ভব না হয় তবে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও কতিপয়ের ওপর দেওয়া জায়েয।

২. যদি নিজ সন্তানদের প্রতি ওয়াকফ করে অত:পর মিসকিনদের প্রতি তাহলে ইহা তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য হবে যদিও নিচের হোক না কেন। ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। যদি সন্তানদের কারো বড় পরিবার থাকে বা অভাব কিংবা উপার্জনে অক্ষম কিংবা দ্বীনদার ও সৎ হয় তাহলে ওয়াক্ফ দ্বারা খাস করলে কোন অসুবিধা নেই।

৩. যদি বলে, এ ওয়াকফটি আমার ছেলেদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির ছেলেদের জন্য তবে কেবল ছেলেরাই পাবে মেয়েরা পাবে না। কিন্তু যদি যাদের প্রতি ওয়াকফ গোত্র হয় যেমন : বনি হাশেম ইত্যাদি তাহলে পুরুষদের সাথে নারীরাও মিলিত হবে।

ওয়াকফের উপকারীতা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তার হুকুম : ওয়াকফ একটি জরুরি আকদ তথা চুক্তি যা রহিত হয় না, বিক্রয় করা যায় না, দান করা ও উত্তরাধিকার হওয়া যায় না এবং বন্ধক রাখাও চলে না। খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে এর উপকার বিনষ্ট হলে অথবা বিশেষ কোন দরকার হলে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে। আর তার বিক্রয় মূল্য অনুরূপ কাজে লাগাতে হবে। যেমন মসজিদ যদি তার উপকারিতা বিকল হয়ে পড়ে তবে তা বিক্রয় করে অন্য কোন মসজিদের জন্য খরচ করতে হবে। আর এর দ্বারা ওয়াকফের উপকারিতা সংরক্ষণ হবে। তবে এতে যেন কোন ধরনের বিপর্যয় ও কারো কোন ক্ষতি সাধন না হয়।

ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তের হুকুম : প্রয়োজনে ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তন করা জায়েয। যেমন : ঘরকে দোকানে রূপান্তরিত করা বাগানকে ঘর করা। আর ওয়াকফের ব্যয়ভার তার উপার্জিত থেকেই যদি অন্য কিছু থেকে শর্ত না করে থাকে।

ওয়াকফের পরিচালক : ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ দেখা-শুনার জন্য কাউকে নির্দিষ্ট না করে তবে যার প্রতি ওয়াকফ করেছে সেই করবে যদি নির্দিষ্টভাবে করা হয়। আর যদি কোন বিভাগের জন্য করা হয় যেমন : মসজিদের জন্য বা এমন ব্যক্তিদের জন্য যা গণনা করা অসম্ভব যেমন মিসকিন তবে দেখা-শুনার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের ওপর বর্তাবে।

ওয়াকফের সর্বোত্তম রাস্তা : যে ওয়াকফ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সকল সময়ে ও স্থানে ব্যাপকতা লাভ করবে তাই সর্বোত্তম ওয়াকফ। যেমন : মসজিদের জন্য ওয়াকফ, দ্বীনি শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য ওয়াকফ। অনুরূপ আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের ফকির-মিসকিন ও দুর্বল ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ।

ওয়াকফ একটি স্থায়ী মূল জিনিস যা অন্যের নিকট দেওয়া জায়েয। সে তার নির্দিষ্ট লভ্যাংশে দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচর্চা করবে।

ওয়াকফের জাকাতের হুকুম : ওয়াকফের দু'টি অবস্থা

প্রথম অবস্থা : ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা যাকাতের হকদার যেমন : ফকির ও মিসকিন, তাহলে এর কোন যাকাত বের করা লাগবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা : ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা যাকাতের হকদান নয়, তাহলে ওয়াকফ থেকে প্রত্যেক গ্রহণকারী তার অধিকার গ্রহণ করার পরে নেসাব পরিমাণ মাল হলে ও এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দেবে।

কাফেরের ওয়াকফের হুকুম : ওয়াকফ একটি নৈকট্য হাসিলের কাজ যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে। আর কোন কাফেরের পক্ষ থেকে ওয়াকফ প্রকল্প করা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু সে তার দান-খয়রাতের জন্য দুনিয়াতে প্রতিদান পাবে পরকালে তার কোন সওয়াব পাবে না; কারণ কাফেরের কোন আমল কবুল হয় না।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا اللّٰهَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনকে তার নেকির কাজে জুলুম করেন না। তাকে তার বদলা দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে কাজ আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতে সে তার ফল ভক্ষণ করবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার ভাল কাজের কোন প্রতিদান পাবে না।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৮০৮)

২৪. হেবা ও দান-খয়রাত

সম্পদ দ্বারা অন্যকে সহযোগিতা করার তিনটি স্তর

১. অভাবী ব্যক্তিকে তোমার দাসের স্থানে মনে করে এমন কিছু দেওয়া যাতে করে তাকে মানুষের নিকট চাইতে না হয়। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে নিচের।

২. অভাবীকে তোমার নিজের স্তরের মনে করা এবং সে তোমার সম্পদে শরিক ও এতে তুমি সন্তুষ্ট। ইহা হলো মধ্যম স্তর।

৩. অভাবগ্রস্থকে তোমরা নিজের উপরে প্রাধান্য দেওয়া। ইহা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীদের স্তর।

হেবা : নিজের জীবদ্দশায় কোন বদলা ছাড়াই অন্যকে সম্পদের মালিক বানানো। এ অর্থে তাকে হাদিয়া ও 'আতিয়্যা (দান) বলে।

দান-খয়রাত : আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ফকির ও মিসকিনদেরকে সম্পদ দান করাকে সদকা তথা দান-খয়রাত বলে।

হেবা ও দান-খয়রাতের বিধান : হেবা ও দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব কাজ। ইসলাম হেবা, দান- খয়রাত, হাদিয়া ও 'আতিয়্যা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ এর দ্বারা অন্তরের ভালোবাসা এবং মানুষের মাঝের ভালবাসার সেতু বন্ধন শক্ত হয়। আর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ লালসার খারাপি থেকে পবিত্র করে। এ ছাড়া যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে তার জন্য অসংখ্য নেকী ও প্রতিদান রয়েছে।

ব্যয় প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর দিক নির্দেশনা : আল্লাহ তা'আলা দানশীল ও মহৎ। তিনি দানশীলতা ও মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। আর নবী করীম ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। তিনি রমজান মাসে অধিক দানশীল হতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন ও তা গ্রহণ করার জন্য

বলতেন। তিনি এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি যা কিছুর মালিক হতেন তা সকলের চেয়ে বেশি দান করতেন। তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে কম হোক বা বেশি হোক তা দিতেন কখনো না বলতেন না। তিনি এমনভাবে দান করতেন যে ফকির হওয়ার ভয় করতেন না। আর দান-খয়রাত ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় জিনিস।

তাঁর নিকট থেকে দান গ্রহিতার আনন্দের চেয়ে দান করে তিনি অধিক আনন্দ ও খুশি হতেন। কোন অভাবী তার প্রয়োজন পেশ করলে তিনি তা নিজের প্রয়োজনের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর তাঁর রাসূল ﷺ-এর দান-খয়রাত ছিল বিভিন্ন ধরনের। কখনো হেবা কখনো দান-খয়রাত আর কখনো হাদিয়া। আর কখনো তিনি কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের চেয়েও অধিক দিতেন। আবার কার নিকট থেকে ঋণ নিলে পরিশোধের সময় তার চেয়েও উত্তম ও বেশি দিতেন। আবার কখনো কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করে তার মূল্য ও সামগ্রী উভয়টা ফেরত দিতেন। তাই তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে উদার প্রাণের মানুষ। তাঁর অন্তর ছিল সকলের চেয়ে পবিত্র ও দানশীল। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম বষর্ণ করুন।

বদান্যতা ও এহসানের ফজিলত

১. আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.

আর যা তোমরা ভাল কিছু ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় কর। ভাল যা কিছু তোমরা ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পূরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৭২]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَّلَا يَقْبَلُ الطَّيِّبَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهٖ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি একটি খেজুর পরিমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করবে আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। অত:পর তা তার মালিকের জন্য লালন-পালন করেন যেমনটি তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে থাকে। এমনকি তা একদিন পাহাড়ের মত হয়ে যাবে। (বুখারী, হাদীস নং ১৪১০, মুসলিম, হাদীস নং ১০১৪)

দান গ্রহণের হুকুম : যার নিকট তার চাওয়া ও অপেক্ষা ব্যতীতই কোন সম্পদ আসে সে যেন তা গ্রহণ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান না করে; কারণ ইহা রিযিক যা আল্লাহ তার জন্য প্রেরণ করেছেন। যদি চাই তা দ্বারা সম্পদশালী হবে অথবা ইচ্ছা করলে দান করে দেবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) كَانَ يُعْطِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضـ) الْعَطَاءَ فَيَقُوْلُ عُمَرُ اَعْطِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَّلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে দান করলে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়ে অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরকে বলেন : "গ্রহণ কর এবং তা দ্বারা মালদার হও অথবা অন্যকে দান করে দাও। এ জাতীয় যে সম্পদ তোমার নিকট আসে যার তুমি প্রতিক্ষা-আশা করনি কিংবা চাওনি তা গ্রহণ কর। এ ছাড়া অন্য কিছুর পেছনে তোমার প্রবৃত্তিকে পিছু করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭১৬৪ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪৫)

মুসলিম ও অন্য ধর্মালম্বীর ওপর দান-খয়রাত করা জায়েয।

যা দ্বারা হেবা সম্পাদন হয় : অন্যকে কোন বিনিময় ব্যতীত সম্পদের মালিক বানানোর যে কোন শব্দ দ্বারা হেবা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন : তোমাকে হেবা করলাম অথবা তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিংবা তোমাকে দান করলাম। আর প্রত্যিটি দানকৃত জিনিস যা হেবার প্রতি ইঙ্গিত করে তার দ্বারা। যে সকল জিনিস বিক্রয় করা সঠিক তা হেবা করাও জায়েয।

মানুষ তার সন্তানদেরকে যেভাবে দেবে

১. মানুষের জীবদ্দশায় তার সন্তানদেরকে দান করতে পারে তবে শর্ত হলো তাদের উত্তরাধিকারের হিসেবে সকলকে সমপরিমাণে দিতে হবে। যদি কাউকে কারো উপরে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে বেশিটা নিয়ে ও কমটা বেশি করে সমান করে দিবে।

২. যদি কোন ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে কোন কারণবশত : যেমন : অভাব বা বয়স বেশি কিংবা সন্তান বেশি অথবা রোগাক্রান্ত বা জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত ইত্যাদি, তাহলে এর জন্য তাকে বিশেষভাবে দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু অগ্রাধিকার দিয়ে কাউকে অধিক দেওয়া হারাম।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ .

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার বাবা তাকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে গমন করে বললেন আমি আমার ছেলেটিকে আমার একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার প্রতিটি সন্তানকে এরূপ দান করেছ? বাবা বললেন, না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যা দান করেছ তা ফেরত নেও। (বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৬ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩০)

হেবা ফেরত নেয়ার হুকুম : পিতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য হাতে কব্জাকৃত হেবায় প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। ছেলের যে সম্পদ প্রয়োজন নেই এবং তা নেওয়াতে তার কোন ধরনের ক্ষতিও নেই সে মাল বাবার জন্য ফেরত নেওয়া জায়েয আছে। সন্তানের জন্য বাবার নেওয়া ঋণ ইত্যাদি চাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যতটুকু খরচ করা ওয়াজিব তা চাইতে পারে।

হাদিয়াদাতা ও হাদিয়াগ্রহণকারীর জন্য সুন্নত : হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং তার বিনিময়ে তার মত বা তার চেয়ে উত্তম দেওয়া সুন্দর কাজ। যদি দেওয়ার মত কিছু না পায় তবে তার জন্য দোয়া করবে। মুশরিকের চিত্তাকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের আশায় তাকে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে নেওয়া জায়েয আছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ.

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কারো প্রতি কেউ কোন অনুগ্রহ করলে যদি সে কর্তার জন্য বলে : [জাজাকাল্লাহু খাইরা] অর্থ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসা করল। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং ২০৩৫ সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৬৫৭)

সর্বোত্তম দান-খয়রাত

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى،وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দানের প্রতিদান অধিক? রাসূল ﷺ বললেন : তোমার সুস্থ ও কৃপণ অবস্থার দান, যখন তুমি অভাব অনটনের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার চেষ্টা কর। আর দানের বিষয়টি কণ্ঠনালীতে মৃত্যু আসা পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। এ সময় বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত এবং অমুকের প্রতি আমার এত ঋণ আছ।

(বুখারী হাদীস নং ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩২)

মৃত্যুর সময় দানের হুকুম : যার মৃত্যু ভয়ঙ্কর যেমন : মহামারী-প্লেগ ইত্যাদি তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু দান করা আবশ্যক নয় এবং করলে সঠিক হবে না। তবে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যারা উত্তরাধিকারী না তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক দান করা আবশ্যক নয় এবং করলে বিশুদ্ধ হবে না। তবে মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে জায়েয।

যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এরপর সে জন্য তাকে হাদিয়া দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের এক বিরাট অধ্যায় রচনা করল।

হাদিয়া ফেরত দেওয়ার হুকুম : কারণবশত: হাদিয়া ফেরত দেওয়া জায়েয আছে। যেমন : জানা গেল যে হাদিয়াদাতা এহসানের জন্য খোঁটা দেয়। অথবা এ দ্বারা সে তিরস্কার করে কিংবা মানুষের নিকট বলে বেড়াই ইত্যাদি। আর যদি হাদিয়া চুরি করা বা লুণ্ঠন করা হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

মুশরিককে হাদিয়া ও তার থেকে গ্রহণ করার হুকুম : মনরঞ্জন ও ইসলাম কবুলের আশায় কোন মুশরিককে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে গ্রহণ করা জায়েয।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

ধর্মের বিষয়ে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।

[সূরা–৬০ মুমতাহিনা : আয়াত–৮]

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَّذِيْنَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا .

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে একটি রেশমির জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি ﷺ রেশমির পোশাক থেকে নিষেধ করতেন। মানুষ এ দেখে আশ্চর্য হলে নবী করীম ﷺ বলেন :"যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! সা'দ ইবনে মু'আযের বেহেশতের রুমালের চেয়েও সুন্দর। (বুখারী হাদীস, নং ২৬১৫ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৯)

عَنْ اَسْمَاءَ (رضى) قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ : نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ.

৩. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমার মুশরেকা মা আমার নিকট আসেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার নিকট আগমন করেছেন কিছু পাওয়ার আশায়, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি ﷺ বলেন : হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সম্পর্ক রাখ।

(বুখারী হাদীস নং ২৬২০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১০০৩)

কোন উপকারের জন্য হাদিয়া দেওয়ার হুকুম : যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীলকে কোন নাজায়েয কাজ করার জন্য হাদিয়া দেয় তা হাদিয়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম। ইহা এমন ঘুষ যা দাতা ও গ্রহীতা অভিশপ্ত। আর যদি হাদিয়া দায়িত্বশীলের জুলুম থেকে রক্ষার জন্য অথবা তার ওয়াজিব অধিকার নেওয়ার জন্য হয়, তাহলে এ হাদিয়া গ্রহীতার জন্য হারাম আর দাতার জন্য জায়েয; কারণ এর দ্বারা সে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে ও নিজের হক সংরক্ষণ করতে পারবে।

উত্তম দান-খয়রাত : সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে যা অভাবমুক্ত অবস্থায় করা হয়। যাদের প্রতি ব্যয় করা ওয়াজিব তাদের দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। কারণ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করে বলেছেন–

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَاِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا. يَقُوْلُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ شِمَالِكَ.

তোমার নিজের দ্বারা শুরু কর তার ওপর দান কর। এরপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য। অত:পর তোমার পরিবারকে দেওয়ার পর কিছু বাকী থাকলে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য। যদি তোমার

আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে তা এরূপ ও এরূপ। তিনি বলেন : তোমার সামনের, ডানের ও বামের লোকদের জন্য।

(মুসলিম হাদীস নং ৯৯৭)

উত্তম কার্যাদিতে ব্যয় করার ফজিলত : আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসলমানদের উপকারী খাতে খরচ করা এক বিরাট নৈকট্য লাভের কাজ। এর নেকী দশগুণ থেকে সাতশত ও বহুগুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সাতশত গুণ বাড়ে। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বাড়িয়ে দিবেন। আর ইহা ব্যয়কারীর অবস্থা, নিয়ত, ঈমান, এখলাস, এহসান, দিলের উদারতা ও এ দ্বারা তার আনন্দের ওপর বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। ইহার খরচের পরিমাণ, উপকার ও তার যথাস্থানে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। অনুরূপ যা ব্যয় করা হচ্ছে তার পবিত্রতা ও ব্যয়ের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করবে।

১. আল্লাহ ঘোষণা করেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দানার ন্যায়। যা থেকে সাতটি শীষ হয়। আর প্রতিটি শীষে একশত দানা হয়। আল্লাহ যার জন্য চান তার অধিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও জ্ঞানী।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৬১]

২. আল্লাহর আরো ঘোষণা করেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّاوَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা তাদের সম্পদ রাতে দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান। আর তাদের নেই কোন ধরনের ভয়। আর না তারা কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা করবে।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৪]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ.

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার কৃত প্রত্যেকটি উত্তম কাজের বিনিময়ে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়।
(বুখারী, হাদীস নং ৪২ মুসরিম, হাদীস নং ১২৯)

২৫. অসিয়ত

অসিয়ত : মৃত্যুর পর কোন লেনদেন কিংবা সম্পদের দান প্রসঙ্গে কৃত বিশেষ উপদেশ।

অসিয়ত বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূলের জবান দ্বারা এ জাতীয় অসিয়ত প্রবর্তন করে স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া দেখিয়েছেন। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তার সম্পদের কিছু অংশ কল্যাণের কাজে বরাদ্ধ করে যেতে পারে, যা দ্বারা ফকির ও মুখাপেক্ষীরা উপকৃত হয় এবং অসিয়তকারী ব্যক্তিও নিজ আমল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এর সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের সুযোগ পায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর অবধারিত করেছেন যে, তোমাদের কারো মৃত্যু যখন হাজির হয় তখন বাবা-মা ও স্বজনের উদ্দেশ্য সদভাবে অসিয়ত করে যায়। ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৮০]

অসিয়তের হুকুম

১. অসিয়ত মুস্তাহাব সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার অঢেল ধন–সম্পদ রয়েছে এবং তার সন্তান–সন্ততি অমুখাপেক্ষী। সে তার সম্পদের উর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত

করে যাবে, যা কল্যাণ ও কল্যাণের কাজে ব্যয় হবে, যেন সে মৃত্যুর পর এর নেকী হাসিলে ধন্য হতে পারে।

২. ঐ ব্যক্তির ওপর অসিয়ত ফরজ যার জিম্মায় আল্লাহর পাওনা কিংবা কোন মানুষের পাওনা রয়েছে অথবা তার নিকট অন্যের আমানত জমা আছে। এরূপ অবস্থায় সে লিখবে ও প্রকাশ করে যাবে যাতে করে কারো অধিকার নষ্ট না হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অঢেল সম্পদ আছে তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের জন্যে ঊর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা উচিত।

৩. হারাম অসিয়ত হলো : উত্তরাধিকারীদের্র মধ্য হতে শুধু একজনকে যেমন : স্ত্রী কিংবা নির্দিষ্ট কোন ছেলে-মেয়ের জন্য সম্পদের অসিয়ত করা।

অসিয়তকৃত সম্পদের পরিমাণ : যারা উত্তরাধিকারী রয়েছে তাদের জন্য অধিক সম্পদ রেখে যাওয়া অবস্থায় এক পঞ্চমাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ অন্যের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা সুন্নত। কিন্তু এক পঞ্চমাংশের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা উত্তম। অনুত্তরাধিকারীর জন্য এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা জায়েয। যে অভাবী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা মুখাপেক্ষী তার জন্য অসিয়ত করা মাকরূহ। যার উত্তরাধিকারী নেই তার পক্ষে সমস্ত সম্পদের অসিয়ত জায়েয। যার উত্তরাধিকারী আছে তার পক্ষে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত নাজায়েয। উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে অসিয়ত নাজায়েয। যদি তার মাতা, পিতা, ভাই ইত্যাদির কারো জন্য হজ্ব কিংবা কুরবানির অসিয়ত করে তাবে তারা জীবিত থাকলে তা জায়েয; কেননা তা হচ্ছে নেকী দ্বারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নামান্তর। এটি সেই অসিয়ত নয় যা দ্বারা মালিক বানানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কর্তৃত্বের বিষয়ে উইলকারীর প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য শর্ত : যার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা হবে তার জন্য শর্ত হল মুসলিম, বিবেকবান, বিবেচনা ও অসিয়তকৃত বিষয়ে সুন্দর পরিচালনার সামর্থ্যবান হওয়া। অসিয়তকৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী।

যার অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে : অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, সাবালকের পক্ষ থেকে এবং বিবেকবান বাচ্চা ও সম্পদ প্রসঙ্গে নির্বোধ ইত্যাদি নারী-পুরুষের পক্ষ থেকে।

অসিয়ত ও হেবার মধ্যে পার্থক্য : অসিয়ত হলো : মৃত্যুর পরে দানের দ্বারা কাউকে মালিক বানানো। আর হেবা হলো : বর্তমানে অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানানো। উভয়টি মুসলিম ও কাফেরের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। আর উত্তম হলো জীবদ্দশায় উত্তম কাজের জন্য অসিয়ত করা; কারণ দান ও হেবা জীবিত থাকা অবস্থায় করা মৃত্যুর পরের চেয়ে উত্তম।

অসিয়তের নিয়ম : অসিয়তকারীর মৌখিক উক্তি কিংবা লিখিত বক্তব্যের দ্বারা অসিয়ত সহীহ্ হবে। এ জাতীয় অসিয়ত লিখা ও তার ওপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব যার দ্বারা বিবাদের পথ তাতে বন্ধ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এ অধিকার নেই যে, তার অসিয়ত করার কোন জিনিস থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত না লিখা ছাড়াই দুই রাত অতিবাহিত করে।

(বুখারী হাদীস নং ২৭৩৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৭)

অসিয়ত ফেরত নেয়া ও কম বেশি করা জায়েয আছে তবে মৃত্যুবরণ করার পরে তা স্থির হয়ে যায়।

যার জন্য অসিয়ত জায়েয : প্রতিটি মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির জন্য অসিয়ত এমন বস্তুর ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে যাতে বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে তা মসজিদ, সেতু ও মাদরাসার জন্য সহীহ্।

অসিয়তের ক্ষেত্রসমূহ

১. অসিয়ত মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু কাজের লেনদেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন : তার কন্যাদেরকে বিবাহ দেয়ার অসিয়ত ও ছোটদের দেখা শুনা করা অথবা তার তৃতীয়াংশকে ভাগ করা। ইহা মুস্তাহাব কাজ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এমন নৈকট্যপূর্ণ কাজ যার ওপর সে পুরস্কৃত হবে।

২. অসিয়ত সম্পদ দান করা দ্বারা হতে পারে যেমন : তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশে অসিয়ত করল ফকিরদের উদ্দেশ্যে কিংবা আলেম, দ্বীনের মুজাহিদ, মসজিদ নির্মাণ অথবা পানি পান করার কূপ খনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

অসিয়ত মুস্তাহাব সেই মাতা-পিতার (যেমন কাফের) ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবেন না। অনুরূপভাবে সেসব নিকটাত্মীয় ফকিরদের ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবে না; কেননা এটি এক দিকে সাদকা ও অন্য দিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কাজ।

অসিয়ত পরিবর্তন করার হুকুম : অসিয়ত উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক যদি অসিয়তকারী উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন তবে তা হারাম হবে এবং সে এর জন্য পাপী হবে। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইনসাফ ভিত্তিক হলে অসিয়তকৃতদের পক্ষে তা পরিবর্তন করা হারাম। যে ব্যক্তি জানবে যে, অসিয়তে জুলুম কিংবা পাপ রয়েছে তার পক্ষে অসিয়তকারীকে উত্তম ও ইনসাফের জন্য উপদেশ দেয়া সুন্নত এবং তাকে জুলুম থেকে নিষেধ করবে। কিন্তু সে যদি তা গ্রহণ না করে তবে অসিয়তকৃতদের মাঝে মীমাংসা করবে যাতে ইনসাফ, সন্তুষ্টি ও মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্তি লাভ হয়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অত:পর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করে তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এর পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। আর যে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে জুলুম কিংবা পাপের সম্ভাবনার ফলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে তবে তার ওপর কোন পাপ নেই। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৮১-১৮২]

পাপের কাজে অসিয়ত করার হুকুম : পাপের কাজে অসিয়ত করা হারাম। যেমন : গীর্জা ও মাজার নির্মাণ বিষয়ে অসিয়ত করা। চাই অসিয়তকারী মুসলিম হোক কিংবা কাফির হোক।

অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময় : অসিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়া মৃত্যুর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। যেমন : কোন উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল কিন্তু সে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় অনুত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল। যেমন : কেউ আপন ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তার

একজন ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হল। এর দ্বারা ভাই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার অসিয়ত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি অনুত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যেমন : ছেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল। অত:পর তার ছেলে মৃত্যুবরণ করল তখন অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে যদি উত্তরধিকারীরা তা সমর্থন না করে।

কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে প্রথমত তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অত:পর অসিয়তকৃত বস্তু এবং পরিশেষে উত্তরাধিকার।

অসিয়তকৃত ব্যক্তিদের দায়িত্বের হুকুম : অসিয়তকৃত ব্যক্তি এক কিংবা একাধিক হতে পারে তবে যদি তারা একাধিক হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত নির্দিষ্ট থাকে তবে যার যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু যদি একাধিক অসিয়তকৃতকে এক বিষয়ে অসিয়ত করে থাকে। যেমন : তার সন্তান কিংবা সম্পদের দেখা-শুনার বিষয়ে অসিয়ত এমতাবস্থায় কোন একজনের পক্ষে একা কিছু হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

অসিয়ত কবুল করার সময় : অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে অসিয়ত গ্রহণ করা যায়। আর যদি সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে কিংবা পরে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে; কারণ সে তা গ্রহণ করেনি।

যখন অসিয়তকারী এ বলে অসিয়ত করবে যে, আমি অমুকের উদ্দেশ্যে আমার ছেলের উত্তরাধিকার পরিমাণ অথবা অন্য যে কোন উত্তরাধিকারীর সমান অসিয়ত করলাম, তখন তার জন্য মূল সম্পত্তির সাথে সে পরিমাণ অংশ পাওনা বলে বিবেচিত হবে। যদি একাংশ কিংবা কিছু পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত করে, তবে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছানুযায়ী তাকে কিছু দিয়ে দিবে।

যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যেখানে কোন বিচারক কিংবা অসিয়তকৃত ব্যক্তি নেই। যেমন মরুভূমি ও শূন্য প্রান্তর তবে তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের জন্য জায়েয যে, তারা তার পরিত্যক্ত সম্পক্তি আয়ত্ব করে সুবিধামত কাজে লাগাবে।

অসিয়তের ভাষা : অসিয়ত নামার শুরুতে তাই লিখা মুস্তাহাব যা আনাস (রা) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانُوْا يَكْتُبُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِ وَصَايَاهُمْ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ اَوْصٰى اَنَّهُ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، وَاللّٰهُ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ، وَاَوْصٰى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ اَهْلِهِ اَنْ يَتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاَنْ يُصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ، وَاَوْصَاهُمْ بِمَآ اَوْصٰى بِهِ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : সাহাবাগণ অসিয়ত নামার প্রারম্ভে লিখতেন : এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের অসিয়ত। সে অসিয়ত করছে যে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নি:সন্দেহে কিয়ামত সমাগত, আল্লাহ কবর বাসীদেরকে অবশ্যই উঠাবেন। সে অসিয়ত করছে তার পরবর্তী পরিবারবর্গকে, তারা যেন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে। নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখে এবং মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে। সে তাদেরকে ঐ অসিয়ত করছে যা ইবরাহীম (আ) ও ইয়াকূব (আ) তাঁদের স্বীয় সন্তানদেরকে করেছিলেন এ বলে–

يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন নির্বাচন করেছেন। অতএব, তোমরা মুসলমান না হয়ে মরবে না। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৩২]

অত:পর সে যা অসিয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে। (হাদীসটি সহীহ, বাইহাকী হাঃ নং ১২৪৬৩ দারাকুতনীঃ ৪/১৪৫ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৬৪৭)

নিম্নোক্ত বিষয়াদির ফলে অসিয়ত বাতিল হয়

১. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন পাগল হয়ে যাবে।

২. অসিয়তের জিনিস যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩. অসিয়তকারী যখন অসিয়ত থেকে ফিরে আসবে।

৪. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন তা ফেরত দিবে।

৫. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে।

৬. যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করবে।

৭. যখন অসিয়তের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে। অথবা যে ব্যাপারে অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছিল তার সময় শেষ হয়ে যাবে।

২৬. দাস-দাসী মুক্তকরণ

দাস-দাসীদের মুক্তকরণ : কোন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে তার গর্দানকে স্বাধীন করে দেয়ার নাম দাস মুক্তকরণ।

ইসলামে মানুষ মাত্র সবাই স্বাধীন। কেবল একটি কারণ দ্বারা তাদের ওপর গোলামীর বোঝা চাপে। আর তা হলো : যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফের হিসেবে যখন কাউকে বন্দী করে আনা হবে। ইসলাম এমন দাস-দাসীদের গোলামীর কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য বহুবিধ পন্থা নির্ধারণ করেছে। যেমন : রমজানের দিনে যে রোজাদার স্ত্রী সঙ্গম করে তার কাফফারার প্রথম ধাপে রেখেছে দাস মুক্তি। এমনিভাবে স্ত্রীকে জিহার তথা সে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের কারো অঙ্গের সাথে তুলনা করার কাফ্ফারা, ভুলবশত: হত্যার কাফ্ফারা এবং কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ইত্যাদি।

দাস মুক্তির বিধান প্রবর্তনের তাৎপর্য : ইহা হচ্ছে নৈকট্য হাসিলের বড় একটি সওয়াবের কাজ; কেননা আল্লাহ তা'আলা একে হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের কাফ্ফারা বানিয়েছেন। এতে নিরাপরাধ মানুষকে গোলামীর শিকল থেকে মুক্ত

করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর দ্বারা সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সম্পদ পরিচালনার অবকাশ পায়। উল্লেখ্য যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সদকা হচ্ছে তাই যার মূল্য সবচেয়ে অধিক ও যা তার মালিকের নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রিয়।

সর্বোত্তম দাস-দাসী আযাদ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىْ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ : قَالَ قُلْتُ : اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : اَغْلَاهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا.

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। তিনি ﷺ বলেন, আমি বললাম, কোন গোলাম আজাদ করা সর্বোত্তম? তিনি ﷺ বললেন : যে গোলামের মূল্য অধিক এবং সে তার মালিকের নিকট উৎকৃষ্ট। (বুখারী, হাদীস নং ২৫১৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ৮৪)

তাদবীর : মৃত্যুর সঙ্গে গোলাম আজাদ করার শর্ত করাকে তাদবীর বলে। যেমন : মালিক তার গোলামকে বলবে : যদি আমি মারা যাই তাহলে তুমি আমার মৃত্যুর পর আজাদ। অতএব, যখন সে মৃত্যুবরণ করবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে যদি তা মালিকের সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিক না হয়। কিন্তু বেশি হলে তা বিক্রয় করা ও দান করা জায়েয হবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِهٖ اَعْتَقَ غُلَامًا لَهٗ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهٗ فَبَاعَهٗ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اَرْسَلَ بِثَمَنِهٖ اِلَيْهِ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর নিকট সংবাদ আসল যে, তাঁর সাহাবাদের মধ্যে একজন তার মৃত্যুর পরে গোলাম আজাদ করেছে।

কিন্তু এ ছাড়া তার আর কোন সম্পদ নেই। নবী করীম গোলামটিকে আট শত দিরহাম দ্বারা বিক্রয় করে সে মূল্য তার (আত্মীয়- স্বজনের) নিকট প্রেরণ করেন।
(বুখারী, হাদীস নং ৭২৮৬, মুসলিম, হাদীস নং ৯৯৭)

যা দ্বারা আজাদ হবে : দাস মুক্তি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যেক এমন শব্দ দ্বারা হতে পারে যা উক্ত বিষয়কে বুঝায়। যেমন : তুমি স্বাধীন কিংবা মুক্ত ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এমন আত্মীয়কে দাস-দাসী হিসেবে ক্রয় করবে যাকে গোলাম বানানো হারাম তবে মালিক হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। যেমন : মাতা-পিতা ইত্যাদি। যে দাসী নিজ মনিবের পক্ষ থেকে সন্তান প্রসব করবে সেই মুনিব মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে।

দাস মুক্তির ফজিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ اِمْرَاً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীন করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।
(বুখারী হাদীস নং ২৫১৭, মুসলিম, হাদীস নং ১৫০৯)

মুকাতাবাহ তথা দাস মুক্তির চুক্তি : এটি হচ্ছে দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে দিনির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার নাম।

দাস মুক্তির চুক্তির হুকুম

১. এটি ভাল দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবের নিকট প্রস্তাবিত হলে তা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰكُمْ .

তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা দাসত্ব মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে চায় তোমরা সে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের বিষয়ে জান। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান কর। [সূরা নূর : আয়াত-৩৩]

২. মনিবের প্রতি ওয়াজিব হলো : উক্ত দাসকে তার অর্থের কিছু অংশ যেমন এক চতুর্থাংশ দিয়ে কিংবা তার দেনা-পাওনা ক্ষমা করে তাকে সাহায্য করা। লিখিত চুক্তিধারী দাসকে বিক্রয় করা জায়েয, তার ক্রেতা তার চুক্তিদাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, ফলে তার ওপর যে মূল্য বর্তায় সে তা পরিশোধ করলে স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু অপারগ হলে দাসই থেকে যাবে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন। আর দুনিয়ার অপদস্ত ও পরকালের শাস্তি আজাব থেকে নিষ্কৃতি দান করুন।

২. কেসাস : অপরাধসমূহ

কুরআনের বাণী–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের বিষয়ে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে, দাস দাসের বিনিময়ে এবং নারী নারীর বিনিময়ে। অত:পর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা আংশিক ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং উত্তমরূপে তাকে তা দিতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৮-১৭৯]

১. প্রাণনাশের অপরাধ

আজ-জিনায়াহ্–অপরাধ : ইহা কোন ব্যক্তির উপর এমন দৈহিক আক্রমণ করাকে বলা হয় যার কারণে কিসাস, অর্থ সম্পদ (রক্তপণ) অথবা কাফফারা ফরজ হয়ে যায়।

কেসাস নীতি প্রবর্তনের রহস্য : আল্লাহ্ তা'আলা নিজ (কুদরতী) হাতে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টির মাঝে সম্মানিত করেছেন, তাঁকে বিশ্বের বুকে এক মহান কাজের প্রতিনিধি করেছেন–সে কাজ হলো স্বীয় পালনকর্তা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করা। আল্লাহ্ তা'আলা গোটা মানব জাতিকে আদম (আ)-এর বংশোদ্ভূত করেছেন, তাদের প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানব জাতি আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করে। যে ঈমান গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যে ঈমান না এনে কুফুরি করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। মানুষের মাঝে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার কারণে ঈমানের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না।

আবার কেউ জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়ার কারণে বিচারকের রায়ে অমনোযোগী হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টা তার নিকট শক্তিশালী হয়ে পড়ে। এমনকি অপরের জানমাল ও সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। মানুষ যাতে এ সমস্ত অপরাধে লিপ্ত না হয়, সে জন্যই শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কারণ, কিছু সংখ্যক মানুষ রয়েছে (শরিয়তের) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলার জন্য শুধু আদেশ ও নিষেধই তাদের যথেষ্ট হয় না বরং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আর যদি এ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেকেই অপরাধ ও শরিয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত এবং ইসলামের বিধি-নিষেধে উদাসীন হয়ে পড়ত।

ইসলামের এ দণ্ড-বিধি বাস্তবায়নে রয়েছে জীবণ ও মানব স্বার্থের সংরক্ষণ এবং বিভ্রান্ত আত্মা ও নিষ্ঠুর-নির্দয় আত্মার প্রতি শাসন। কেসাসের হুকুম বাস্তবায়নে রয়েছে অপহত্যা রোধ, শত্রুতার অপনোদন, সমাজ সংরক্ষণ, জাতীয় স্বস্থির জীবন, রক্তপাতের অবসান, নিহতদের পরিবারের আত্ম-সংযমতা দান, ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এবং বর্বর নিষ্ঠুরদের নিরপরাধী মানুষকে হত্যা, মহিলাদের স্বামীহারা ও শিশুদের এতিম করা থেকে জাতি ও সমাজকে সংরক্ষণ।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

হে জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ! প্রতিশোধ গ্রহণে (কেসাসে) তোমাদের জন্য রয়েছে (শান্তিময়) জীবন যাতে তোমরা তাকওয়াবান হও। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৯]

পাঁচটি আবশ্যকীয় জিনিসের হেফাজত : ইসলাম এমন পাঁচটি আবশ্যকীয় জিনিস সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করেছে যেগুলো পূর্বের সকল আসমানী বিধানে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো হলো

১. দ্বীন বা ধর্মের হেফাজত।

২. প্রাণের হেফাজত।

৩. আকল বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির হেফাজত।

৪. সমান-মর্যাদার হেফাজত।

৫. ধন-সম্পদের হেফাজত।

এসব হেফাজতের কারণেই সেগুলোর উপর আঘাত-আক্রমণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হেফাজতের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির প্রশান্তি এবং সুশৃঙ্খ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

হক-অধিকারগুলোর প্রকারভেদ : অধিকারসমূহ দুই প্রকার

১. বান্দা ও প্রভুর মাঝে হক বা অধিকার : এসব অধিকারের মধ্যে ঈমান ও তাওহীদ বা একত্ববাদ এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো সালাত।

২. বান্দা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মাঝে হক বা অধিকার : এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রক্তের হক বা অধিকার। শেষ বিচার দিবসে বান্দার প্রথমত নেওয়া হবে সালাতের। আর মানুষের হকের মধ্যে প্রথমত যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা হলো রক্তের অধিকার বিষয় ফয়সালা।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ اَوْشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

১. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ কবিরা গুনাহ্ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন : বড় কবিরা গুনাহ্ হলো আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা ও মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮৭১ মুসলিম হাদীস নং ৮৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ : اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তিনটি কারণ ছাড়া তার রক্ত বা জানে হস্তক্ষেপ হালাল হবে না। ১. (বিবাহিত) বৃদ্ধ যেনাকারী, ২. হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং ৩. মুরতাদ মুসলিমদের জামা'আত ত্যাগকারী।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮৭৮ মুসলিম হাদীস নং ১৬৭৬)

মানুষের মাঝে সমানাধিকার : মুসলিম সমাজ রক্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সমপর্যায়ের। অতএব, কিসাস, রক্তপণ, বংশ, বর্ণ ও শ্রেণি ভেদে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই সমমূল্যের। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক মহিলা থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে খবর রাখেন। [সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩]

কেসাসের হুকুম : কেসাস হলো : অপরাধির সাথে যেরূপ সে করেছে হুবহু তাই করা। আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্যে তিনটি স্তর জায়েয করেছেন : কেসাস--- অথবা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ--- অথবা ক্ষমা। আর উত্তম হলো যার দ্বারা কল্যাণ বাস্তবায়িত হবে এবং বিপর্যয় দূর হবে তাই করা। যদি কেসাস নেয়া মঙ্গলজনক হয় তাহলে কেসাসই উত্তম। আর যদি দিয়াত গ্রহণ মঙ্গলজনক হয় তাহলে দিয়াত নেয়া উত্তম হবে।

আর যদি ক্ষমা করাই মঙ্গলজনক হয় তাহলে ক্ষমা করবে। তাই প্রতিটি অবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অনিষ্ট দূর করার ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হবে। আর সর্বাবস্থায় ক্ষমা করাই উত্তম নয়। বরং যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হবে তাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আর আমরা তো আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ক্ষমা করার হকদার নয়। তাই তো তিনি অনিষ্ট দূর করার জন্য কেসাস ও দণ্ডবিধি ওয়াজিব করেছেন।

১. কুরআনের বাণী–

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্ববাসীর জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? [সূরা মায়েদা : আয়াত-৫০]

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমগুলোর বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম। [সূরা মায়েদা : আয়াত-৪৫]

৩. আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَجَزَاۤءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ

আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোস করে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। [সূরা শূরা : আয়াত-৪০]

২. হত্যার প্রকার

হত্যার প্রকারভেদ : হত্যা তিন প্রকার

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অনুরূপ।

৩. ভুলবশত হত্যা।

ক. ইচ্ছাকৃত হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যা : ইহা হলো হত্যাকারীর স্বজ্ঞানে জেনে বুঝে কোন নির্দোষ মানুষকে এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান : ইচ্ছাকৃত হত্যা করা আল্লাহর সাথে শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। ঈমানদার ব্যক্তি দ্বীনের প্রশস্তার মাঝেই থাকে যতক্ষণ সে কোন হারাম রক্তপাত না ঘটে। আর হত্যা মহাপাপ যার শাস্তি ইহকালে ও পরকালে আবশ্যকীয়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন, তাকে লা'নত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। [সূরা নিসা : আয়াত-৯৩]

ইচ্ছাকৃত হত্যার পদ্ধতিসমূহ : ইচ্ছাকৃত হত্যার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

১. এমন অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা যা দেহে বিদ্ধ হয় এবং এতে মৃত্যুবরণ করে যেমন : ছুরি, বর্শা ও বন্দুক ইত্যাদি।

২. কোন ভারি বস্তু দ্বারা যেমন : বড় পাথর, মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করা অথবা গাড়ীতে চাপা দেওয়া অথবা উপরে কোন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে চাপা দিয়ে মারা।

৩. এমন কিছুতে ফেলে দেওয়া যা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। যেমন : গভীর পানিতে ফেলে দেওয়া যাতে ডুবে যায়। অথবা কঠিন আগুনে ফেলে দেয়া যাতে পুড়ে যায়। অথবা এমন কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা নেয় ফলে উক্ত কারণেই মৃত্যুবরণ করা।

৪. রশি বা অন্য কিছু দিয়ে ফাঁস দেয়া অথবা মখু বন্ধ করে রাখার ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৫. এমন কোন গর্তে ফেলে রাখা যেখানে বাঘ কিংবা সিংহ অথবা বিষাক্ত সাপ অথবা কুকুরের আক্রমণের ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৬. কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে বিষপান করানো যার ফলে মৃত্যুবরণ করা।

৭. জাদু-টোনা ও বান ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা।

৮. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাযোগ্য বিষয়ে দু' জন সাক্ষী হাজির করা এবং তাকে হত্যা করা। অত:পর তাদের দু' জনের বলা যে, আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছা করেছিলাম। অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কেসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য যা ফরজ : "কতলে 'আমাদ" বা ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে কেসাস ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা ফরজ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নিহতের অভিভাবক (হত্যাকারীকে) হত্যা করতে পারে অথবা দিয়াতের রক্তপণ নিতে পারে অথবা ক্ষমাও করতে পারে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .

আর যদি তোমরা ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী।

[সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৭]

২. হাদীসের বর্ণনায়–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ .... وَمَنْ قُتِلَ لَهٗ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُغْدَى وَاِمَّا اَنْ يُقْتَلَ ....

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :"---- নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। রক্তপণ গ্রহণ করবে অথবা কেসাস হিসেবে হত্যা করবে---।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮৮০ মুসলিম হাদীস নং ১৩৫৫)

৩. অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : দান-সদকা করাতে মালের কোন কমতি হয় না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আরো সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে আরো উঁচ্চাসনে পৌঁছে দেন। (মুসলিম হাদীস নং ২৫৮৮)

প্রাণ হত্যার কেসাসের শর্তাবলী : প্রাণ হত্যার কেসাসে নিম্নের শর্তাবলী প্রযোজ্য

১. নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া। কাজেই যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফেরকে অথবা মুরতাদকে অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করে এতে কোন কেসাস ও দিয়াত-রক্তপণ কিছুই ফরজ হবে না। তবে শাসকের অনুমতি ব্যতীতই এ হত্যাকার্য ঘটানোর জন্য তাকে সামান্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

২. হত্যাকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে এমন হতে হবে। কাজেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ভুলবশত : হত্যাকারীর ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে না, তার রক্তপণ ফরজ হবে।

৩. নিহত ব্যক্তি যেন হত্যাকারীর সমমূল্যের হয় অর্থাৎ একই ধর্মের হয়। অতএব, নিহত কাফেরের জন্য মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তির জন্য কাফেরকে হত্যা করা যাবে। নারীর জন্য পুরুষ ও পুরুষের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে।

উপরে বর্ণিত শর্তগুলোর কোন একটি যদি না থাকে তাহলে কেসাস প্রযোজ্য হবে না বরং শক্ত দিয়াত-রক্ত মূল্য আবশ্যক হয়ে যাবে।

১. কুরআনের বাণী–

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের বিষয়ে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে, দাস দাসের বিনিময়ে এবং নারী নারীর বিনিময়ে। অত:পর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা আংশিক ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং উত্তমরূপে তাকে তা দিতে হবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৮]

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ (رضى) قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ : لَا اِلَّا كِتَابُ اللّٰهِ، اَوْ فَهْمٌ اَعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، اَوْ مَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ اَلْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

২. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম : আপনাদের (আহলে বায়তের) নিকট কোন কিতাব রয়েছে? তিনি (আলী) বললেন : আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আর কিছু না অথবা একজন মুসলিম ব্যক্তির বুঝ কিংবা এ সহিফাতে যা আছে। আবু জুহাইফা বলেন, আমি বললাম : এ সহিফাতে কি আছে? তিনি (আলী) বললেন : দিয়াত ও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।

কেসাস সম্পন্ন করার শর্তাবলী

১. নিহতের অভিভাবককে জ্ঞান সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক এবং উপস্থিত হতে হবে। যদি অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল কিংবা অনুপস্থিত হয় তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থ জ্ঞানবান অথবা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত হত্যাকারীকে আটক করে রাখতে হবে। অত:পর অভিভাবক ইচ্ছা করলে কেসাস নিবে বা রক্তপণ নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে আর ক্ষমা করে দেয়াটাই উত্তম।

২. নিহতের সকল অভিভাবকদের কেসাস বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে একমত হতে হবে। যদি কেউ একমত না হয় অথবা কেউ ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে রক্তপণ আবশ্যক হয়ে যাবে।

৩. কেসাস বাস্তবায়ন করার সময় হত্যাকারী ছাড়া অন্যরা যেন নিরাপদ হয়। সুতরাং, কোন গর্ভবতী নারীর উপর যদি কেসাস ফরজ হয় তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত কেসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না। প্রসবের পর সন্তানকে দধু পান করানোর মত কাউকে পাওয়া না গেলে বাচ্চার দুধ পান সম্পন্ন করা পর্যন্ত সুযোগ দিতে হবে।

উপযুক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে কেসাস সম্পন্ন করা জায়েয। আর যদি সবশর্ত পাওয়া না যায় তাহলে কেসাস বাস্তবায়ন করা যাবে না।

যদি ছোট বাচ্চা বা পাগল হত্যা করে তার বিধান : হত্যাকারী ছোট বাচ্চা ও পাগল হলে তাদের প্রসঙ্গে কেসাস প্রযোজ্য হবে না। তবে তাদের সম্পদ থেকে কাফফারা দিতে হবে এবং অভিভাবককে রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ছোট বাচ্চা বা পাগলকে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তারা হত্যা করে, এতে শুধু আদেশ দাতার ওপর কেসাস ফরজ হবে; কেননা ছোট বাচ্চা ও পাগল এখানে শুধু কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(বুখারী হাদীস নং ১১১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ১৩৭০)

হত্যায় শরিক হলে তার হুকুম : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে রাখে আর তৃতীয় একজন এসে ঐ ধরা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ধরে রেখে ছিল যদি জানা যায় যে তারও উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা তাহলে তাকেও কেসাস হিসেবে হত্যা করতে হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য জানা না যায় তাহলে বিচারক যেমন মনে করেন তাকে জেলখানায় বন্দী রেখে শাস্তি দিবেন।

যাকে হত্যা করতে বাধ্য করে তার হুকুম : যদি কোন ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য করে এবং সে হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসেবে দু'জনকেই হত্যা করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰأُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে জ্ঞানবান লোকেরা! কেসাসের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হও। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৯]

জাহিলী যুগের হুকুম : অনেক বিধর্মী দেশে হত্যাকারীর প্রতি দয়া করে তার শাস্তি দেওয়া হয় জেলহাজত। কিন্তু এতে নিহত ব্যক্তির প্রতি দয়া করা হয় না। নিহতের পরিবার, ছেলে- মেয়ে যারা তাদের অভিভাবককে হারিয়েছে তাদের প্রতি দয়া করা হয় না। মানব সমাজের প্রতি দয়া করা হয় না যারা ঐ সব অপরাধী সন্ত্রাসীদের ভয়ে জানমাল ও সম্মানের ঝুকি নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জীবন-যাপন করছে। আর কেসাস নীতি বর্জন করে জেলবন্দী শাস্তির কারণে বাড়ছে আরো অন্যায়, হত্যা ও বিভিন্ন রকমের অপরাধ।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন-

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

তারা কি জাহিলী ফয়সালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী আর কে? [সূরা মায়েদা : আয়াত-৫০]

কেসাস সাব্যস্তকরণ : কেসাস সাব্যস্ত হয় নিম্নরূপে

১. হত্যাকারীর হত্যার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে।

২. হত্যার ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা কসম খাওয়ার মাধ্যমে যার বিবরণ সামনে আসবে।

কেসাস বাস্তবায়ন : যখন কেসাস প্রমাণিত হবে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক শাসক বা দায়িত্বশীলের নিকট কেসাস বাস্তবায়নের আবেদন করবে তখন শাসকের প্রতি কেসাস বাস্তবায়ন করা ফরজ হয়ে পড়বে। শাসক অথবা তার দায়িত্বশীলের উপস্থিতি ব্যতীত কেসাস বাস্তবায়ন হতে পারে না। অনুরূপ ধারালো তরবারি বা ঐ জাতীয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাকারীর গর্দান ছিন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে কেসাস বাস্তবায়ন হতে হবে। যেমন : কাউকে যদি দু' টি পাথরের মাঝে মাথা রেখে আঘাত করে হত্যা করা হয় তাহলে এর কেসাসে হত্যাকারীকেও অনুরূপভাবে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

১. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ থেকে দুইটি জিনিস মুখস্ত করেছি। তিনি ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি এহসান করা ফরজ করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করা তখন উত্তমরূপে হত্যা কর এবং যখন জবাই কর তখন উত্তমরূপে জবাই কর। আর পশুকে আরাম দেয়ার জন্য তোমরা ছুরিকে ধার করে নিও। (মুসলিম হাদীস নং ১৮৫৫)

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيْلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكِ؟ اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ،

فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একজন ইহুদি একটি ছোট মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে চূর্ণ করে ফেলে। মেয়েটিকে বলা হলো : কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে? অমুক! অমুক! এমনকি যখন সে ইহুদির নাম নেওয়া হলো তখন মেয়েটি তার মাথা নেড়ে ইশারা করল। ইহুদিকে ধরে নিয়ে আসা হলো। অত:পর সে স্বীকার করলে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে দু' টি পাথরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হলো।

(বুখারী হাদীস নং ২৪১৩, মুসলিম হাদীস নং ১৬৭২)

কেসাসের সময় অপরাধীর সাথে যা করতে হবে : কেসাস ফরজ হলে অপরাধির প্রাণ বা প্রাণের চেয়ে ছোট কেসাস বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কষ্ট অনুভব না করার জন্যে কেসাসের সময় অপরাধীকে অবশ করা চলবে না; কারণ তাকে যদি অবশ করা হয় তাহলে ইনসাফের সাথে কেসাস হবে না। কেননা সে হত্যা বা কাটা কিংবা জখম করেছে অবশ না করা অবস্থায়। তাই অবশ ছাড়াই তার কেসাস নিতে হবে। অনুরূপ শরিয়তের প্রতিটি দণ্ডবিধিতে অপরাধীদেরকে অবশ করা চলবে না; যাতে করে ভয় ও কষ্ট অনুভব করে অন্যায় থেকে দূরে থাকে।

নিহতের অভিভাবক : নিহতের অভিভাবক কেসাস নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে : নিহতের অভিভাবকরা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সকলেই যদি কেসাস দাবী করে তাহলে কেসাস ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি তারা সকলে ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা করে আর বেশির ভাগ মাফ না করে তবুও কেসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি কেসাস বাতিল করা নিয়ে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় তাহলে কেবলমাত্র রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের ক্ষমাই ক্ষমা বলে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষমা ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

স্বেচ্ছায় হত্যার দিয়াত-রক্তপণ : যদি অভিভাবকরা রক্তপণ আদায় সাপেক্ষ কেসাস ক্ষমা করে তাহলে হত্যাকারীর সম্পদ থেকে একশত উট রক্তপণ দেয়া ফরজ। নবী করীম ﷺ বলেন–

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ.

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার বিষয়টা নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রতি ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা ইচ্ছা করলে হত্যার বিনিময় হত্যা করবে অথবা রক্তপণ নিবে। দিয়াত-রক্তপণ হলো : ৩০টি চার বছর বয়সে পড়েছে এমন উট এবং ৩০টি পাঁচ বছরে পড়েছে এমন বয়সের উট ও ৪০টি গর্ভবতী উট সর্বমোট ১০০টি উট। আর যদি আপোসে কোন সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তাদের বিষয়। আর ইহা দিয়াতকে শক্ত করার জন্যই।

(হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং ১৩৮৭ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৬২৬)

নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যে দিয়াত বা রক্তপণ নিয়ে থাকে ইহা মূলত : হত্যার (কাফফারা হিসেবে) দিয়াত বা রক্তপণ নয়, বরং ইহা হল কেসাসের বিনিময় স্বরূপ। তাই এ ক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে হত্যাকারীর সাথে চুক্তি করে এর চেয়েও অধিক বা কম পরিমাণে নেয়ার অথবা ক্ষমা করার। অবশ্য ক্ষমা করাই উত্তম।

বর্তমান সৌদী আরবে যে বিধান কার্যকর রয়েছে তাহল ইচ্ছাকৃত হত্যায় মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির রক্তপণ হলো এক লক্ষ দশ হাজার সৌদী রিয়াল। আর নারীর জন্য অর্ধেক। অবশ্য নিহতের অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে এর চেয়ে কম বেশি তলব করা বা ক্ষমা করার।

স্বেচ্ছায় হত্যার কিছু হুকুম

১. এক ব্যক্তির হত্যায় একদল শরীক হলে সকলকেই কেসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। কিন্তু রক্তপণের ক্ষেত্রে সকলে মিলে একজনের রক্তপণ দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে অথবা প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু হত্যা করা হারাম ইহা জানে না এমন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। অত:পর তার নির্দেশে সে (অপ্রাপ্তবয়স্ক বা হত্যা হারাম এ হুকুম অজানা প্রাপ্তবয়স্ক) যদি হত্যা করে বসে, তাহলে এমতাবস্থায় কেসাস বা রক্তপণ হত্যার নির্দেশ দানকারীর ওপর বর্তাবে। আর যদি নির্দেশপ্রাপ্ত

ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং হত্যার বিধান প্রসঙ্গে জানে তাহলে কেসাস বা রক্তপণ হত্যাকারীর ওপরই বর্তাবে নির্দেশকারীর ওপর নয়।

২. কোন হত্যায় যদি এমন দু'জন শরীক হয় যাদের একজন করলে কেসাস ফরজ হয় না। যেমন : হত্যাকারী পিতা ও অপর একজন অথবা হত্যাকারী একজন মুসলিম ও অপরজন কাফের। এমতাবস্থায় পিতার শরিক ও মুসলিমের শরিক কাফেরের উপর শুধু কেসাস ফরজ হবে। আর পিতা ও মুসলিমকে সাধারণ শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি কেসাস এর বদলে দিয়াত-রক্তপণ নিতে চাই তাহলে পিতার শরিকের উপর অর্ধেক এবং মুসলিম শরিকের উপর অর্ধেক পরিমাণ বর্তাবে।

৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরী হয় তাহলে তার মিরাছ বাতিল হয়ে যাবে।

কসম খাওয়ার পদ্ধতি : নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষেত্রে বারবার কসম করানো।

কসম করানোর হুকুম : নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী যদি জানা না যায় এবং কোন দলিলপ্রমাণ ব্যতীতই কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপবাদ দেয়া হয়, আর বাদীর দাবির সত্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহলে এমতাবস্থায় কসমের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নিয়ম ইসলামে রয়েছে।

কসম খাওয়ানোর শর্তসমূহ : শত্রুতার জের থাকা অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার কাজে প্রসিদ্ধ অথবা সুস্পষ্ট কারণ থাকা। যেমন : হত্যা ঘটিয়ে দূরে চলে যাওয়া ও নিহত ব্যক্তির বিষয়ে কটূক্তি করা। আর নিহতের অভিভাবকদের হত্যার অভিযোগে একমত হওয়া।

কসম খাওয়ানোর পদ্ধতি : কসম খাওয়ার শর্ত পূর্ণ হলে বাদীর কসম দ্বারা আরম্ভ করা হবে। পঞ্চাশজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে সকলে একবার করে মোট পঞ্চাশবার কসম করবে। কসমে বলবে : অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা কেসাস সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না করে অথবা তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহলে তাদের সম্মতিতে বিবাদী পঞ্চাশবার কসম করবে। এভাবে সে কসম খেলে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না করে এবং বিবাদীর কসমেও রাজি না হয় তাহলে প্রশাসক বায়তুল মাল থেকে রক্তপণ দেবেন, যাতে করে নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত বৃথা না যায়।

স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার হুকুম : যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা হারাম। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে তার শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنْ تَحَسّٰى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسُمُّهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ فِىْ يَدِهٖ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি পাহাড় হতে গড়িয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐভাবে পড়ে যাওয়ার শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ বিষপানের কষ্ট চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে ঐরূপ অস্ত্র দিয়ে পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

(বুখারী হাদীস নং ৫৭৭৮ মুসলিম হাদীস নং ১০৯)

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلِ فَمَابَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ.

২. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন দুজন মুসলিম ব্যক্তি তাদের তরবারি নিয়ে লড়াই করবে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে ভাল কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তির বিষয়টি কি তিনি রাসূল ﷺ বললেন : সেও তার ভাইকে হত্যার বিষয়ে আগ্রহী ছিল।

(বুখারী হাদীস নং ৬৩৬৫ মুসলিম হাদীস নং ১০)

স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর তওবা বিষয়ে : স্বেচ্ছায় হত্যাকারী তওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু এ তওবায় কেসাসের শাস্তি হতে রেহাই পাবে না; কেননা কেসাস হল হক্কুল'ইবাদ। কাজেই, স্বেচ্ছায় হত্যার সাথে তিনটি হক জড়িত :

এক. আল্লাহর হক।

দুই. নিহত ব্যক্তির হক।

তিন. অভিভাবকদের হক।

যখন কোন স্বেচ্ছায় হত্যাকারী আল্লাহর ভয়ে তওবা করে, অনুতপ্ত হয়ে বিচারকের নিকট আত্মসমপর্ণ করে, তখন তওবার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় হয়ে যায়। অনুরূপ কেসাস বা রক্তপণ বা ক্ষমার মাধ্যমে অভিভাকদের হকও আদায় হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্ট থাকে নিহত ব্যক্তির হক। আর তওবার কবুলের শর্ত হলো : বান্দার হক ফিরিয়ে দেয়া যা এখানে অসম্ভব। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, আল্লাহর দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যাপৃত করে রেখেছে।

খ. ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা : ইহা এমন আক্রমণ যা দ্বারা সাধারণত কোন নির্দোষ মানুষের হত্যা বা বড় ধরণের আহত করা হয় না। কিন্তু তা দ্বারাই মৃত্যু ঘটে যায়। যেমন : কোন ছোট লাঠি বা বেত দিয়ে কাউকে সাধারণভাবে প্রহার করা অথবা হাত দিয়ে ঘুষি মারা ইত্যাদি। এখানে প্রহার করা উদ্দেশ্য হলেও হত্যা করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ইহাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা বলা হয়। এতে কোন কেসাস নেই। তবে দিয়াত দিতে হবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার হুকুম : ইহা হারাম; কেননা, ইহা এক নির্দোষ ব্যক্তির ওপর আক্রমণ।

স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ হত্যায় কি ফরজ হবে : এরূপ হত্যা এবং ভুলবশত : হত্যায় রক্তপণ ও কাফফারা উভয়টা ফরজ হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত শত্রুতামূলক হত্যায় কোন কাফফারা নেই; কারণ সে হত্যায় এত বড় জঘন্য অপরাধ যার গুনাহ মিটে যায় না।

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় যা ফরজ হয় : এরূপ হত্যায় দিয়তে মুগাল্লাবা কঠিন রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়। আর তা নিম্নরূপ –

১. কঠিন রক্তপণ : ইহা হল একশত উট, তন্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন–

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, যা সাধারণত বেত ও লাঠি দিয়ে ঘটে থাকে। এর রক্তপণ হলো একশত উট, তন্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৫৪৭ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৬২৮)

এ রক্তপণ বা তার মূল্যের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ। আর এ রক্তপণ তিন বৎসর সময় যাবৎ পরিশোধ করবে।

২. কাফ্ফারা : ইহা হলো একটি ঈমানদার দাস আজাদ করা, যা হত্যাকারী নিজ সম্পদ থেকে প্রদান করতে হবে, যাতে তার কৃত অপরাধ মোচন হয়ে যায়। আর এতে সক্ষম না হলে একাধারে দু' মাস রোজা রাখবে।

হত্যার হুকুম বিভিন্ন রকমের হওয়ার রহস্য : ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় কেসাস ফরজ নয়; কারণ হত্যাকারীর মূলত : হত্যা করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। বরং রক্তপণ ফরজ হবে কারণ সে একজন ব্যক্তিকে নষ্ট করেছে। তাই এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে রক্তপণ দিতে হবে। আর এ রক্তপণ কঠিন প্রকৃতির করে দেয়া হয়েছে; কারণ তার উদ্দেশ্য হত্যা না থাকলেও আক্রমণ উদ্দেশ্য ছিল। আর রক্তপণের দায়িত্বভার রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষদের ওপর দেয়া হয়েছে; কারণ তারাই দয়া ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আর দাস আজাদ বা রোজা রাখার কাফফারা হত্যাকারীর প্রতি আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে অপরাধীর গুনাহ্ ক্ষমা করে নিতে পারে।

নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। আর যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা দিতে হবে না। কিন্তু অপরাদিকে কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার হুকুম : বিশেষ প্রয়োজনে মৃতদেহের আঘাত বা ক্ষতস্থান পরিক্ষা করে দেখা জায়েয রয়েছে, যাতে মৃত্যুর সঠিক কারণ চিহ্নিত করা যায়। আর সন্ত্রাসী আক্রমণ হতে মৃতব্যক্তি ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। অনুরূপভাবে কাফের ব্যক্তির মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য কাটা-ছেড়া করা বৈধ রয়েছে।

অপহরণ করে হত্যা করা বা ধোকা দিয়ে হত্যা

ইচ্ছাকৃত ও শত্রুতাবশত : কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা অথবা তাকে নিরাপদে রাখার নাম করে গোপন স্থানে নিয়ে হত্যা করা, অথবা তার মাল কেড়ে নিয়ে নির্জনে তাকে হত্যা করে ফেলা, যাতে ছিনতাই বা ডাকাতির সংবাদ মানুষ না জানতে পারে। এমন হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী মুসলমান হোক, আর কাফের হোক তাকে কেসাস নয় বরং শাস্তি হিসেবে হত্যা করতে হবে এবং নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ক্ষমা বা অন্য কোন ধরনের মতামত গ্রহণ করা হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর হাত থেকে বাচাঁর জন্য অত্যাচারীকে আঘাত হানে আর এতে অত্যাচারী মৃত্যুবরণ করে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কোন রক্তপণ বা অন্য কিছু দিতে হবে না।

গ. ভুলবশত : হত্যা

ভুলবশত : হত্যা : ইহা হলো মানুষ তার কর্মে লিপ্ত থাকে এরই মাঝে হত্যা ঘটে যায়। যেমন : শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে অথবা চিহ্নিত স্থানে তীর ছুড়ে কিন্তু তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির শরীরে লেগে নিহত হয়। মূলত : ঐ ব্যক্তি ইহা কখনও ইচ্ছা করেনি। ছোট বাচ্চা ও পাগলের ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কোন কারণ জনিত হত্যাও ভুলবশত : হত্যার সাথে সম্পৃক্ত।

ভুলবশত : হত্যার প্রকারভেদ : ভুলবশত : হত্যা দু'প্রকার

১. প্রথম প্রকার : হত্যাকারীকে কাফ্ফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। ইহা হলো যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুলবশত : হত্যা করা অথবা এমন সম্প্রদায়ের কাউকে হত্যা করা যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর ওপর কাফফারা এবং তার রক্তসম্পর্কীয় পুরুষদের ওপর হালকা রক্তপণ ফরজ হবে।

ক. হালকা রক্তপণ : একশত উট।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةٌ، وَعَشَرَةٌ بَنِىْ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ.

আমর ইবনে শু'আইব তিনি তার বাবা তিনি তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করে দিয়েছেন :"যে ভুলবশত : হত্যা করবে তার রক্তপণ হল একশত উট : ত্রিশটি দুই বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী, ত্রিশটি চার বৎসরে পড়েছে এমন উষ্ট্রী এবং দশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উট।

(হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৫৪১ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৬৩০)

এ রক্তপণের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান সৌদী আরবে ভুলবশত : হত্যার রক্তপণ হল : একলক্ষ সৌদী রিয়াল মাত্র–যা তিন বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবে। আর নারীর ক্ষেত্রে অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার সৌদী রিয়াল মাত্র।

খ. কাফ্ফারা হলো : একটি ঈমানদার দাস আজাদ করা, এতে অক্ষম হলে একাধারে দু' মাস রোজা রাখা। আর এ কাফফারা হতে হবে হত্যাকারীর সম্পদ থেকে যাতে তার অপরাধ ক্ষমা হয়।

নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়া হল উত্তম কাজ, যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বাদ হয়ে যাবে কিন্তু অপরাধীকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার : যাতে শুধু কাফফারা ফরজ হবে। এ হলো : কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে কাফেরের দেশে কাফের ধারণা করে মুসলমানদের হত্যা করা, এমন হত্যায় কোন রক্তপণ দিতে হবে না বরং হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে, তা হলো : একটি ঈমানদার দাস আজাদ করা, অক্ষম হলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

মুমিনের কাজ নয় কোন মুমিনকে হত্যা করা কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন ঈমানদার কৃতদাস আজাদ করবে এবং রক্ত সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঈমানদার হয়, তাহলে রক্তপণ সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে এবং ঈমানদার কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি তা না পায় তাহলে সে আল্লাহর নিকট পাপ মোচন করানোর জন্য একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা–৫ নিসা : আয়াত-৯২]

মৃতের পক্ষ থেকে রোজা কাজা করার হুকুম : যে ব্যক্তি রমজান মাসের কাজা রোজা, কাফফারার দুই মাস রোজা, অথবা মানতের রোজা রেখে মারা যায় তার দু'টি অবস্থা হতে পারে

১. রোজা রাখতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু রোজা রাখেননি। এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিছরা রোজা রাখবে, অবশ্য তারা পরস্পর ভাগাভাগী করে নিতে পারে, তবে শর্ত হলো যেন একজনের পর আরেকজন এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে শেষ করে।

২. অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে অপারগ ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে কাজা বা মিসকিনকে খাওয়ানো কোনটাই করতে হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা না করে মৃত্যুবরণ করে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোজা পালন করে নিবে। (বুখারী হাদীস নং ১৯৫২ মুসলিম হাদীস নং ১১৪৭)

মানুষের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গ : ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ও ভুলবশত : হত্যায় হত্যাকারীর রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে। রক্তপণের দায়িত্ব বহনকারীরা হলো : হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে অতি নিকটতম অত :পর যারা নিকটতম তাদের দিয়ে শুরু হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মূল যারা তারাই শুধু গণ্য

হবে, শাখা-প্রশাখা নয়। আর এসব ব্যক্তিবর্গ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করবে।

রক্ত সম্পর্কীয়রা যা বহন করবে না : ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তিরা রক্তপণ এর দায়িত্ব নিবে না। কোন কৃতদাস হত্যা করলে বা তাকে হত্যা করা হলে তখনও রক্তপণের দায়িত্ব নিবে না। এমনকি এক তৃতীয়াংশের কম বা কোন সন্ধিচুক্তি অথবা স্বীকারোক্তি কোন ক্ষেত্রেই তারা দায়িত্ব বহন করবে না। অনুরূপ কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, দরিদ্র ও বিধর্মীর ওপর রক্তপণের দায়িত্ব বর্তাবে না।

২. প্রাণহানী ব্যতীত যেসব অপরাধ

প্রাণহানী ব্যতীত যে সমস্ত অপরাধ : ইহা হল অন্যের পক্ষ থেকে কোন মানুষের দেহে এমন সবকষ্ট ও আঘাত হানা যাতে প্রাণনাশ হয় না।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জখম ও বিচ্ছেদ করার মত আক্রমণ : ইহা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তা হলে কেসাস আর যদি ভুলবশত : বা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপ হয় তা হলে রক্তপণ।

যে ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির বিনিময়ে কেসাস করা হয় তাকে ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আঘাতের ও কেসাস করা হয়, আর যদি ব্যক্তির বিনিময়ে ব্যক্তিকে কেসাস করা না যায় তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও যাবে না, অর্থাৎ যে কারণে প্রাণের কেসাস ফরজ হয়। আর তাহল ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড বা আঘাত ঘটালে। কাজেই, ভুলবশত : ও ইচ্ছাকৃত এর অনুরূপে কোন কেসাস নেয় বরং তাতে রয়েছে রক্তপণ-দিয়াত।

প্রাণহানী ছাড়া ইচ্ছাকৃত আক্রমণে দুই প্রকারের কেসাস

১. প্রথম প্রকার : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাস : হাত, পা, চক্ষু, কান, নাক, আঙ্গুল, দাঁত, ঠোঁট, লিঙ্গ ইত্যাদি দেহের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে অনুরূপ অঙ্গ কেসাস হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ط

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমগুলোর বিনিময়ে সমান জখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যে সব লোক আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম। [সূরা মায়িদা : আয়াত-৪৫]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাসে শর্তাবলী : আহত ব্যক্তি নির্দোষ হতে হবে, আঘাতকারী ও আহত একই ধর্মের হতে হবে; কারণ কাফেরের অঙ্গের বিনিময় মুসলমানের কেসাস হতে পারে না। অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, আঘাতকারী যেন পিতা না হয় এবং আঘাত হতে হবে স্বেচ্ছায়। এসব শর্ত পাওয়া গেলে নিম্নে বর্ণিত শর্তের আলোকে কেসাস সমাধা করতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেসাস সম্পন্ন করার শর্তবলী

১. **সীমারেখার সংরক্ষণ :** অঙ্গ জোড়া পর্যন্ত বা তার পূর্ণ সীমা পর্যন্ত কর্তন করা।

২. **নাম ও পরিমাণে বরাবর রক্ষা করা :** অর্থাৎ চক্ষুর বিনিময় চক্ষু তুলতে যেন বামের বিনিময়ে ডান না হয়, অনুরূপ এক আঙ্গুলের বিনিময় অপর আঙ্গুল যেন না হয়।

৩. **সুস্থতায় ও পূর্ণতায় বরাবর হওয়া :** সুতরাং ভাল হাত বা পা-পঙ্গু হাত বা পা এর বিনিময় কাটা যেতে পারে না। অনুরূপ দৃষ্টিহীন চোখের বিনিময় ভাল চোখ নেয়া যেতে পারে না, তবে ভালোর বিনিময় খারাপ বা দুর্বল নেয়া যেতে পারে, তবে ধোকা যেন না হয়। যখন উপরিউক্ত শর্তগুলো পরিপূর্ণ হবে তখন কেসাস নেয়া জায়েয হবে। আর যদি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে কেসাস বাদ হয়ে দিয়াত-রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে।

২. **দ্বিতীয় প্রকার :** জখমের কেসাস : যখন স্বেচ্ছায় জখম করবে তখন কেসাস ফরজ হবে।

ব্যক্তির কেসাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত রয়েছে জখমের কেসাসের ক্ষেত্রেও ঐ সকল শর্ত প্রযোজ্য। কেসাস সম্পন্নের ক্ষেত্রে জখমের সীমারেখা অবশ্যই

লক্ষ্যণীয়। দেহের যে অংশেই জখম হোক না কেন যেমন : মাথা, উরু, পায়ের নলা ইত্যাদি। যেখানে হাড় পর্যন্ত জখম হয়েছে সেখানে সমপরিমাণ কেসাস হবে।

যথাযথ পরিমাণে যখন কেসাস সম্ভব হবে না তখন কেসাস বাদ হয়ে রক্তপণ আবশ্যক হয়ে যাবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল হয়ে কেসাস না নিয়ে দিয়াত-রক্তপণ নেয়াই উত্তম। তার চেয়েও উত্তম হল সবকিছু ক্ষমা করে দেয়া। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিয়ে সংশোধন করে নিবে তার পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে। অবশ্য যে ক্ষমা করতে সক্ষম তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ مَا رُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ اِلَّا اَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ.

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন কোন কেসাসের বিষয় উপস্থাপন করা হতো তখন তিনি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৪৯৭, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৬৯২)

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তার হুকুম

১. যে সমস্ত অপরাধে কোন অঙ্গহানী করা হয় তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পরবর্তীতে সেটির জের হিসেবে বড় কোন ক্ষতি হলে বা মৃত্যুবরণ করলে তাতেও কেসাস বা দিয়াত ফরজ হবে। যেমন : কারো একটা আঙ্গুল কাটার কারণে যদি হাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাতের কেসাস ফরজ হবে এবং এ কারণে মৃত্যু ঘটলে ব্যক্তির কেসাস ফরজ হয়ে যাবে।

২. যে ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির দণ্ড-বিধি প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের কেসাসে মৃত্যুবরণ করে বায়তুল মালের ফান্ড থেকে তার রক্তপণ দেয়া হবে।

৩. দেহে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কোন অঙ্গ বা জখম ভাল না হওয়া পর্যন্ত তার কেসাস নেয়া যাবে না।

৪. যদি কোন আঙ্গুল কেটে ফেলে আর বাদী তা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর তা কব্জি বা প্রাণ নাশ পর্যন্ত পৌছে এবং ক্ষমা কোন বিনিময় ছাড়াই হয় তাহলে

কোন কেসাস ও দিয়াত লাগবে না। আর যদি ক্ষমা মাল দ্বারা হয়েছিল এমন হয় তাহলে পূর্ণ দিয়াত পাবে।

হকের বিষয়ে ইনসাফ করার হুকুম : যে ব্যক্তি অন্যকে লাঠি, বেত বা হাত দিয়ে আঘাত করে অথবা চপেটাঘাত করে এর কেসাস হিসেবে অপরাধীকে সেরূপভাবে একই স্থানে ও পরিমাণে আঘাত করা হবে। তবে যদি মাফ করে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে।

যে মানুষের ঘরে অনুমতি ছাড়া তাকায় তার হুকুম : কেউ যদি কারো ঘরে অনুমতি ছাড়াই তাকায়, আর তারা তার চোখ তুলে নেয় এতে কোন রক্তপণ বা কেসাস নেই।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضی) قَالَ : قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ ﷺ : لَوْ اَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবুল কাসেম মুহাম্মদ ﷺ বলেন :যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার বাড়ির ভেতরের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তার দিকে পাথর ছুড়ে মেরে তার চোখ ফুটা করে দাও তাহলে তোমার কোন অপরাধ হবে না। (বুখারী হাদীস নং ৬৯০২ মুসলিম হাদীস নং ২১৫৮)

একজন মানুষের রক্ত অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার হুকুম

১. বিশেষ প্রয়োজনে একজন মানুষের রক্ত আরেকজনের দেহে দেয়া জায়েয আছে। যদিও এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দলিল নেই তবুও অতি প্রয়োজনে ইহা জায়েয। কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় রক্ত দাতার কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই সম্মতিসাপেক্ষ ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোগীর মুক্তির জন্য প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ দেহের খাবার হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয আছে।

২. বিপদগ্রস্ত ও আকস্মিক অবস্থা যেমন : দুর্ঘটনা ও বাচ্চা প্রসবের অবস্থার জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা করে রাখা জায়েয। এ ছাড়া আরো যে সকল অবস্থায় রক্তশূন্য দেখা দেয়।

৩. দিয়াতসমূহ

১. প্রাণনাশের দিয়াত বা রক্তপণ

দিয়াত বা রক্তপণ হলো : আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার অভিভাবককে আক্রমণের কারণে যে সম্পদ দেয়া হয় তাকেই দিয়াত বা রক্তপণ বলা হয়।

দিয়াতের প্রকার : দিয়াতের প্রকার ছয়টি : (১০০) টি উট, (২০০) টি গরু, (২০০০) ছাগল বা দুম্বা, (১০০০) মিছকাল সোনা, (১২০০০) রৌপ্যমুদ্রা ও (২০০) জোড়া কাপড়।

মুসলিমের দিয়াতের আসল : একজন মুসলিম ব্যক্তির মূল রক্তপণ হল : একশত উট। আর অন্যান্য প্রকারগুলো তার পরিবর্তে যদি উটের দাম অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় অথবা না পাওয়া যায়। কাজেই একজন মুসলিমের মূল দিয়াত একশত উট। যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তার পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করবে। আর যদি অন্যটি উপস্থিত করে তাহলে তা গ্রহণ করা আবশ্যক। আর দেশের রাষ্ট্র প্রধান ইচ্ছা করলে যাতে উপকার ও মানুষের জন্য সহজ তা নির্বাচন করতে পারেন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ : آلَا اِنَّ الْاِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ آلْفَ دِيْنَارٍ، وَعَلٰى اَهْلِ الْوَرَقِ اِثْنَىْ عَشَرَ آلْفًا، وَعَلٰى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِىْ بَقَرَةٍ، وَعَلٰى اَهْلِ الشَّاءِ آلْفَىْ شَاةٍ، وَعَلٰى اَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ، قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) একদা খুতবা দেওয়ার সময় বলেন : জেনে রাখ উটের মূল্য বেড়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন : ওমর (রা) দিয়াত নির্ধারণ করেন এভাবে : স্বর্ণের মালিকের জন্য একশত উটের বিনিময় এক হাজার দিনার, রূপার মালিকের জন্য বার হাজার দেরহাম, গরুর মালিকের জন্য দুইশত গরু, ছাগলের মালিকের জন্য দুই হাজার ছাগল, কাপড়ের মালিকের জন্য দুইশত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি জিম্মিদের দিয়াতের বিষয়টি পূর্বের উপরেই ছেড়ে দেন তথা কোন শিথিল করেননি। (হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৫৪২, বাইহাকী হাদীস নং ১৬১৭১ ইরওয়া দ্রঃ হাদীস নং ২২৪৭)

এক হাজার দিনার ৪২৫০ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ।

মুসলিমা মহিলার দিয়াতের পরিমাণ : একজন মুসলমান মহিলাকে ভুলবশত : হত্যা করা হলে তার রক্তপণ হলো পুরুষের অর্ধেক। অনুরূপ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও জখমের দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।

عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِىْ عُرْوَةُ الْبَارِقِىُّ مِنْ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِىْ فِى السِّنِّ وَالْمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

শুরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট 'উরওয়া বারূকী ওমর (রা)-এর নিকট থেকে এসে বলেন : নিশ্চয় নারী ও পরুষ দাঁত ও মাথার জখমের দিয়াতে এক সমান। আর এর চেয়ে উপরের দিয়াতে নারী পুরুষের অর্ধেক। (হাদীসটি সহীহ, ইবনু আবি শাইবা মুসান্নাফে হাদীস নং ২৭৪৮৭ ইরওয়াউল গালীল দ্র :২২৫০)

দিয়াতের প্রকার : শ্রেণীর দিক থেকে দিয়াত তিন প্রকার :

প্রাণনাশের দিয়াত----, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত----- ও কল্যাণকর জিনিসের দিয়াত। যে কেউ সরাসরি কোন মানুষের জীবন নাশে বা কারণে জড়িত থাকবে তার প্রতি দিয়াত আবশ্যক হবে।

১. যদি দু'জনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত বর্তাবে।

২. যদি দু'জনই কারণ হয় তাহলে দু'জনের প্রতি দিয়াত আসবে।

৩. যদি একজন সরাসরি আর অপরজন কারণ হয় তাহলে সরাসরি ব্যক্তির ওপর জামানত আবশ্যক।

তিনটি মাসায়েল ছাড়া

ক. যদি সরাসরি ব্যক্তিকে জামানতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয়। যেমন : যদি একজন অপরজনকে হাত বাঁধা অবস্থায় সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করে আর সিংহ তাকে খেয়ে ফেলে।

খ. যদি সরাসরি ব্যক্তিকে শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে জামানতে বাধ্য না করা যায়। যেমন : ছোট বাচ্চা ও পাগল, তাহলে জামানত যারা তাদেরকে অপরাধের জন্য নির্দেশ করেছে তার প্রতি।

গ. শরিয়তে বৈধ এমন কারণ দ্বারা ঘটলে যেমন : একটি দল মিলে হত্যার যোগ্য কাজের ওপর সাক্ষী দেওয়ার ফলে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তারা সাক্ষ্য থেকে ফিরে এসে বলল : আমরা তাকে হত্যার ইচ্ছায় সাক্ষী দিয়েছি, তাহলে জামানত সাক্ষীদের প্রতি।

দিয়াতের হুকুম : সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি অথবা নিরাপত্তাকামী যিম্মি অথবা চুক্তিবদ্ধ যিম্মি যে ব্যক্তিই হোক না কেন কোন প্রাণকে নষ্ট করলে তার ওপর রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে। এ অপরাধ যদি স্বেচ্ছায় হয় তাহলে তৎক্ষণাত অপরাধীর সম্পদ থেকে রক্তপণ আদায় করা ফরজ। আর যদি স্বেচ্ছায় না হয় বরং স্বেচ্ছার অনুরূপ বা ভুলবশত : হত্যা হয় তাহলে অপরাধীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিদের ওপর তিন বছর সময়কালে রক্তপণ আদায় করা ফরজ হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ قُتِلَ لَهٗ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدَىَ وَاِمَّا اَنْ يُقْتَلَ.

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :----যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সে যে কোন একটি কল্যাণকর এখতিয়ার করে। চাই সে ফিদয়া নেবে অথবা হত্যার পরিবর্তে হত্যা করবে।
(বুখারী হাদীস নং ৬৮৮০ ও মুসলিম হাদীস নং ১৩৫৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) : اَنَّ امْرَاَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا ، فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা একজন অপরজনের উপর পাথর নিক্ষপ করলে তার গর্ভপাত ঘটে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দাস বা দাসী দ্বারা ফয়সালা করেন।

(বুখারী হাদীস : নং ৬৯০৪ মুসলিম হাদীস : নং ১৬৮১)

দিয়াত ফরজের অবস্থাসমূহ : নিম্নে অবস্থাগুলোতে দিয়াত নির্দিষ্ট হবে : যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দিয়াত এখতিয়ার করে। যদি কেসাস ক্ষমা করে দেয়। যদি অপরাধী ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। যদি অপরাধী চারজনকে হত্যা করে তাহলে তার প্রতি চারটি গর্দান লাগবে। অতএব, যদি চারজনের একজন কেসাস এখতিয়ার করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর অবশিষ্ট তিনজনকে তিনটি দিয়াত দিতে হবে; কারণ তাদের প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।

কাফেরের দিয়াতের পরিমাণ : কাফের চাই সে আহলে কিতাব হোক বা অগ্নিপূজক কিংবা মূর্তিপূজক হোক অথবা অন্য কোন কাফের হোক। তাদের পুরুষের জন্য রক্তপণ হল একজন মুসলিম পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক এবং মহিলার রক্তপণ মুসলিমা মহিলার অর্ধেক। চাই সে রক্তপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে বা জখমের ক্ষেত্রেই হোক। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার হোক বা ভুলবশত : হত্যার হোক; কারণ সকলেই কাফের। কেননা আহলে কিতাব নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়্যাতের পরে ইসলামের সাথে কুফরি করেছে। তাই এরা ও কাফেররা সকলেই কুফরিতে, আজাবে, জাহান্নামে প্রবেশে বরাবর এবং দিয়াতেও সমান। কিন্তু যা দলিল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেমন : আহলে কিতাবের মহিলাদের বিবাহ করা এবং তাদের জবাইকৃত পশু-পাখির মাংস খাওয়া জায়েয অন্যান্য সমস্ত কাফের থেকে আলাদা।

১. আল্লাহর বাণী–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তা তার থেকে কবুল করা হয় না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ : وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.

২. আমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা ও তিনি তার বাবার বাবা (দাদা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : কোন কাফেরের বিনিময়ে কোন মুসলিম হত্যা করা চলবে না।" একই সনদে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন : "কাফেরের দিয়াত ঈমানদার ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক।

(হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৫৮৩ ও তিরমিযী হাদীস নং ১৪১৩)

পেটের বাচ্চার দিয়াতের পরিমাণ : যদি পেটের বাচ্চার মায়ের প্রতি আক্রমণের ফলে মৃত্যু অবস্থায় গর্ভপাত ঘটে তাহলে একটি দাস বা দাসী দিয়াত লাগবে। যার মূল পাঁচটি উট। ইহা তার মায়ের দিয়াতের এক দশমাংশ। আর গোলামের দিয়াত তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক।

বাস-গাড়ি দুর্ঘটনায় যার প্রতি দিয়াত আবশ্যক : গাড়ীর চালকের উদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে যদি গাড়ী উল্টে যায় অথবা অন্য গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনায় পতিত হয় এতে যা ক্ষতি হবে সবকিছুই চালকের ওপর বর্তাবে। কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার ওপর রক্তপণ ও কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি চালকের অনিয়ম ছাড়াই কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেমন : ভাল চাকা নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু পরে তা হাওয়া শূন্য হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমতাবস্থায় চালককে কোন রক্তপণ ও কাফফারা দিতে হবে না।

দিয়াত যে বহন করবে : তিনজনের কোন একজন দিয়াত বহন করবে

১. **হত্যাকারী :** স্বেচ্ছায় হত্যায় তার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে তার প্রতি দিয়াত ফরজ হবে, যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ কেসাস নেয়া থেকে বিরত হয়।

২. 'আকেলা তথা রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ। এদের প্রতি স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ ও ভুলবশত : হত্যার দিয়াত দেয়া ফরজ।

৩. বাইতুল মাল তথা কোষাগার।

নিম্নলিখিত অবস্থায় বাইতুল মাল ঋণ ও রক্তপণ বহন করবে

১. যখন কোন মুসলমান ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে ঋণগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তখন প্রশাসকের দায়িত্ব হলো বাইতুল মাল থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা।

২. যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশত : অথবা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপভাবে হত্যা করে এবং তার পক্ষ থেকে রক্তপণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকে। এমনকি নিজেও অক্ষম তখন বাইতুল মাল থেকে রক্তপণ দেওয়া হবে।

৩. যদি কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী জানা না যায় যেমন : প্রচণ্ড যানজটের ভীড়ে পড়ে অথবা তওয়াফের সময় চাপে পড়ে ইত্যাদি ভাবে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এমন ব্যক্তিদের রক্তপণ বাইতুল মাল থেকে দেওয়া হবে।

৪. যদি বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য কসম খাওয়ার ফয়সালা দেন, আর নিহতের ওয়ারিসগণ শপথ করতে ভয় পায় এবং অপরাধীও কসমে রাজি না হয়। এমতাবস্থায় রাষ্টপ্রতি বাইতুল মাল হতে দিয়াত দেবেন।

৫. যদি রাষ্ট্রপতির বিশেষ কাজে ভুলের কারণে দিয়াত ফরজ হয় তাহলে বাইতুল মাল থেকে আদায় করবেন।

যদি রাজা প্রজাকে, পিতা পুত্রকে, শিক্ষক ছাত্রকে আদব দেয়ার জন্য সাধারণভাবে শাস্তি প্রয়োগ করে এবং এতে কোন ক্ষতি হয় তখন তারা দায়ভার বহন করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি কূপ খননের জন্য অথবা গাছে উঠার জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ করে এবং সে উক্ত কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে মালিক কোন দায়ভার বহন করবে না।

যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যার হুকুম : চুক্তিবদ্ধ যিম্মি অথবা নিরাপত্তাধারী যিম্মিকে হত্যা করা হারাম। যে হত্যা করবে সে মহাপাপে লিপ্ত হবে; কারণ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنْ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে। (বুখারী হাদীস নং ৩১৬৬)

ফর্মা-১২; লেনদেন

অপরাধী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার দিয়াতের হুকুম : যে স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অত:পর মৃত্যুবরণ করবে তার কেসাস রহিত হয়ে যাবে। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য তার দিয়াত বাকি থাকবে।

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয় তাহলে কেসাস ফরজ হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তাহলে কেসাস নয় বরং রক্তপণ ফরজ হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ তিন প্রকার

১. প্রথম প্রকার : দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকারী বস্তুসমূহের রক্তপণ।

ক. মানুষের দেহে যে সমস্ত অঙ্গ একটি সে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে যেমন : নাক, জিহবা, লিঙ্গ, অনুরূপ শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, বাকশক্তি, বিবেক বুদ্ধি ও মেরুদণ্ড ইত্যাদি।

খ. মানুষের দেহে যে সমস্ত অঙ্গ দুটি যেমন : দুই চক্ষু, দুই কান, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা ও দুই চোয়াল ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিটির জন্য অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই নষ্ট হয়ে যায় তখন একজন মানুষের পরিপূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন একটি অকেজো হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক রক্তপণ। আর যদি দু'টিই অকেজো হয়ে যায় তখন পরিপূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। আর এক চোখ অন্ধ অপরটি ভাল, এমন ব্যক্তির ভাল চোখটি নষ্ট হয়ে গেলে পরিপূর্ণ দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে।

গ. মানুষের দেহে যে সমস্ত অঙ্গ চারটি যেমন : দু'চোখের চারটি পাতা এগুলোর একটি নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ। আর চারটি নষ্ট হয়ে গেলে পরিপূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে।

ঘ. মানুষের দেহে যে সমস্ত অঙ্গ দশটি যেমন : দুই হাত ও দুই পা এর দশটি আঙ্গুল। প্রতিটি আঙ্গুলে এক দশমাংশ রক্তপণ আর দশটি আঙ্গলে পরিপূর্ণ রক্তপণ। এক আঙ্গুলের মাথায় পূর্ণ আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ। আর বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথায় অর্ধ আঙ্গুলের রক্তপণ। যদি কোন একটি আঙ্গুল অকেজো হয়ে যায় তাতে এক দশমাংশ রক্তপণ। দশটি আঙ্গুলই অকেজো হয়ে গেলে পূর্ণ মানুষের রক্তপণ।

৬. **দাঁতের রক্তপণ :** মানুষের মোট ৩২টি দাঁত। এর মধ্যে চারটি ছানায়া-সামনের দাঁত, চারটি রুবাইয়া, চারটি আনয়াব-কর্তন দাঁত এবং বাকি বিশটি আদরাস-মাড়ীর দাঁত। প্রত্যিটি দাঁতের রক্তপণ হল-পাঁচটি করে উট। আর সমস্ত দাঁতের মোট দিয়াত হলো (১৬০) টি উট।

চুল ও পশমের দিয়াত : মাথা, দাঁড়ি, দুই চোখের ভ্রু ও দুই চোখের পাতার চুল-এ চার ধরনের চুলের যে কোন একটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। তবে শুধু এক চোখের ভ্রু নষ্ট হলে অর্ধেক রক্তপণ এবং এক চোখের পাতার চুল নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ দিতে হবে।

অবশ অঙ্গের দিয়াত : পঙ্গু হাত, দৃষ্টিহীন চোখ ও কালদাঁত নষ্ট হলে স্ব-স্ব রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে।

২. **দ্বিতীয় প্রকার :** মাথা ও দেহে বড় আঘাত হলে তার রক্তপণ : মাথা বা মুখমণ্ডলে যে আঘাত হয় ইহা সাধারণত : দশ প্রকারের হতে পারে, পাঁচটিতে বিচার অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে আর অপর পাঁচটিতে শরীয়তের নির্ধারিত রক্তপণ দিতে হবে।

বিচার দ্বারা পাঁচটি আঘাত হলো–

১. **হারেসা :** চামড়ায় সামান্য জখম, যাতে কোন রক্তপাত হয় না।

২. **বাজেলা :** এমন জখম যাতে সামান্য রক্তপাত হয়।

৩. **বাযে'আ :** চামড়া জখম হওয়ার পর গোশতও ভেদ করে।

৪. **মুতালাহেমা :** যে জখম গোস্তের গভীরে চলে যায়।

৫. **সেমহাক :** যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝে পাতলা আবরণ পর্যন্ত পৌছে যায়।

উপরিউক্ত পাঁচটি জখমের ক্ষেত্রে রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই বরং এগুলো বিচারের মাধ্যমে করতে হবে।

বিচার : অপরাধীকে একজন অপরাধী না এমন দাস নির্ধারণ করবে। অত:পর সে তা থেকে মুক্ত নির্ধারণ করবে। এরপর যে স্বল্প মূল্য হবে সে পরিমাণ তার দিয়াত হবে। আর বিচারক সাহেব এর নির্ধারণে প্রচেষ্টা করবেন এবং বিচারে দুর্নাম, ক্ষতি ও ব্যাথা অর্জনের বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

আর যে সমস্ত জখমে ইসলামী শরিয়তে রক্তপণ নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে তা হলো–

১. মুযেহাদীস যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং হাড় স্পষ্টভাবে বের হয়ে যায়। এতে রক্তপণ হল পাঁচটি উট।

২. হাশেমা : যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে দেয়। এতে রক্তপণ হল দশটি উট।

৩. মুনাক্কিলা : যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে ও হাড় বের হয়ে যায় বা সরে যায়। এতে রক্তপণ হল : পনেরটি উট।

৪. মা'মূমা : যে জখম মস্তিষ্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে রক্তপণ হল : পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।

৫. দামেগা : যে জখমে মস্তিষ্ক বা মগজের উপরের আবরণ ভেদ বা ছিন্ন হয়ে যায় এতেও পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ।

গোটা দেহের কোথাও যদি জখম হয় এবং তা গভীরে পৌছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি গভীরে না পৌছে তাহলে বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে।

জায়েফা অর্থাৎ– জখম যদি পেট, পিঠ, বক্ষ ও কণ্ঠনালীর গভীরে পৌছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে।

তৃতীয় প্রকার : হাড়ের রক্তপণ : হাড় ভাংলে নিম্নের নিয়মে দিয়াত ওয়াজিব হবে–

১. পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হয়ে গেলে একটি উট রক্তপণ দিতে হবে।

২. কাঁধের সাথে সম্পৃক্ত বুকের একটি হাড় ভেঙ্গে গেলে তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হলে একটি উট। আর দু' টি হাড় হলে দুটি উট রক্তপণ দিতে হবে।

৩. হাত, বাহু, উরু, পায়ের নলা যদি ভাঙ্গার পর ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হলে দু' টি উট।

৪. উল্লেখিত হাড়গুলো ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক না হলে বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। আর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঠিক করা সম্ভব না হলে পূর্ণ ব্যক্তির রক্তপণ দিতে হবে।

উপরিউক্ত হাড় ছাড়া অন্যসব হাড়ের ক্ষেত্রে বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে।

যদি আক্রমনাক্ত ব্যক্তি অপরাধির নিকট দিয়াতের বিনিময়ে চিকিৎসা চায়, তাহলে ইহা তার হক হবে না। বরং শরিয়ত কর্তৃক দিয়াত তাকে দেওয়া হবে। চাই তা কম হোক বা অধিক হোক এবং সে তার প্রতি আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিধানে সন্তুষ্টি থাকা ওয়াজিব। পূর্বোল্লিখিত বিধানগুলোর দলিল হল–

عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ .... وَاَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ، وَفِى الْاَنْفِ اِذَا اُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الْمَاْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِى الْمُقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاِبِلِ، وَفِىْ كُلِّ اُصْبُعٍ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْاِبِلِ، وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ، وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ، وَاَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْاَةِ، وَعَلٰى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفُ دِيْنَارٍ.

রাসূলে করীম ﷺ ইয়ামান বাসীদের জন্য লিখিতভাবে এক ফরমান জারি করেন যাতে ফরজ, সুন্নাত ও রক্তপণের বর্ণনা ছিল------। কোন ব্যক্তির রক্তপণ হল : একশত উট, সম্পূর্ণ নাক কেটে ফেললে পূর্ণ রক্তপণ, অনুরূপ জিহবা, দুই ঠোঁট,

অণ্ডকোসের দুই বিচি, লিঙ্গ, মেরুদণ্ড, দুই চক্ষু ইত্যাদিতে পূর্ণ রক্তপণ, একটি পায়ে অর্ধেক রক্তপণ, মাথার জখমে মস্তিষ্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছলে এবং পেট, পিঠ, বুক ও কণ্ঠনালীর গভীরে পর্যন্ত জখম হলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ, দেহের গোশত ভেদ হয়ে হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে আসলে পনেরটি উট রক্তপণ, হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলে দশটি উট, দাঁতে এবং মাংস ভেদ হয়ে হাড় বের হয়ে গেলে এতে পাঁচটি উট, নারীকে কোন পুরুষ হত্যা করলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর স্বর্ণের মালিকের নিকট এক হাজার দিনার নেয়া হবে। (হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাদীস নং ৪৮৫৩, দারেমী হাদীস নং ২২৭৭ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ ২২১২)

মহিলার দিয়াতের পরিমাণ

নারীকে ভুলবশত : হত্যা করা হলে পুরুষের অর্ধেক রক্তপণ। অনুরূপ নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের অর্ধেক রক্তপণ।

৪. সাজা-দণ্ডবিধি

আল্লাহর বাণী–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

এ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর নিকটও যেও না। অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ নিজের আয়াতগুলো মানুষের জন্য, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে। [সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭]

১. দণ্ডবিধির বিধি-বিধান

"হুদূদ" শব্দটি "হাদ্দ"এর বহুবচন যার অর্থ দণ্ড বা সাজাসমূহ। ইসলামে দণ্ড-সাজা বলা হয় : আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের নাফরমানি করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তিকে।

দণ্ডবিধির প্রকারভেদ : ইসলামে দণ্ডবিধি পাঁচ প্রকার যথা–

১. যিনা-ব্যভিচারের সাজা।

২. সতী-সাধ্বী নারী বা সৎ-সাধু পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা।

৩. চুরি করার সাজা।

৪. রাহাজানি-ছিনতাই-ডাকাতি ইত্যাদির সাজা।

৫. বিদ্রোহীদের সাজা। এ ধরনের অপরাধের প্রতিটির জন্য রয়েছে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি।

দণ্ডবিধি-সাজা জারিকরণের রহস্য : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যা আদেশ করেছেন তা করতে এবং যা

নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। আর তাঁর বান্দাদের মঙ্গলার্থে নানা ধরনের দণ্ডবিধি আরোপ করেছেন। যারা এগুলো পালন করবে তাদের জন্য জান্নাত এবং যারা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মানুষের প্রবৃত্তি যখন অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং পাপে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তার জন্য তওবা ও ক্ষমার দরজা খুলে দেন। কিন্তু যখন প্রবৃত্তি আল্লাহর নাফরমানি করতেই থাকে এবং প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকার করে বরং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানার মাঝে প্রবেশ করে এবং তাঁর সীমা-রেখা অতিক্রম করে। যেমন : মানুষের সম্পদ ও ইজ্জতের ওপর চড়াও হওয়া। এমতাবস্থায় আল্লাহর দণ্ড ও সাজা বাস্তবায়ন করে তার নফসের অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও বাধা দেয়া আবশ্যক। যাতে করে উম্মতের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত হয়। আর প্রতিটি দণ্ডবিধি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ এবং সবার প্রতি নিয়ামত।

পাঁচটি আবশ্যকীয় জিনিসের হেফাজত : মানুষের জীবন পাঁচটি আবশ্যকীয় (দ্বীন, জীবন, সম্পদ, বিবেক ও সম্মান) জিনিসকে সংরক্ষণ করার ওপর নির্ভরশীল। দণ্ড-সাজা বাস্তবায়নে ঐ আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা হয়। অতএব, কেসাস দ্বারা জীবনের সংরক্ষণ, চুরির সাজা বাস্তবায়নে সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যভিচার ও অপবাদের দণ্ডদানে ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা, মদ পানের সাজায় বিবেকের সংরক্ষণ, বিদ্রোহের দণ্ডবিধি দ্বারা নিরাপত্তা ও সম্পদ এবং জীবন ও সম্মানের সংরক্ষণ। আর সকল দণ্ডবিধি প্রয়োগে হয় দ্বীনের রক্ষা।

দণ্ড-সাজার ফিকাহের-সূক্ষ্ম বুঝ : শরিয়তের দণ্ড-সাজাগুলো পাপ করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি। শরিয়তে পাপ ব্যতীত কোন শাস্তি নেই। তাই ওয়াজি বা জায়েয কাজ ছেড়ে দিলে কোন শাস্তি নেই। আর ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া হারাম কাজ করার শামিল। কিন্তু তাতে কোন শাস্তি নেই। হ্যাঁ, যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাতে হত্যা রয়েছে। মুরতাদ হলে হত্যা ও স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস এ দু'টি দণ্ড-সাজার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ দণ্ড-সাজা আল্লাহর হক যা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কোন ক্রমেই বাদ পড়বে না যদিও কর্তা তওবা করুক না কেন। আর কেসাস ক্ষমা করার মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়; কারণ ইহা মানুষের হক, সে ইচ্ছা করলে বাদ করতে পারে। আর মুরতাদ তথা ধর্ম ত্যাগের হত্যা সে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসলে বাদ পড়ে যায়।

দণ্ড-সাজা প্রতিষ্ঠা করার সূক্ষ্ম বুঝ : দণ্ডবিধি ও সাজাগুলো পাপ থেকে ধমকি ও তিরস্কার এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পরিপূরক ও সংশোধন। তাকে তার পাপ ও অপরাধ থেকে পবিত্র করে। আর অন্যদের ঐ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য হুমকি ও ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টিকারী।

আল্লাহ কর্তৃক শরিয়তের দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ : এটা হলো আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ যা সম্পাদন ও লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন : ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি। তাঁর দণ্ডবিধিগুলো যা তিনি নির্দিষ্ট ও সীমিত করেছেন যেমন : উত্তরাধিকারের নিয়মনীতি। আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে হুমকি ও বিরতকারী নির্দিষ্ট সাজাসমূহ। যেমন : ব্যভিচার ও অপবাদের সাজা এবং অনুরূপ আরো যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মাঝে কম-বেশী করা নাজায়েয।

কেসাস ও হুদূদের মধ্যে পার্থক্য : কেসাসে হক আদায় বা ক্ষমা করার বিষয়টি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে বেঁচে থাকলে সে নিজেই। আর তারা যা চাইবে তার বাস্তবায়নকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। আর হুদূদ তথা দণ্ডবিধির বিষয়টি হলো রাষ্ট্রপতির হাতে। কাজেই বিষয়টা তাঁর নিকটে পৌঁছার পর রহিত করা জায়েয নয়। অনুরূপ কেসাসের অপরাধ মাফ করে তার পরিবর্তে দিয়াত নেওয়া বা ক্ষমা করাও জায়েয আছে। কিন্তু দণ্ডবিধিতে কোন বদলী বা বদলী ছাড়া কোনভাবেই ক্ষমা করা এবং সুপারিশ করা জায়েয নেই।

যার উপরে দণ্ড-সাজা প্রতিষ্ঠা করা যাবে : সাবালক, বিবেকবান, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনকারী, স্মরণকারী, হারাম বিষয়ে অবগত ও মুসলিম ও যিম্মী এমন ইসলামের হুকুম পালনকারী ছাড়া অন্যের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ.

১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন : তিনজনের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে : ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ

ঘুম থেকে না উঠে। নাবালক বাচ্চারা যতক্ষণ সাবালক না হয়। আর পাগল-উম্মাদ যতক্ষণ বিবেকবান না হয়।

(হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং ৯৪০, ইরওয়াউল গালীল দ্রষ্টব্য হাদীস নং ২৯৭ আবু দাউদ হাদীস নং ৪৪০৩)

সাজা বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব করার হুকুম : প্রমাণিত হলে তাড়াতাড়ি করে সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। আর যদি এমন কোন প্রতিবন্ধক পেশ হয় যার মাঝে ইসলামের উপকার নিহিত রয়েছে, তাহলে সাজা প্রদানে বিলম্ব করা জায়েয আছে। যেমন : যুদ্ধ ও রোগ। অথবা অপরাধির সঙ্গে আছে এমন জিনিস যেমন : গর্ভবতী ও দুগ্ধপায়ী বাচ্চা ইত্যাদি।

দণ্ড-সাজা যে প্রতিষ্ঠা করবেন : দণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিবেন মুসলিমদের রাষ্ট্রপতি অথবা তিনি যাকে দায়িত্ব দিবেন তিনি। মানুষের সমাবেশ হয় এমন কোন স্থানে মু'মিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে সাজা দিতে হবে। কোন মসজিদে সাজা দেয়া চলবে না।

মক্কার সীমানার ভেতরে সাজা প্রতিষ্ঠা করার হুকুম : মক্কার হারামে কেসাস ও সাজা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয। সেখানে কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া যাবে না। অতএব, যার ওপর আল্লাহ তা'আলার কোন দণ্ড-সাজা ফরজ হবে। যেমন : চাবুক মারা কিংবা জেলে আবদ্ধ রাখা বা হত্যা করা। মক্কার হারামে বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না কেন তা তার ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সাজার চাবুক মারার পদ্ধতি : চাবুক না নতুন আর না পুরাতন বরং মধ্যম ধরনের চাবুক দ্বারা চাবুক মারতে হবে। চাবুক মারার সময় বস্ত্র খুলে নেওয়া যাবে না। দেহের বিভিন্ন স্থানে মারতে হবে। আর মুখমণ্ডল, মাথা, লজ্জাস্থান ও সামনে মারবে না। নারীদের চাবুক মারার সময় বস্ত্র ভাল করে বেঁধে নিতে হবে।

একাধিক সাজা একত্রে হলে তার হুকুম : যদি আল্লাহর একই ধরণের সাজা একজনের উপর একত্রিত হয় যেমন : একাধিক বার ব্যভিচার বা চুরি করেছে তাহলে শুধুমাত্র একবার শাস্তি দিতে হবে। আর যদি নানা রকমের সাজা হয় যেমন : বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার, চুরি ও মদ পান তাহলে হালকা হতে শুরু করতে হবে। প্রথমে মদ পানের তারপরে ব্যভিচারের এবং শেষে চুরির হাত কাটা।

সাজার চাবুক মারার প্রকার : আল্লাহর দণ্ডবিধির সবচেয়ে শক্ত হলো ব্যভিচারের চাবুক। অত:পর অপবাদের এরপর মদ পানের।

যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট সাজা স্বীকার করবে তার বিধান : যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাজার কথা রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীকার করে আর বর্ণনা না দেয় তাহলে তার দোষ ঢেকে রাখতে হবে এবং সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যাবে না।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ وَلَمْ يَسْاَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىَّ كِتَابَ اللّٰهِ، قَالَ : اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে ছিলাম এমন সময় একজন মানুষ এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল আমি সাজার কাজ করে ফেলেছি। অতএব, আমার প্রতি তা প্রতিষ্ঠা করুন। আনাস (রা) বলেন : রাসূল ﷺ সে বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সালাতের সময় হলে লোকটি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল। নবী করীম ﷺ যখন সালাম শেষ করলেন তখন লোকটি তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল আমি সাজার কাজ করেছি। কাজেই আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের সাজা প্রতিষ্ঠা করুন। নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করনি? লোকটি বলল হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পাপকে অথবা বলেন তোমার সাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(বুখারী হাদীস ৬৮২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস ২৭৬৪)

নিজের ও অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ফজিলত : মুস্তাহাব হলো যে ব্যক্তি পাপ করবে তা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তওবা করা। আর যদি কেউ পাপ করে তা প্রকাশ না করে তাহলে তার পাপ জানার পরে তা গোপন রাখা মুস্তাহাব। কারণ এর দ্বারা উম্মতের মাঝে অশ্লীল কাজ প্রচার ও বিস্তার হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "পাপ করে প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করা হবে। প্রকাশের মধ্যে যেমন :একজন রাত্রের অন্ধকারে কোন পাপ করে। অত:পর সকাল হয় আল্লাহ্ তার পাপকে গোপন রাখা অবস্থায়। কিন্তু সে বলে বেড়ায় : হে অমুক! আমি গতকাল রাত্রে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ তার পালনকর্তা পাপকে গোপন রেখে তাকে রাত্রি যাপন করিয়েছেন। আর সে তার থেকে আল্লাহ্র পর্দাকে উম্মোচন করে সকাল করে।

(বুখারী হাদীস ৬০৬৯ মুসলিম হাদীস ২৯৯০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ،نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কোন মুসিবত দূর করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শেষ বিচার দিবসের মুসিবত দূর করবেন। আর যে কোন ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির ওপর সহজ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ওপর দুনিয়া-আখিরাতে সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা তার দুনিয়া-আখিরাতে গোপন রাখবেন। আল্লাহ্ বান্দার ততক্ষণ সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা ভাইয়ের সাহায্য করে। (মুসলিম হাদীস নং ১৬৯৯)

দণ্ড-সাজার ব্যাপারে সুপারিশের হুকুম : নিকটের ও দূরের এবং ভদ্র ও ইতর সকলের ওপর সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ। যখন কোন সাজার বিষয় রাষ্ট্রপতির

নিকট পৌঁছে যাবে তখন তা রহিত করার জন্য সুপারিশ করা অথবা তা বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করা হারাম। আর রাষ্ট্রপতির জন্য কোন ধরনের সুপারিশ গ্রহণ করাও হারাম। তাঁর নিকটে যখন কোন সাজার বিষয় আসবে তখন তা প্রতিষ্ঠা করা তাঁর প্রতি ফরজ। আর অপরাধীর নিকট থেকে কোন প্রকার ঘুষ নিয়ে তার দণ্ড রহিত করা হারাম।

আর যে ব্যভিচারী বা চোর কিংবা মদ্যপায়ী ইত্যাদির নিকট থেকে কোন প্রকার টাকা-পয়সা নিয়ে আল্লাহর দণ্ডবিধি রহিত করবে সে জঘন্য দু' টি বিপর্যয় একত্র করবে। একটি হলো : দণ্ডবিধি রহিতকরণ আর অপরটি হচ্ছে ঘুষ ভক্ষণ এবং একটি ফরজকে ত্যাগ ও হারাম কাজের প্রদর্শন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّتْهُمُ الْمَرْاَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا : مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, কুরাইশদেরকে মাখযূমী গোত্রের নারীর চুরির বিষয়টি চিন্তিত করে ফেলে। ফলে তারা বলে : কে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলবে। এ ব্যাপারে বিষয়ে ﷺ-এর প্রিয় উসামা বিন যায়েদ (রা) ছাড়া আর কেউ সাহস রাখে না। উসামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন :"তুমি আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি বিষয়ে সুপারিশ করছ?" অত:পর তিনি ﷺ দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেন : "হে মানুষ সকল! তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস হয়েছে তার কারণ; যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার প্রতি তারা সাজা

বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূল ﷺ এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কেটে ফেলত।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৮৮ মুসলিম হাদীস নং ১৬৮৮)

হত্যাকৃত ব্যক্তির জানাজা সালাতের হুকুম : কেসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা কোন সাজা কিংবা শাস্তি দিয়ে হত্যাকৃত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তাহলে তাকে গোসল দিয়ে তার সালাতে জানাযা আদায় করতে হবে। আর মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কাফেরকে গোসল ও তার জানাযার সালাত এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন কোনটাই চলবে না। তার জন্য একটি গর্ত করে সেখানে কাফেরদের ন্যায় পুঁতে দিতে হবে।

দণ্ড-সাজা প্রতিষ্ঠা করা ফরজ : অপরাধসমূহের সমাপ্তি ঘটানো ও সমাজকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর একটিই মাত্র পন্থা তা হলো : অপরাধীদের উপর আল্লাহর শর'য়ী দণ্ড-সাজাগুলোর বাস্তবায়ন। আর অপরাধীদের থেকে আর্থিক জরিমানা গ্রহণ অথবা জেল খানায় আবদ্ধ রাখা কিংবা অনুরূপ মানব রচিত নানারকমের শাস্তি দেয়া নিশ্চয় জুলুম, ধ্বংস ও অনিষ্টতার বৃদ্ধি ছাড়া আর কি?

নিরপরাধ ব্যক্তি : নিরপরাধ ব্যক্তিরা হলো চার জন : মুসলিম, যিম্মী, নিরাপত্তাধারী ও সন্ধিকৃত ব্যক্তি। আর ইসলামের বিধান পালনে যারা বাধ্য তারা হলো দুই প্রকার : মুসলিম ও যিম্মী। যিম্মী ব্যক্তি ইসলামের বিধানগুলো মানতে বাধ্য। কিন্তু তাকে এবাদত করার বিষয়ে বাধ্য করা যাবে না। আর যে বিষয়ে সে হারাম আকিদা রাখে শুধু সে বিষয়ে তার প্রতি দণ্ড-সাজা প্রতিষ্ঠা করা যাবে যেমন জেনা। জেনা প্রতিটি শরিয়তেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি যিম্মী ব্যক্তি তার অনুরূপ নারীর সাথে যিনা করে তাহলে তার প্রতি সাজা প্রতিষ্ঠা করা হবে; কারণ জেনায় দু'টি কারণ রয়েছে : অনুরূপ কাজে দ্বিতীয়বার যেন পতিত না হয় এবং পাপ মোচন। যদি সে মাফযোগ্য না হয় কারণ সে কাফের তাহলে দ্বিতীয় কারণে তার প্রতি সাজা প্রতিষ্ঠা করা হবে আর তা হলো :অনুরূপ কাজে যেন আবার লিপ্ত না হয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَاَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইহুদিরা তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যারা যিনা করেছিল নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসে। তখন রাসূল ﷺ তাদের দুইজনকে রজম করার নির্দেশ করেন। অত:পর তাদেরকে মসজিদের জানাযার সালাত পড়ার স্থানের নিকটে রজম করা হয়।

(বুখারী হাদীস নং ১৩২৯ মুসলিম ১৬৯৯)

২. ব্যভিচারের দণ্ড-শাস্তি

যিনা-ব্যভিচার : নিজ স্ত্রী ব্যতীত বেগানা মহিলাদের সাথে অশ্লীল জাতীয় কাজকে যিনা-ব্যভিচার বলে।

যিনার হুকুম : যিনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। আর মহান আল্লাহর সাথে শিরক ও নিরাপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের কবিরা গুনাহ। এর ঘৃণ্যতা ও নোংরাপনার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা, মুহাররামাতের (যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম) সাথে যিনা এবং অন্যের স্ত্রীর সাথে যিনা সবচেয়ে জঘন্য যেনা।

যিনার ক্ষতি : যিনার ক্ষতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি দুনিয়াতে বংশকুল ও লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণের যে নীতিমালা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। যিনায় সকল ধরনের ক্ষতি কেন্দ্রিভূত হয়। এর দ্বারা বান্দার জন্য যাবতীয় পাপের দরজাগুলো খুলে যায়। এ ছাড়া জন্ম নেয় বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ-বালাই। আর সৃষ্টি করে অভাব ও অনটনের উত্তরাধিকারী। ব্যভিচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। ব্যভিচারীর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠে ফাসাদের চিহ্ন এবং হয়ে পড়ে মানুষ সমাজ থেকে নি:সঙ্গ।

যেনার শাস্তি বড় কঠিন। পৃথিবীতে বিবাহিতকে পাথর নিক্ষেপ করে রজম করার মতো কঠোর সাজা এবং অবিবাহিতকে ১০০ চাবুক ও নির্বাসন। আর তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে পরকালে কঠিন শাস্তি। সকল ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে জাহান্নামের আগুনের চুলায় একত্রিত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর–করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [সূরা নূর : আয়াত-২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ (رض) اَنَّ رَجُلًا مَنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰه فَحَدَّثَهٗ اَنَّهٗ قَدْ زَنٰى فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের একজন মানুষ রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে যিনা করেছে স্বীকার করে নিজের ওপর চারটি সাক্ষ্য দেয়। অত:পর রাসূলে করীম ﷺ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয়। আর সে বিবাহিত ছিল।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৮১৪; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯১)

'মুহসিন' ও 'সাইয়েব' ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সহীহ বিবাহ বন্ধন দ্বারা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় স্বাধীন ও শরিয়তের মুকাল্লাফ তথা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে। আর 'বিক্র' বলা হয় এর বিপরীত কুমারী মহিলাকে–যার সাথে বৈধভাবে সহবাস হয়নি।

যিনা-ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকার উপায় : যৌন চাহিদা পূরণ ও বংশকুল সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শরীয়ত বিবাহ ব্যবস্থাপনা করেছে যা নিরাপদের এক অনুপম নীতিমালা। ইসলাম এ শর'য়ী পথ ব্যতীত অন্য কোন কর্মকাণ্ড নিষেধ করত: পর্দা, চক্ষুকে সংযত করার নির্দেশ করেছে। আর নারীদেরকে তাদের

পায়ের অলংকারাদির ঝঙ্কার ও বেপর্দায় চলতে নিষেধ করেছে। আরো নিষেধ করেছে অবাধ মেলামেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে একাকী মিলতে ও করমর্দন করতে। অনুরূপ নিষেধ করেছে মাহররাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে। এ সমস্ত বিধান শুধুমাত্র যাতে করে নারী-পুরুষ যিনার মতো জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয়।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنّٰى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهٗ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম এর ওপর তার যিনার অংশ লিখা হয়েছে যা সে অবশ্যই পাবে। অতএব, দু' চোখের যিনা হলো তাকানো। দু' কানের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার যিনা হচ্ছে কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের যিনা হলো সে কাজের জন্য চলা। অন্তরের যিনা হলো সে দিকে ঝোঁকা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা করা। এরপর লজ্জাস্থান যিনাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭)

যিনার শাস্তি

১. বিবাহিত নারী-পুরুষ হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক।

২. আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ হলে ১০০ চাবুক এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। যদি দাস-দাসী হয় তাহলে ৫০ চাবুক। আর মহিলা হোক বা পুরুষ হোক তাদের জন্য নির্বাসন নেই।

যদি এমন কোন নারী (যার স্বামী নেই বা দাসী যার মালিক নেই) গর্ভবতী হয় এবং কোন ধরনের সংশয় না থাকে বা জোরপূর্বক না হয় তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি কেউ কোন নারীর সাথে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তার শাস্তি হবে আর নারীর উপর কোন শাস্তি বর্তাবে না; কারণ সে অক্ষম ও অপারগ।

যিনার শাস্তির শর্তাবলী : যেনার শাস্তি প্রয়োগের জন্য তিনটি শর্ত –

১. জীবিত নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাংগের আসল মাথা প্রবেশ করানো।

২. কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ না থাকা। তাই যদি কেউ নিজের স্ত্রী ধারণা করে কারো সাথে সহবাস করে বসে তার ওপর শাস্তি নেই।

৩. সাক্ষী দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হওয়া।

এটি দু'ভাবে হতে পারে

ক. **স্বীকারোক্তির দ্বারা** : জ্ঞানবান ব্যক্তির একবার এবং দুর্বল বিবেক এমন ব্যক্তির জন্য চারবার স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর দু'জন প্রসঙ্গেই সঙ্গমের হাকিকত সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সাজা বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত তার স্বীকারের ওপর স্থির থাকতে হবে।

খ. **সাক্ষী দ্বারা** : চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের এ বিষয়ে সাক্ষী দ্বারা শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

যার ওপর যিনার শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে

১. মুসলিম হোক বা কাফের হোক তার উপর যিনার শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ এ দণ্ড যিনা করার জন্য তাই কাফেরের ওপরেও ফরজ। যেমন ফরজ কেসাসে হত্যা ও চুরিতে হাত কাটা।

২. যদি বিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে প্রত্যেকের নিজ নিজ শাস্তি তথা বিবাহিতের জন্য রজম আর অবিবাহিতের জন্য চাবুক ও নির্বাসন।

৩. যদি স্বাধীন ব্যক্তি দাসীর সাথে কিংবা এর বিপরীত কোন স্বাধীন মহিলা দাসের সাথে যিনা করে তাহলে প্রত্যেকের বিধান অনুযায়ী শাস্তি হবে।

৪. ব্যভিচারীর উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে যদি সে মুকাল্লাফ (শরিয়তের আজ্ঞাবহ) হয় এবং স্বেচ্ছায় ও হারাম জেনে করে। আর বিচারপতির নিকটে স্বীকার করে অথবা সাক্ষী প্রমাণ এবং আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হয়।

* মহিলা হোক বা পুরুষ হোক রজম করার সময় গর্ত খনন করা লাগবে না। কিন্তু মহিলার উপর পোশাক শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে করে উলঙ্গ না হয়ে যায়।

* যে কোন নারী যিনার দ্বারা গর্ভবতী হলে অথবা নিজে স্বীকার করলে তাকে সর্বপ্রথম রজম করবেন রাষ্ট্রপতি। অত:পর সাধারণ জনগণ। আর যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সাক্ষীরাই প্রথমে রজম করবে। অত:পর রাষ্ট্রপতি ও এরপর জনগণ।

যে অজ্ঞতায় শাস্তি বাস্তবায়ন করা নিষেধ : এ বিষয়ে অজ্ঞতার অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু কাজটি হারাম কি না সে বিষয়ে অজ্ঞতা কৈফিয়ত যোগ্য। অতএব, যার যিনা হারাম এ জ্ঞান আছে কিন্তু তার শাস্তি রজম বা চাবুক জানে না তার এ অজ্ঞতার অজুহাত চলবে না। বরং তার ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে।

যিনার পরে স্বামী-স্ত্রীর বিধান : কোন বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। অনুরূপ কোন বিবাহিতা মহিলা যিনা করলে তার স্বামী তার জন্য হারাম হবে না। কিন্তু তারা দু'জনেই জঘন্য গুনাহের কাজ সম্পাদন করেছে তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا.

তোমরা যিনার নিকটেও যেও না; কারণ এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ।

[সূরা–১৭ বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ : وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ কোনটি?

তিনি ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সাহাবী বলেন : আমি তাঁকে বললাম : নিশ্চয় এটি কঠিন বিষয়। আবার বললাম : এরপর কোনটি? তিনি ﷺ বললেন : তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। সাহাবী বললেন : এরপর কোনটি? তিনি ﷺ বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। (বুখারী, হাদীস নং ৬৮১১; মুসলিম, হাদীস নং ৮৬)

যে মুহাররামাত মহিলার সাথে যিনা করবে তার হুকুম : যে ব্যক্তি কোন মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) যেমন : আপন বোন, কন্যা ও বাবার স্ত্রী ইত্যাদি-এর সাথে হারাম জানা সত্ত্বেও যিনা করবে তাকে হত্যা করা ফরজ।

عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ أَصَبْتُ عَمِّىْ وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ، فَأَمَرَنِىْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ.

বারা ইবনে আজেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার চাচাকে ঝাণ্ডা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম : কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন : আমাকে রাসূলে করীম ﷺ প্রেরণ করেছেন ঐ মানুষের নিকট যে তার বাবার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি ﷺ আমাকে নির্দেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে।

(হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং ১৩৬২; নাসাঈ হাদীস নং ৩৩৩২)

সমকামিতা : পুরুষে পুরুষে যিনা করা অর্থাৎ মলদ্বারে অশ্লীল কাজ করা এবং মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা।

সমকামিতার কদর্যতা : এটি চরিত্র ও স্বভাব ধ্বংসী এক জঘন্যতম মস্তবড় অপরাধ। এর শাস্তি যিনার শাস্তির চেয়েও কঠিন; কারণ নিষিদ্ধতা বড় কঠোর। এটি মারাত্মক এক ব্যতিক্রমধর্মী যৌনচর্চা যার ফলে জটিল মানসিক ও দৈহিক রোগের জন্ম নেয়। লূত (আ)-এর জাতি এ অপকর্ম করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া শেষ বিচার দিবসে রয়েছে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আগুন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

এবং আমি লূতকে পাঠিয়েছি। যখন সে নিজ জাতিকে বলল : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে গোটা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত : পুরুষের নিকট গমন কর মহিলাদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। [সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত-৮০-৮৪]

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ - مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ.

অবশেষে যখন আমার আদেশ পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপুড় করে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর–পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে অনেক দূরেও নয়। (সূরা–১১ হূদ : আয়াত-৮২-৮৩)

সমকামিতার হুকুম : সমকামিতা হারাম। তার শাস্তি হলো বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক কর্তা ও কর্ম দু' জনকেই হত্যা করা। রাষ্ট্রপতি যেটা উপযুক্ত মনে করবেন তরবারি দ্বারা হত্যা অথবা পাথর নিক্ষেপ করে রজম বা এর অনুরূপ অন্য কিছু। কারণ রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন–

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ.

তোমরা লূতের জাতির কর্ম অবস্থায় যাকে পাবে তার কর্তা ও কর্ম উভয়কে হত্যা করবে। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৬২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪৫৬)

নারীদের সমকামিতা : এক নারী অপর নারীর গুপ্তাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত ঘটানোকে আরবীতে "সিহাক" বলে। এটি হারাম এবং এর জন্যে রয়েছে শাস্তি।

হস্তমৈথুন করার হুকুম : হস্তমৈথুন বা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর রোযা রাখা এর বিকল্প ব্যবস্থা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

১. আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। তবে স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যতিরেকে এ বিষয়ে তারা তিরস্কৃত হবে না। কাজেই যারা এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী। [সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৫-৭]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটি চোখকে হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যারা বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না তাদের জন্য রোযা; কারণ রোযা তাদের যৌন চাহিদাকে সংযত করে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৬ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০০)

কেউ কোন পশুর সাথে যিনা করলে রাষ্ট্রপতি বা বিচারক তার জন্য উপযুক্ত যে কোন শাস্তি দিবেন এবং পশুটিকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

৩. অপবাদের শাস্তি

অপবাদ হলো : কোন সৎ পুরুষ বা কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে যিনা বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া। অথবা কারো বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা। এ জাতীয় অপবাদ শাস্তি যোগ্য অন্যায়।

অপবাদের শাস্তি নির্ধারণের রহস্য : ইসলাম ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং যার দ্বারা কলঙ্কিত ও ধ্বংস হয়, তা থেকে নিষেধ করেছে। নেক ও সৎজনদের ইজ্জত-আব্রুকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিয়েছে। আর অন্যায়ভাবে তাদের সম্মান নষ্ট করা হারাম করে দিয়েছে। এটি একমাত্র ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত হতে হেফাজত করার জন্য।

এমন কতিপয় মানুষ আছে যারা আল্লাহ যা হারাম করে দিয়েছেন যেমন : অপবাদ দেয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হয়। আর বিভিন্ন কুমতলবে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। যখন নিয়তের বিষয়টি অপ্রকাশ্য তখন অপবাদদাতাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই যদি উপস্থিত করতে না পারে তবে তার উপর ৮০ চাবুক শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

অপবাদের বিধান : অপবাদ দেয়া হারাম। এটি কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা অপবাদ দাতার উপর ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি ফরজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

আর যারা সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাদেরকে ৮০ বেত্রাঘাত কর এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক তথা নাফরমান।

[সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।
[সূরা–২৪ নূর : আয়াত-২৩]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ؛ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মুক্ত থাক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন : "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, যাদু' করা, কোন হক ব্যতীতই আল্লাহ যাদের হত্যা করা হারাম করেছেন তাদের হত্যা করা, ঘুষ গ্রহণ করা, এতিমের সম্পদ খাওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার মহিলাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ৮৯)

অপবাদের শাস্তি : স্বাধীন নারী-পুরুষ হলে ৮০ বেত্রাঘাত। আর দাস-দাসী হলে ৪০ বেত্রাঘাত মারতে হবে।

অপবাদের শব্দাবলী

১. **সুস্পষ্ট অপবাদ :** যেমন বলা : হে যিনাকারী! হে সমকামী! হে লম্পট! ইত্যাদি।

২. **ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে অপবাদ :** এমন শব্দ প্রয়োগ করা যা অপবাদ ও অন্য কিছুও বহন করে। যেমন : হে নিকৃষ্ট! হে ফাজের! ইত্যাদি। যদি এ

দ্বারা যিনার অপবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে অপবাদের শাস্তি দিতে হবে। আর যদি যিনার অপবাদের উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সাধারণ শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

অপবাদের শাস্তি ফরজ হওয়ার জন্য শর্তাবলী

১. অপবাদদাতা যেন মুকাল্লাফ তথা শরিয়তের আজ্ঞাবহ লোক হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে এবং অপবাদীর বাবা-মা যেন না হয়।

২. অপবাদী যেন মুসলিম, স্বাধীন, সচ্চরিত্র ও সহবাস করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি হয়।

৩. অপবাদী যেন অপবাদ দাতার উপর শাস্তি দাবি করে।

৪. যেন শাস্তি ফরজ এমন যিনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সাব্যস্ত না হয় এমন।

অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হওয়া : অপবাদী নিজে স্বীকার করলে অথবা অপবাদের পক্ষে দু' জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী দিলে অপবাদ প্রমাণিত হবে।

অপবাদ আরোপের শাস্তি : অপবাদক ও যার নামে অপবাদ দেয়া হয় তাদের ব্যক্তি বিশেষে শাস্তি কম বেশি হবে।

অপবাদ আরোপকারী দুই শ্রেণীর : প্রথমত, যদি অপবাদকারী স্বাধীন অথবা দাস হয় আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে মুহসিন হয়, তাহলে তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।

দ্বিতীয়ত : যদি মুহসিন না এমন ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তার প্রতি কোন শাস্তি নেই। কিন্তু এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে হবে।

"মুহসিন" বলতে এখানে মুসলিম, স্বাধীন, শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, পূতপবিত্র ও দ্বীনদার ব্যক্তি, যার অনুরূপ মানুষ সহবাস করতে সক্ষম।

অপবাদের শাস্তি যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার হক। এ জন্য নিম্নের কার্যাদি আরোপ হবে : ক্ষমা করলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে না চাইলে শাস্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না। আর দাসের প্রতিও পুরা ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

অপবাদের শাস্তি রহিত হওয়া : অপবাদী যিনার কথা স্বীকার করলে অথবা যিনা প্রমাণিত হলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ দেয়ার পর লি'আন করলে শাস্তি বাদ পড়ে যাবে।

অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হলে যা করতে হবে : অপবাদের শাস্তি প্রমাণিত হলে অপবাদ আরোপকারীর ওপর শাস্তি বাস্তবায়ন হবে। আর তওবা ব্যতীত তার কোন ধরনের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে না এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ফাসেক বলে ভূষিত করতে হবে।

যিনা ও সমকামিতা না এমন দ্বারা কাউকে অপবাদ দিলে তার হুকুম : যদি যিনা বা সমকামিতা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে অপবাদ দেয় আর সে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে একটি হারাম কাজ সম্পাদন করল। তবে অপবাদের শাস্তি হবে না, কিন্তু বিচারক যা উপযুক্ত মনে করেন তা শাস্তি দেবেন। যিনা ব্যতীত অন্য কিছুর অপবাদ যেমন : কুফুরি বা মুনাফিকি, অথবা মদপান কিংবা চুরি বা খিয়ানত ইত্যাদির অপবাদ দেয়া।

অপবাদ আরোপকারীর তওবার নিয়ম : অপবাদদাতার তওবা ইস্তিগফার তথা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও লজ্জিত হওয়া এবং এ দৃঢ় ইচ্ছা করা যে আর কোন দিন এ কাজ করবে না। আর নিজেকে অপবাদের বিষয়ে মিথ্যুক বলে বিবেচিত করা।

৪. চুরির সাজা

চুরি: অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্মানজনক জিনিস কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই বিশেষ স্থান থেকে গোপনে নেওয়াকে চুরি বলে।

চুরি করার হুকুম

১. চুরি করা হারাম এবং কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

২. ইসলাম সম্পদের সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ করেছে এবং তার ওপর সকল ধরনের আক্রমণ করা হারাম করেছে। তাই চুরি, ছিনতাই, লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করা হতে নিষেধ করেছে। কারণ এসব মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ।

চুরির সাজা নির্ধারণের রহস্য : আল্লাহ তা'আলা চোরের হাত কাটা ফরজ করে সম্পদের সংরক্ষণ করেছেন। কারণ খেয়ানতকারীর হাত একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ যা কর্তন করা ফরজ যেন দেহ নিরাপদে থাকে। আর চোরের হাত কাটাতে রয়েছে যারা মানুষের সম্পদ চুরি করার চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্যে উপদেশ। আরো রয়েছে চোরের পাপ থেকে তাকে পবিত্রকরণ। এ ছাড়া সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তির নীতিসমূহ সুদৃঢ় ও স্থিরকরণ এবং উম্মতের সম্পদের সংরক্ষণ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: যিনাকারী যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। মদ পানকারী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারীর দিকে মানুষ দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে আর সে ছিনতাই করতে থাকে এ সময় সে মুমিন থাকে না।

(বুখারী হাদীস নং ২৪৭৫ মুসলিম হাদীস নং ৫৭)

চোরের সাজা

১. কুরআনের বাণী–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

পুরুষ চোর ও মহিলা চোর তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা–৫ মায়েদা: ৩৮-৩৯]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَيُقْطَعُ يَدُهٗ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: যে চোর ডিম বা দড়ি চুরি করে ফলে তার হাত কাটা হয় তার ওপর আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ করেন।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ১৬৮৭)

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে চোরের হাত কাটা ফরজ

১. চোর যেন মুকাল্লাফ তথা সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় চুরি, মুসলিম বা যিম্মী হওয়া।

২. চুরিকৃত সম্পদ যেন সম্মানজনক হয়। অতএব, বাদ্যযন্ত্র বা মদ ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

৩. চুরির মাল যেন হাত কর্তনের নেসাব পরিমাণ হয়। আর তা হলো এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ ও এর অধিক। অথবা পণ্যসামগ্রী যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ ও এর অধিক।

৪. গোপনভাবে সম্পদ নেওয়া হতে হবে। যদি এমন না হয় তাহলে হাত কাটা যাবে না। যেমন: পকেটমার, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি এগুলোতে শাস্তি রয়েছে।

৫. মালিকের সংরক্ষিত স্থান হাতে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়া। আর সংরক্ষিত স্থান বলতে যেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ স্থান আদত ও প্রথা অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। আর সংরক্ষণ প্রতিটি মালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অতএব, ঘর-বাড়ি, ব্যাংক, দোকান সম্পদ হেফাজতের স্থান যেমন: পশুশালা ছাগল-ভেড়ার ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণের স্থান।

৬. চোরের কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয় যেন না থাকে। অতএব, বাপ- দাদা ও মা-দাদী ও নানী ইত্যাদি উপরের বা ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিচের যে কারো মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এভাকে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কারো সম্পদ চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ কেউ ক্ষুধার কারণে চুরি করলেও হাত কাটা হবে না।

৭. চুরিকৃত মালের মালিকের পক্ষ থেকে তার আবেদন থাকতে হবে।

৮. চুরির প্রমাণ হওয়া, এর দুই অবস্থায় হতে পারে

ক. চোরের পক্ষ থেকে দু'বার স্বীকারোক্তি।

খ. দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পক্ষ থেকে তার প্রসঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান।

চুরি সাব্যস্ত হলে যা করতে হবে

১. চোরের ওপর দু'টি হক। একটি বিশেষ হক আর তা হলো: চুরিকৃত মাল যদি পাওয়া যায় অথবা অনুরূপ কিংবা তার মূল্য যদি নষ্ট হয়ে যায়। আর

তার ওপর অপর হকটি হলো: সাধারণ যা আল্লাহর হক। আর সেটি হচ্ছে তার হাত কর্তন যদি সকল শর্তাবলী পাওয়া যায় অথবা সাধারণ শাস্তি যদি সকল শর্তাবলী না পূর্ণ হয়।

২. যদি হাত কাটা ফরজ হয় তাহলে তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। আর গরম তেলে ডুবিয়ে বা যা দ্বারা রক্ত বন্ধ হয় এমন জিনিস দিয়ে রক্ত ঝরা বন্ধ করতে হবে। আর তার ওপর আরো করণীয় হলো: চুরিকৃত মাল অথবা তার পরিবর্তে মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর বিচারপতির নিকট বিচার পৌঁছার পরে চুরির বিষয়ে সুপারিশ করা হারাম।

৩. যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পায়ের পাতার অর্ধেক কেটে দিতে হবে। যদি পুনরায় চুরি করে তাহলে জেলে বন্দী করে রাখতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত শাস্তি দিতে হবে কিন্তু আর কাটা যাবে না।

* পকেটমারের হাত কাটতে হবে; কারণ সে পকেট ইত্যাদি কেটে গোপনে সম্পদ হরণ করে। যদি চুরিকৃত মাল হাত কাটার নেসাব পরিমাণ হয় কারণ সে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে।

চুরির নেসাব-পরিমাণ

এক দিনারের চার ভাগের একভাগ ও এর অতিরিক্ত অথবা তা বরাবর পণ্য সামগ্রী। (এক দিনার প্রায় সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী করীম ﷺ বলেছেন: এক চতুর্থাংশ ও এর অতিরিক্ত দিনারে হাত কাটা যাবে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৮৯, মুসলিম হাদীস নং ১৬৮৪)

সন্দেহ থাকলে সাজা রহিত করার হুকুম : যদি চোর চুরির স্বীকার করে আর তার সঙ্গে তা না পাওয়া যায় তাহলে বিচারক সাহেব তার স্বীকারোক্তি থেকে তাকে ফিরে আসার জন্য উপদেশ দিবেন। যদি অনড় থাকে এবং তার স্বীকারোক্তি হতে না ফিরে তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে। আর যদি চোর নিজে স্বীকার করার পর অস্বীকার করে তাহলে হাত কাটা যাবে না। কারণ সাজাসমূহ সংশয় ও সন্দেহের কারণে ফিরাতে হয়।

বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে তার হুকুম : যে ব্যক্তি বায়তুল মাল তথা রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে চুরি করে তাকে শাস্তি এবং অনুরূপ অর্থদণ্ড করতে হবে হাত কাটা চলবে না। অনুরূপ কেউ যদি গনিমত বা এক পঞ্চমাংশ হতে চুরি করে।

ধারের জিনিস অস্বীকারকারীর হুকুম : ধারের জিনিস অস্বীকারীর হাত কাটা ফরজ; কারণ ইহাও চুরির মধ্যে শামিল।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মাখযুমী নারী আসবাবপত্র ধার নিয়ে অস্বীকার করত। তাই নবী করীম ﷺ তার হাত কাটার জন্য নির্দেশ করেন। (মুসলিম হাদীস নং ১৬৮৮)

চুরির মালের হুকুম : চোরের তওবা পূর্ণ হওয়ার জন্য চুরিকৃত মাল তার মালিককে জামানত দিতে হবে যদি নষ্ট করে ফেলে। যদি সম্পদশালী হয় তাহলে মালিককে ফেরত দিবে আর যদি অক্ষম হয় তাহলে পরিশোধের জন্য সুযোগ দিতে হবে। আর যদি চুরিকৃত সম্পদ উপস্থিত থাকে তবে তা তার মালিককে ফেরত দিবে। আর ইহা তার তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

পাকড়াও করার আগে যে তওবা করবে তার হুকুম : যার প্রতি চুরি বা যিনা অথবা মদ পনের সাজা ফরজ হবে। যদি বিচারকের নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে সে তওবা করে তাহলে সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে ঢেকে রাখার পর তার জন্য নিজেকে প্রকাশ করা জায়েয নয়। কিন্তু তার করণীয় হলো চুরিকৃত সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

৫. রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই ও জলদস্যুর সাজা

ডাকাত যারা পথে-ঘাটে, মরুভূমিতে ও বাড়ি-ঘরে ও বাস ইত্যাদিতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করে তাদের মাল প্রকাশ্যভাবে জোরপূর্বক নেয়, গোপনে চুরি করে না। তাদেরকে মুহারিব তথা যুদ্ধকারী-বিদ্রোহী বলা হয়।

রাহজানিদের পরিচয় : যে ব্যক্তি তার অস্ত্র প্রকাশ করে এবং রাস্তায় ভয়-ভীতি দেখায়। আর তার রয়েছে নিজের বা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দল ও গোষ্ঠীর

শক্তি। যেমন: হত্যা কাণ্ড ঘটানোর দল, ডাকাত দল যারা ঘর-বাড়ি ও ব্যাংককে ডাকাতি করে। অপহরণকারী দল যারা যুবতীদের সঙ্গে যিনা করার জন্য অপহরণ করে। আর ছোট বাচ্চাদের অপহরণকারী ইত্যাদি দল। এরাই হল রাহাজানী ও দস্যু দল।

বিদ্রোহ করার হুকুম : মরুভূমিতে বা বাড়ি-ঘরে কিংবা যানবাহনে খুন-খারাবি, ইজ্জত ও সম্পদ ইত্যাদি ডাকাতি করার জন্য মানুষের উপর অস্ত্র ধারণকে বিদ্রোহ বলা হয়। এর মধ্যে আসবে যেসব কাজ রাস্তায়, বাড়ি-ঘরে, বাসে, রেল গাড়িতে, জাহাজে ও বিমানে ঘটে থাকে। চাই তা অস্ত্র দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করে হোক বা বিস্ফোরক দ্রব্য পুঁতে রেখে হোক কিংবা ঘরবাড়ি উড়িয়ে দিয়ে হোক অথবা আগুন জ্বালিয়ে বা পণবন্দী করে হোক। ইহা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাই এর সাজা-দণ্ড সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত।

ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা : ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির চার অবস্থা

১. যদি হত্যা করে সম্পদ নেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করে এবং শূলে চড়াতে হবে।

২. আর যদি হত্যা করে এবং মালামাল না নেয় তাহলে হত্যা করতে হবে তবে শূলে চড়াতে হবে না।

৩. আর যদি হত্যা ছাড়াই শুধু মালামাল নেয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা কেটে দিতে হবে।

৪. আর যদি হত্যা না করে এবং কোন মালামাল গ্রহণ না করে বরং পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি তাদের ব্যাপারে এজতেহাদ করে যা তাদের ও অন্যান্যদের এ ধরনের জঘন্য কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য উপযুক্ত তাই করবেন। আর ইহা সকল ধরনের ক্ষতি ও অনাচার এবং বিপর্যয়ের মূলোৎপাটনের জন্য।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ

فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে দুনিয়াবী লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়াল।

[সূরা মায়েদা: আয়াত নং ৩৩-৩৪]

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَاَسْلَمُوْا، فَاجْتَوَوا الْمَدِيْنَةَ، فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا، فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ، فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا.

২. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের কিছু সংখ্যক মানুষ নবী করীম ﷺ-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এদিকে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হলো না ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ছদকার উটের স্থানে যাওয়ার আদেশ করেন এবং সেখানে গিয়ে (চিকিৎসার জন্য) উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। তারা তাই করল এবং সুস্থও হলো। অত:পর তারা মুরতাদ হয়ে পড়ল এবং উটের রাখালদেরকে হত্যা করে উট নিয়ে ভাগতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিছু মানুষকে পাঠালেন। তাদেরকে আনা হলো এবং তাদের হাত ও পা কেটে দেওয়া হলো। আর তাদের চোখকে উপড়ে ফেলা হলো। এরপর তাদের রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করা হলো না ফলে তারা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮০২ ও মুসলিম হাদীস নং ১৬৭১)

ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির শাস্তি করজের শর্তাবলী

১. ডাকাত-ছিনতাইকারীকে সাবালক, বিবেকবান, মুসলিম অথবা যিম্মী হতে হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী হোক। ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা বিধর্মী নাগরিক।

২. যে মাল গ্রহণ করে তা সম্মানজনক সম্পদ হতে হবে।

৩. মাল কম হোক বা বেশি হোক সংরক্ষিত স্থান থেকে নেওয়া হতে হবে।

৪. ডাকাতি বা ছিনতাই করার স্বীকারোক্তি বা দু' জন ন্যায়পারায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান।

৫. কোন ধরনের সংশয় ও সন্দেহ না থাকা যেমন: চুরির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশ থেকে বহিষ্কার করার নিয়ম : ডাকাত ও ছিনতাইকারী ইত্যাদিরা যদি মানুষকে ভয় দেখায় এবং হত্যা না ঘটায় ও কোন সম্পদ না নেয়, তাহলে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। যে স্থানে তারা ডাকাতি-ছিনতাই করবে সেখানে থেকে বহিষ্কার করতে হবে যাতে করে মানুষ তাদের ক্ষতি থেকে দূর হয় এবং তারা আতঙ্কিত হয়। আর কখনো বন্দী রেখেও হতে পারে; কারণ বন্দী দুনিয়ার জেলখানা এবং বন্দী রাখা দেশ থেকে বহিষ্কারের মতই। আর বন্দী রাখা তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার বেশি কার্যকর। যদি দেশ থেকে বহিষ্কার দ্বারা তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয় তাহলে বহিষ্কার করতে হবে। আর যদি বহিষ্কার সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে বন্দী রাখতে হবে, যাতে করে মানুষ থেকে তাদের ক্ষতি দূর হয়।

বিদ্রোহীদের তওবা : ডাকাত, দস্যু, রাহাজানীদের যে গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করবে তার থেকে আল্লাহর যে হক ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। যেমন: বহিষ্কার, কর্তন, শূলী, আবশ্যকীয় হত্যা। আর মানুষের যা হক তার প্রতিশোধ নিতে হবে চাই তা জীবন, চক্ষু ও সম্পদ যাই হোক। কিন্তু যদি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সেটা ভিন্ন কথা। আর যদি তওবার পূর্বে আটক করা হয় তবে তার প্রতি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আত্মরক্ষার পদ্ধতি : যে ব্যক্তি নিজের জীবন বা পরিবার পরিজন কিংবা মানুষ বা পশু সম্পদ রক্ষা করবে সে যেন তার ধারণায় যা সহজ তা দ্বারা প্রতিহত করে। অত:পর যদি হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিরত না হয় তাহলে সে তাই করবে,

তাতে তার প্রতি কোন জামানত বর্তাবে না। যদি প্রতিরক্ষাকারীকে হত্যা করা হয় তাহলে সে শহীদ হয়ে যাবে।

জিন্দীকের হুকুম : জিন্দীক: যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভেতরে কুফুরিকে গোপন রাখে তাকে জিন্দীক বলে। জিন্দীক আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াইকারী। আর জিন্দীকের জবান দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হাত ও অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ডাকাতি-রাহাজানীর চেয়েও কঠিন; কারণ এর সমস্যা সম্পদ ও দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জিন্দীকের সমস্যা অন্তর ও ঈমানের ভেতরের সাথে সম্পর্ক। অতএব, তাকে আটক করার পূর্বে যদি সে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার রক্তকে সংরক্ষণ করা হবে। আর যদি আটক করার পর তওবা করে তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে না এবং তওবা তলব করা ছাড়াই তাকে হত্যা করতে হবে।

৬. বিদ্রোহীদের দণ্ড-সাজা

"বুগাত" আরবি শব্দ এর একবচন "বাগী" যার অর্থ: এমন এক গোষ্ঠী যাদের নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। যারা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে তাদের মতে জায়েয কোন কারণ মনে করে বিদ্রোহ করে। তবে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিদ্রোহের শামিল নয়। তারা চায় তাঁকে বিচ্যুত করতে অথবা তার বিরোধিতা ও আনুগত্য না করতে।

বিদ্রোহীদের পরিচয় : প্রতিটি গোষ্ঠী যারা তাদের প্রতি অর্পিত হক প্রদানে বাধা দেয় অথবা মুসলমানদের ইমাম থেকে আলাদা হয়ে পড়ে কিংবা তার আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি হয় তারাই হলো বিদ্রোহী জালেম দল। বিদ্রোহীরা মুসলমান কাফের নয়।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি

১. বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন এবং তারা তাঁর কি শাস্তি চায় তা জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কোন জুলুমের কথা উল্লেখ করে তাহলে তিনি তা দূর করবেন। আর যদি কোন সংশয় দাবী করে তাহলে তা প্রকাশ করে দিবে। যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ভাল নচেত তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত এবং হত্যার ভয় দেখাবেন। তার পরেও যদি অটল থাকে তবে তাদের সঙ্গে লড়াই করবেন। এমন

অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে যতক্ষণ তাদের অনিষ্ট দূর না হয় এবং ফেৎনা নির্মূল না হয়।

২. যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সঙ্গে লড়াই করবেন তখন যেন এমন কোন ভারী অস্ত্র যেমন:ধ্বংসাত্মক বোমা ব্যবহার না করেন বরং সাধারণভাবে হত্যা চালাবেন না। তাদের সন্তান, পলায়নকারী, আহত ও যারা লড়াই ত্যাগ করেছে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে না। আর তাদের যাকে যুদ্ধবন্দী করা হয়েছে তাদেরকে ফেৎনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখবেন। তাদের মালামাল গনিমত হিসেবে নেয়া যাবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দী করা যাবে না।

৩. যুদ্ধ বন্ধ এবং ফেৎনা নিভে যাওয়ার পর যুদ্ধকালীন তাদের যে সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর তাদের মাঝে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন জামানতও লাগবে না। আর লড়াই চলাকালীন যে সমস্ত সম্পদ ও জীবন খোয়া গেছে তারাও সেগুলোর জামানত দেবে না।

দু'টি দল আপোসে লড়াই করলে যা করা ওয়াজিব : যদি দুটি দল আপোসে স্বজনপ্রীতি বা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য লড়াই করে তাহলে তারা দু'টিই জালেম। আর প্রত্যেকেই অন্যের যা ধ্বংস করেছে তা জামানত প্রদান করবে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

যদি মু'মিনদের দুই দল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। [সূরা হুজুরাত : আয়াত-৯]

عَنْ عَرْفَجَةَ (رضى) يَقُوْلُ مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ.

২. আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা একজন দেশের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে একত্রে জামাতবদ্ধ থাকা অবস্থা যদি কেউ তোমাদের শক্তিকে ভাংতে চায় অথবা তোমাদের জামাতকে বিভক্ত করতে চায় তাহলে তাকে হত্যা কর। (মুসলিম হাদীস নং ১৮৫২)

ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার হুকুম

১. একজন দেশের ইমাম দাঁড় করানো দ্বীনের বিরাট এক ফরজ। তাই তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম যদিও তিনি অন্যায় ও জুলুম করেন। যতক্ষণ তিনি আল্লাহর দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট এমন কোন কুফুরি না করেন ততক্ষণ তাঁকে অমান্য করা যাবে না। চাই তার ইমামাত নির্বাচন মুসলমানদের ইজমা দ্বারা হোক অথবা তাঁর পূর্বের যিনি দেশের ইমাম ছিলেন তার মারফতে নিয়োগ হোক। কিংবা "আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ" তথা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়োগের অধিকারী নেতৃবর্গের এজতেহাদ দ্বারা অথবা তাঁর চাপের মুখে জনগণ তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং ইমাম বলে ডাকা শুরু করেছে এমন। তাঁর ফাসেকির কারণে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না। কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফুরি করে যার দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নিকট সুসাব্যস্থ।

২. দেশের ইমামের বিরোধিতাকারীরা হয় রাহাজানি অথবা বিদ্রোহী কিংবা খারেজী বলে বিবেচিত হবে। আর খারেজীরা পাপিষ্ঠদের কাফের ফতোয়া দেয় এবং মুসলমানদের রক্তপাত ও সম্পদকে হালাল মনে করে। এরাই ফাসেক তাদের সঙ্গে লড়াই করা জায়েয। এরাই তিন প্রকার খারেজী দল যারা দেশের ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। এদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির প্রতি যা ওয়াজিব

১. মুসলিমদের ইমাম পুরুষ হওয়া ওয়াজিব। কোন নারী দেশের ইমাম তথা প্রধান হওয়ার যোগ্য নয়। নবী করীম ﷺ বলেন–

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً.

যে জাতি তাদের কার্যভার কোন নারীর ওপর ন্যস্ত করে তারা কখনো কল্যাণকামী হতে পারে না। (বুখারী হাদীস নং ৪০৭৩)

আর দেশের ইমামের প্রতি ফরজ হলো: ইসলামি রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, দ্বীনের সংরক্ষণ করা, আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করা, সমস্ত দণ্ডবিধিকে প্রতিষ্ঠা করা, বর্ডারগুলো সুরক্ষিত করা, যাকাত-সদকা আদায় করা, ইনসাফের সাথে বিচার করা, দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এবং আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত ও ইসলামের প্রচার-প্রসার করা।

২. দেশের ইমামের প্রতি আরো ফরজ হলো: দেশের জনগণের কল্যাণকামী হওয়া। তাদের প্রতি কোন কিছু কঠিন না করা। আর সর্ব অবস্থায় তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা। নবী ﷺ বলেছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهٖ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

আল্লাহ যে কোন বান্দাকে কোন জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল বানায়। আর সে তার জনগণের সাথে ধোকাবাজি করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দেন। (বুখারী হাদীস নং ৭১৫১, মুসলিম হাদীস নং ১৪২)

আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

হে মু'মিনগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই মঙ্গলজনক এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম। [সূরা নিসা: আয়াত নং ৫৯]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: তিনি ﷺ বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরজ হলো পছন্দ- অপছন্দ সকল বিষয়ে শুনা এবং আনুগত্য করা। কিন্তু কোন নাফরমানি কাজের নির্দেশ পালনীয় নয়। যদি কোন নাফরমানির আদেশ করে তাহলে সে বিষয়ে শুনা ও আনুগত্য করা চলবে না। (বুখারী হাদীস নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাদীস নং ১৮৩৯)

সাজা ফরজ এমন অপরাধকারীর তওবা : যদি তাকে আটক করার পর তওবা করে তাহলে তার শাস্তি রহিত হবে না। কিন্তু যদি আটক করার পূর্বে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা যাবে এবং তার শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে। আর ইহা হলো রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার পাপিষ্ঠ বান্দাদের প্রতি দয়া করে শাস্তি উঠিয়ে নেয়া।

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের আটক করার পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

[সূরা মায়েদা: আয়াত নং ৩৩-৩৪]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

আর যারা পাপ করে। অত:পর তওবা করে এবং ঈমান আনে। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা এরপরেও ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা আ'রাফ: আয়াত নং ১৫৩]

৭. "তা'জীর" সাধারণ শাস্তি প্রদান করা

তা'জীর বলা হয়: যে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সাজা ও কাফফারা নেই সে বিষয়ে পাপিষ্ঠদের ওপর অনির্দিষ্ট কোন শাস্তি প্রদান করা।

পাপের শাস্তিগুলো তিন প্রকার

১. যার নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে যেমন: জেনা, চুরি, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এগুলোর মধ্যে কোন কাফফারা বা তা'জীর নেই।

২. যার কাফফারা রয়েছে কিন্তু শাস্তি নাই যেমন: ইহরাম অবস্থায় ও রমজান মাসের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা এবং ভুল করে হত্যা করা।

৩. যার না আছে নির্দিষ্ট সাজা আর না আছে কোন কাফফারা। এরূপ কাজে রয়েছে শাস্তি প্রদান।

সাধারণ শাস্তি প্রদান বৈধকরণের রহস্য : আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি ও শাস্তি প্রবর্তন করেছেন যার কম-বেশী করা চলবে না। আর এগুলো ঐ সকল অপরাধের উপর যা উম্মতের দ্বীন, জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের সংরক্ষণের বহির্ভূত কাজ। আর ঐগুলোর জন্যই প্রবর্তন করেছেন বাধা ও নিয়ন্ত্রণ কারী দণ্ডবিধি ও সাজা। সেগুলো এমন মূল জিনিস ও উপাদান যা ব্যতীত উম্মতের জীবন যাপন করা অসম্ভব। তাই সেগুলোর সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ। আর এগুলো সাজা ও দণ্ডবিধির জন্য রয়েছে শর্তাবলী ও নীতিমালা। কখনো এর এমন কিছু আছে যা প্রমাণিত না হলে নির্দিষ্ট সাজা হতে বিচারক যা উচিত মনে করেন এমন অনির্দিষ্ট সাজায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় তা'জীর তথা সাধারণ শাস্তিসমূহ। আর সেগুলো হচ্ছে এমন প্রতিটি পাপ যা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন সাজা নির্ধারণ করেন নাই বরং অনির্দিষ্ট রেখে দিয়েছেন।

সাধারণ শাস্তি প্রদানের বিধান : যে সকল পাপের নির্দিষ্ট কোন সাজা ও কাফফারা নেই সেগুলোতে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। চাই তা কোন হারাম করণ হোক বা ওয়াজিব বা ফরজ ত্যাগ করা হোক। যেমন: কোন নারীর দেহ থেকে এমন উপভোগ করা, যার কোন নির্দিষ্ট সাজা নেয়। এমন চুরি করা যার হাত কর্তন নাই এবং এমন অপরাধ যার কোন কেসাস নাই। অনুরূপ মহিলাদের সমকামিতা, যিনা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। অথবা শক্তি-ক্ষমতা থাকার পরেও কোন ওয়াজিব-ফরজ ত্যাগ করা। যেমন: ঋণ পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, লুণ্ঠনকৃত মাল ও জুলুম ইত্যাদি ফিরিয়ে না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এমন পাপ করবে যার নির্দিষ্ট কোন সাজা নেয়। অত:পর সে তওবা করত: লজ্জিত অবস্থায় আসবে তার উপর কোন শাস্তি নাই।

সাধারণ শাস্তির প্রকারভেদ

১. আদব ও প্রশিক্ষণের জন্য শাস্তি প্রদান: যেমন: বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে, স্বামী স্ত্রীকে, মালিক খাদেমকে কোন পাপকর্ম ছাড়াই আদব দেওয়া। এ জাতীয় শাস্তি দশ চাবুকের বেশি দেওয়া যাবে না। কারণ নবী করীম ﷺ এর বাণী–

لاَ تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

আল্লাহর শাস্তিগুলো ছাড়া অন্য কিছুতে দশের বেশি চাবুক-কষাঘাত মার না। (বুখারী হাদীস নং ৬৮৫০ মুসলিম হা নং ১৭০৮)

২. পাপকর্মের প্রতি শাস্তি প্রদান: নির্দিষ্ট শাস্তি নাই এমন পাপ হলে প্রয়োজন ও উপকারার্থে এবং পাপের পরিমাণ হিসেবে ও কম-বেশীর কারণে বিচারকের জন্য বেশী করা জায়েয আছে। কিন্তু যদি এমন পাপ হয় যার শাস্তি শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট রয়েছে সে বিষয়ে অতিরিক্ত বেশি শাস্তি প্রদান করা না জায়েয। যেমন: যিনা ও চুরি ইত্যাদি।

শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি : শাস্তি প্রদান অনেকগুলো শাস্তির সমন্বয়। শুরু হবে ওয়াজ-নসিহত, পরিত্যাগ, ধমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দ্বারা। আর শেষ হবে শক্ত শাস্তি দ্বারা যেমন: জেলে আবদ্ধ ও চাবুক মারা। কখনো আবার সাধারণ কল্যাণের প্রয়োজনে হত্যা দ্বারাও শাস্তি প্রদান হতে পারে। যেমন: গোয়েন্দা, বিদআতী ও মারাত্মক অপরাধীকে হত্যা করা। আবার কখনো প্রচারের মাধ্যমে বা অর্থদণ্ড কিংবা নির্বাসন দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায়।

সাধারণ শাস্তি : সাধারণ শাস্তি প্রদান নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নয়। বিচারক মণ্ডলী অপরাধীর জন্য যেমন উপযুক্ত মনে করবেন শর্ত অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করবেন। যেমন: আল্লাহ্ যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন তার বহির্ভূত না হয় যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। আর এগুলো স্থান, কাল, ব্যক্তি, পাপ এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

নেশাগ্রস্তের শাস্তি : সমস্ত শাস্তি যা শরিয়ত অপরাধের উপর নির্ধারণ করেছে তাতে কোন প্রকার কম-বেশি করা চলবে না। নেশাগ্রস্তের শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সুন্নত দ্বারা এর সবচেয়ে কম সংখ্যা হলো ৪০ বেত্রাঘাত যার চেয়ে কম করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপতির জন্য এর চেয়ে বেশি করা জায়েয আছে যদি তিনি এতে উপকার মনে করেন।

মদ পানকারীর শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্গত নির্দিষ্ট দণ্ড-সাজা নয়; কারণ এর সাজা না কুরআনে আর না হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। আর সাহাবাগণের নিকট কোন মদ পায়ীকে নিয়ে আসা হলে তাঁরা খেজুরের ডাল ও সেন্ডেল-জুতা ইত্যাদি দ্বারা মারতেন। যদি এর কোন দণ্ড- নির্দিষ্ট শাস্তি হতো তাহলে অন্যান্য সাজার মত এর শাস্তি নির্দিষ্ট করা হত।

নবী করীম ﷺ-এর যুগে মদ পায়ীকে প্রায় ৪০ বেত্রাঘাত করা হত। অনুরূপ আবু বকর (রা)-এর খেলাফত আমলেও। আর যখন মদ পায়ী মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন ওমর ফারুক (রা) মদ পায়ীকে ৮০ বেত্রাঘাত করেন। ওমর (রা) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে সবচেয়ে অপবাদের হালকা সাজার সাথে মিলিয়ে করেন। যদি মদ পানের নির্দিষ্ট কোন সাজা থাকত তাহলে ওমর (রা) বা অন্য কেউ তার সীমা অতিক্রম করতে পারতেন না; কারণ দণ্ডবিধি অপরিবর্তনশীল। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গলে যে, মদ পায়ীর শাস্তি তা'জীর (সাধারণ শাস্তি) হাদ্দ (নির্দিষ্ট সাজা) নয়।

মদ হলো : যে কোন পানীয় দ্রব্য যা বিবেককে আচ্ছাদিত ও ঢেকে ফেলে।

যে কোন শরাব যার বেশিটা নেশাগ্রস্ত করে তার অল্পটাও হারাম

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ شَرَابُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মধু দ্বারা বানানো শরাবের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: প্রত্যেক শরাব যা নেশাগ্রস্ত করে তা হারাম। (বুখারী হাদীস নং ৫৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং ২০০১)

মদপান হারাম করার হিকমত : মদ সমস্ত দুষ্কর্মের মূল। সর্বভাবে এর ব্যবহার হারাম। যেমন: পান করা অথবা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা প্রস্তুত করা বা যে কোন কাজ করা যা পান করার দিকে নিয়ে যায়। ইহা পানকারীর বিবেককে ঢেকে ফেলে যার কারণে সে এমন সকল কাজ করে যা তার দেহ, আত্মা, সম্পদ, সন্তান, ইজ্জত-সম্মান, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে। এর দ্বারা রক্তে চাপ বেড়ে যায়। আর এর ফলে তার নিজের ও সন্তানদের মাঝে ঘটে নির্বোধ-হাবলামী ও পাগলামী এবং দেহে অবশ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত আর সৃষ্টি হয় অন্যায় করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ। নেশায় রয়েছে কিছু মজা ও মাতালতা যার ফলে পার্থক্য জ্ঞান লোপ পায়। তাই মদ পানকারী সে কি বলে বুঝে না। আর এ জন্যই ইসলাম এর পান করা হারাম করে দিয়েছে এবং যে কোন ভাবে এর সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য না জায়েয। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ, জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। কাজেই তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না? [সূরা মায়েদা : আয়াত-৯০-৯১]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: যিনাকারী যিনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। আর মদ্যপায়ী মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। লুটেরা লুট করে আর মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকে এমন সময় সে মুমিন থাকে না।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৭২ মুসলিম হাদীস নং ৫৭)

মদ পান প্রমাণিত হবে দুইভাবে

১. মদ পায়ীর স্বীকারোক্তি দ্বারা।

২. দু' জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা।

শরাব পানকারীর শাস্তি

১. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ কথা জানে যে বেশি পান করলে নেশা হয় তাহলে তাকে ৪০ চাবুক মারতে হবে। আর রাষ্ট্রপতি যদি দেখেন যে মানুষ মদ পানে ডুবে পড়েছে তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তির জন্যে ৮০ চাবুক পর্যন্ত মারতে পারেন।

২. যে ব্যক্তি প্রথমবার পান করবে তার মদ পানের চাবুক মারতে হবে। দ্বিতীয়বার যদি পান করে তাহলেও চাবুক মারতে হবে। তৃতীয়বার পান করলে চাবুক মারতে হবে। কিন্তু যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে ইমাম তাকে জেল খানায় আটক রাখবে অথবা জন সাধারণের সংরক্ষণ ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করবে।

৩. যে ব্যক্তি মদ পান করে তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও আখিরাতে জান্নাতী শরাব পান করতে পারবে না। আর শরাব আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না এবং এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি তওবা করে তাহলে

আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আর যে বারবার পান করবে আল্লাহ তাকে শেষ বিচার দিবসে জাহান্নামীদের রস তথা রক্ত-পুঁজ পান করাবেন।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ، اَوْ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ ইয়ামেনের জায়শান থেকে আগমন করে। সে নবী করীম ﷺ কে তাদের দেশে ভুট্টা দ্বারা বানানো 'মিজ্‌র' নামের শারাব পান করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। নবী করীম ﷺ বলেন: ওকি নেশাগ্রস্ত করে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন: প্রতিটি নেশাগ্রস্ত জিনিস হারাম। নিশ্চয়ই যারা শারাব পান করবে আল্লাহ তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি ﷺ বললেন:"জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের রস। (মুসলিম হাদীস নং ২০০২)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে দুনিয়াতে শারাব পান করে তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী হাদীস নং ৫৫৭৫ মুসলিম হাদীস নং ২০০৩)

* রাষ্ট্রপতির জন্য শরাবের পাত্র ভাংচুর করা ও মদ্যপায়ীদের স্থান জ্বালিয়ে দেয়া জায়েয। আর ইহা পান করা থেকে বিরত রাখা এবং তিরস্কারের জন্য হবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন তাই নির্দেশ দিবেন।

মাদকদ্রব্যের হুকুম : মাদকদ্রব্য দেহকে ধ্বংস করে ফেলে এবং গায়ে ও বিবেকে অবশ ও অলসতা সৃষ্টি করে। ইহা এক জটিল ও কঠিন রোগ যা বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতি ও রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর গ্রহণ, পাচারকরণ, প্রচারপ্রসারকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হারাম। আর রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা অথবা চাবুক কিংবা জেলহাজত বা অর্থ জরিমানা যা উপযুক্ত মনে করবেন তা দ্বারা শাস্তি দিবেন। এর দ্বারা ক্ষতি ও বিপর্যয় দূরীভূত হবে এবং জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের সংরক্ষণ হবে।

মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের শাস্তি : মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ব্যাপক ও এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতির জন্য কিছু মান্যবর উলামায়ে কেরাম নিম্নের ফতোয়া দিয়েছেন

১. মাদকদ্রব্যের পাচারকারীর শাস্তি হত্যা; কারণ এর ক্ষতি ও অনিষ্ট অনেক বড়।

২. মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বা প্রস্তুতকরণ অথবা আমদানিকরণ কিংবা কাউকে উপহার দেয়া ইত্যাদি। প্রথমবারের প্রচার-প্রসারকারীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন: জেলে বন্দী করে বা চাবুক মেরে কিংবা অর্থদণ্ড দ্বারা অথবা চাবুক ও অর্থদণ্ড উভয়টা দ্বারা এসব বিচারপতির রায়ের ওপর নির্ভর করবে। আর যদি বারবার করে তাহলে উম্মত থেকে ক্ষতি দূর করার জন্য প্রয়োজনে হত্যাও করা যেতে পারে; কারণ সে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

* **অবসন্নকারী ও উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিতকারী জিনিসের হুকুম:** এসব জিনিস দেহে অলস ও অবসন্ন সৃষ্টি করে। যেমন: ধূমপান তথা বিড়ি-সিগারেট, চুরুট, হুঁকা ইত্যাদি এবং তামাক, গুল, জর্দা ও কাত (এক ধরনের গাছের পাতা যা ইয়ামেনে আবাদ হয়) ইত্যাদি খাওয়া। এগুলোতে নেশা হয় না এবং বিবেকও লোপ পায় না। এসব হারাম; কারণ এতে রয়েছে দৈহিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি।

* ধূমপান ও এ ধরনের জিনিস যারা গ্রহণ করবে বিচারপতি যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয় এমন তিরস্কারমূলক শাস্তি দিবেন।

যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোন নারীকে চুমা দিয়ে লজ্জিত হয়ে উপস্থিত হবে তার কাফ্ফারা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنْ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ اِمْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِىَ هٰذَا؟ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ .

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একজন মানুষ একজন নারীকে চুমা দিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বলল: তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন: আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে। নিশ্চয় নেক আমল পাপরাশিকে দূর করে দেয়। [সূরা হূদ:১১৪] মানুষটি বলল: হে আল্লাহ্র রসূল! ইহা কি শুধুমাত্র আমার জন্য? তিনি ﷺ বললেন: আমার উম্মতের সকলের জন্য। (বুখারী হাদীস নং ৫২৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২৭৬৩)

৮. রিদ্দত তথা ইসলাম ধর্মত্যাগ

মুরতাদ : যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর বা কোন পুরাতন মুসলিমের কাফের হয়ে যাওয়া।

মুরতাদের হুকুম : আসল কাফেরের চেয়ে মুরতাদের কুফুরি চরম কঠিন। মুরতাদ যদি তওবা না করে তাহলে দুনিয়াতে তার হুকুম হলো হত্যা এবং উত্তরাধিকারী হবে না ও কাউকে উত্তরাধিকার বানাবে না। আর যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। আর পরকালে তার হুকুম চিরস্থয়ী জাহান্নামী।

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। [সূরা বাকারা: ২১৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর। (বুখারী হাদীস নং ৩০১৭)

মুরতাদকে হত্যা করার রহস্য : ইসলাম হলো জীবনের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের পরিপূর্ণ নীতিমালা। ইহা স্বভাব ও বিবেক সম্মত। দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ইহা সর্ববৃহৎ নে'আমত। এর দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে সুখ -শান্তি বাস্তবায়িত সম্ভব। আর যে এর মধ্যে প্রবেশ করার পর মুরতাদ হলো সে নিচের স্তরে নেমে গেল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনিত করেছেন তা ছেড়ে দিল। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করল। কাজেই তাকে হত্যা করা ফরজ; কারণ সে এমন সত্যকে অস্বীকার করল যা ব্যতীত দুনিয়া-আখেরাত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ধর্মত্যাগের প্রকারভেদ : ধর্মত্যাগ তিন প্রকার

১. **আকীদাগত ধর্মত্যাগ :** যেমন: আল্লাহর রবূবিয়াত তথা কাজে বা উলূহিয়াত তথা ইবাদতে তাঁর সঙ্গে শরিক আছে বলে আকিদা পোষণ করা। অথবা আল্লাহর রবূবিয়াত বা একত্ববাদ কিংবা তাঁর কোন গুণকে অস্বীকার করা। অথবা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যুক বলে আকিদা রাখা। অথবা নাজিলকৃত আসমানী কিতাবগুলোকে অস্বীকার করা। অথবা পুনরুত্থান বা জান্নাত-জাহান্নাম কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে ঘৃণা করা যদিও আমল করে। অথবা জেনা বা মদপান ইত্যাদি প্রকাশ্য হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা কিংবা সালাত, জাকাত ইত্যাদি দ্বীনের প্রকাশ্য ফরজসমূহকে অস্বীকার করা।

২. **কথার দ্বারা মুরতাদ :** যেমন : আল্লাহকে অথবা তাঁর রাসূলগণকে কিংবা ফেরেশতাগণকে বা নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে গালি দেওয়া। অথবা নবুওয়াতী দাবী করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা। অথবা বলা যে আল্লাহর সন্তান কিংবা স্ত্রী আছে। অথবা প্রকাশ্য হারাম

বস্তুকে অস্বীকার করা। যেমন: যিনা, চুরি, মদপান ইত্যাদি। অথবা দ্বীন কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। যেমন: আল্লাহর ওয়াদা অথবা শাস্তি। অথবা সাহাবাগণ বা কোন একজনকে গালি-গালাজ করা।

৩. **কর্মের দ্বারা মুরদাত :** যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা অথবা গাইরুল্লাহকে সেজদা করা। অথবা সালাত ছেড়ে দেওয়া। অথবা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন না শিখা এবং আমলও না করা। অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের সাহায্য- সহযোগিতা করা।

মুরতাদের সাথে যা করা হবে : যে সাবালক, বিবেকবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করবে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। আর তওবা করার জন্য বলতে হবে হয়তো বা তওবা করবে। যদি তওবা করে তাহলে সে মুসলিম। আর যদি তওবা না করে এবং মুরতাদ অবস্থার উপর স্থির থাকে তাহলে তরবারি দ্বারা কুফুরির জন্য হত্যা করতে হবে শাস্তির জন্য নয়।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) اَنَّ رَجُلًا اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَاَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى، فَقَالَ : مَا لِهٰذَا؟ قَالَ : اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ لَا اَجْلِسُ حَتّٰى اَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ.

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়ে যায়। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল (রা) মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট আসেন যখন তাঁর নিকট ঐ মুরদাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। মু'আয (রা) বললেন: এর কি হয়েছে? আবু মূসা ﷺ বললেন: ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়ে গেছে। মু'আয ﷺ বললেন: যতক্ষণ একে হত্যা না করব ততক্ষণ আমি বসব না। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত। (বুখারী হাদীস নং ৭১৫৭ মুসলিম হাদীস নং ১৮২৪)

* যার মুরতাদী দ্বীনের কোন কিছুকে অস্বীকারের দ্বারা তার তওবা অস্বীকারকৃত বস্তুর স্বীকারোক্তির সাথে শাহাদাতাইন তথা আল্লাহ এক ও মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল এর সাক্ষ্য দিতে হবে।

স্বামী মুরতাদ হলে তার হুকুম : যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার স্ত্রী তার জন্য না জায়েয। আর তওবা করলে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকলে স্ত্রীকে ফেরত

নিতে পারবে। আর যদি ইদ্দত থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না এবং স্ত্রী নিজের মালিক হয়ে যাবে। অত:পর স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং নতুন মোহরানা ও নতুন 'আকদ ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না।

৯. শপথ-কসম-হলফ

"ইয়ামীন" এর বহুবচন হলো "আয়মান" ইয়ামীন বলা হয়: আল্লাহ অথবা তাঁর নামগুলোর কোন নাম বা গুণসমূহের কোন গুণ উল্লেখ করত: শপথকৃত বস্তুর নির্দিষ্টভাবে তাকিদ প্রদান করা। একে হলফ বা কসম করা বলে।

সম্পাদিত শপথ : যে সকল শপথ সম্পাদন হয় এবং ভঙ্গ করলে কাফফারা ফরজ হয় সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ বা তাঁর কোন নাম কিংবা গুণ দ্বারা শপথ করা। যেমন: ওয়াল্লাহ্, ও তাল্লাহ্, (আল্লাহর নামে কসম) ওয়াররহমান, (রহমানের নামে কসম) ওয়া 'আযামাতিল্লাহ্, ওয়া জালালিহ ওয়া 'ইজ্জাতিহ্, (আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদার কসম) ওয়া রহমাতিহ্ (আল্লাহর দয়ার কসম) ইত্যাদি।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করার হুকুম

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ হরা হারাম এবং ছোট শিরক; কারণ শপথ করা মানে যার নামে করা হয় তাকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা। আর তা'যীম-সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য না জায়েয।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শিরক করল।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ৩২৫১, তিরমিযী হাদীস ১৫৩৫)

২. গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা হারাম। যেমন: বলা, নবীর কসম, তোমার জীবনের কসম, আমানতের কসম, কা'বার কসম, বাপ- দাদার কসম ইত্যাদি।

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ.

নবী ﷺ বলেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে হলফ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে হলফ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে হলফ করে অথবা চপু থাকে। (বুখারী হাদীস নং ২৬৭৮)

* শপথ করার পর তা সংরক্ষণ করা এবং তার গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব। কসমের গুরুত্ব অধিক। অতএব, হলফ নিয়ে উদাসিনতা প্রদর্শন এবং তার হুকুম থেকে বাঁচার জন্যে চালাকি-কৌশল করা অবৈধ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাকিদের জন্য কসম করা শরিয়তে জায়েজ আছে।

হলফের প্রকার

১. "আল-ইয়ামীনুল মুন'আক্বিদাহ" অর্থাৎ শক্ত হলফ করা যার কাফফারা রয়েছে যদি হলফ ভঙ্গ করে।

২. "আল-ইয়ামীনুল গুমূস" ইহা হারাম। এর পদ্ধতি হলো: অতীতের কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা হলফ করা। এর দ্বারা অধিকারসমূহকে হজম করে ফেলা হয়। অথবা এর দ্বারা ফাসেকী ও খেয়ানত উদ্দেশ্য করা হয়। ইহা কবিরা পাপসমূহের একটি। এটিকে গুমূস বলা হয়েছে; কারণ গুমূস অর্থ নিমজ্জিত হওয়া আর এ ধরণের হলফকারী নিমজ্জিত হয় পাপে এরপরে হবে জাহান্নামে। এর কোন কাফফারা নেই আর তাড়াতাড়ি করে তা হতে তওবা করা ওয়াজিব।

৩. "আল-ইয়ামীনুল লাগূও" অপ্রয়োজনীয় হলফ যা শপথের উদ্দেশ্যে করা হয় না। ইহা সাধারণত মানুষের জবানে প্রচলিত। যেমন: না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম। অথবা আল্লাহর কসম অবশ্যই তুমি খাবে বা পান করবে ইত্যাদি। অথবা অতীতের কোন বিষয়ে হলফ করা এ ধারণা করে যে উহা সত্য কিন্তু প্রকাশ পেল তার বিপরীত। এ ধরণের শপথ অনুষ্ঠিত হবে না এবং কোন কাফফারাও দেওয়া লাগবে না। আর শপথকারীকে পাকড়াও করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী–

عَنْ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ـ

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না কিন্তু পাকড়াও করবেন ঐ সকল শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ"

[সূরা মায়েদা:৮৯]

* যদি শপথে "ইন্‌শাআল্লাহ" বলে যেমন: আল্লাহর কসম এরূপ করব ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ্ চান) তাহলে যদি না করে শপথভঙ্গকারী হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার কাফফারা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ۔

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি লাত ও উযযার নামে হলফ করে সে যেন বলে: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আর যে তার সঙ্গিকে বলে আস জুয়া খেলি সে যেন সদকা করে।"

(বুখারী হাদীস নং ৪৮৬০, মুসলিম হাদীস নং ১৬৪৭)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضى) اَنَّهٗ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ ثَلَاثًا، عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَا تَعُدْ۔

২. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি লাত ও উজ্জার নামে শপথ করেন। তখন তাকে নবী ﷺ বলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ" তিনবার বল। আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল ও শয়তান হতে পানাহ চাও এবং আর কখনো এ কাজ করবে না।

(হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস ১৬২২ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২০৯৭)

শপথের আহকাম : শপথের পাঁচটি আহকাম রয়েছে–

১. **ওয়াজিব শপথ** : এমন হলফ যা দ্বারা কোন নিস্পাপ ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্তির জন্য করা হয়।

২. **মুস্তাহাব শপথ** : যেমন মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে হলফ করা।

৩. **বৈধ শপথ** : যেমন কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার জন্যে শপথ করা। অথবা কোন ব্যাপারে তাকিদ ইত্যাদির জন্য শপথ করা।

৪. **মাকরূহ শপথ** : যেমন কোন মাকরূহ কাজ করা বা মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ করার জন্য শপথ করা। অনুরূপ বেচাকেনার ব্যাপারে শপথ করা।

৫. হারাম শপথ : যেমন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করে। অথবা পাপ কাজ করার জন্যে শপথ করে কিংবা কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার জন্যে শপথ করে।

শপথ ভঙ্গ করার হুকুম : যদি মঙ্গল ও কল্যাণকর হয় তবে শপথ ভঙ্গ করা সুন্নত। যেমন : যে ব্যক্তি কোন মাকরূহ কাজ করার জন্যে অথবা কোন মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে হলফ করে। এ অবস্থায় শপথ ভঙ্গ করে যা মঙ্গলজনক তা করবে। এর দলিল নবী করীম ﷺ-এর বাণী–

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا، فَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُوَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

যে ব্যক্তি শপথ করে অত:পর অন্যের মাঝে এর চেয়ে অধিক কল্যাণ দেখে সে যেন তাই করে। আর শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করে।

(মুসলিম হাদীস নং ১৬৫০)

* যদি কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কসম করে তাহলে কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। যেমন : যে ব্যক্তি কসম করে যে সে আত্মীয়তা বন্ধন রাখবে না। অথবা কোন হারাম কর্ম করার জন্যে কসম করে। যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে, সে মদপান করবে। এ অবস্থায় শপথ ভঙ্গ করা তার ওপর ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় করা জরুরি।

* শপথ ভঙ্গ করা জায়েয আছে। যেমন : যদি কেউ কোন বৈধ কাজ করার বা ছেড়ে দেওয়ার শপথ করে তাহলে ভঙ্গ করা বৈধ এবং শপথের কাফফারা দিবে।

শপথ ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

১. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন সম্ভবপর ভবিষ্যৎ বিষয়ে কসম সম্পাদন হওয়া। যেমন : যে কসম করে যে, সে অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

২. শপথ যেন স্বেচ্ছায় করে। তাই যদি কেউ চাপে পড়ে শপথ করে তার কসম সম্পাদন হবে না।

৩. ইচ্ছা করে কসমকারী হতে হবে। যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত কসম করে তার কসম অনুষ্ঠিত হবে না। যেমন : যে ব্যক্তির কথার মধ্যে জবানে এসে যায়: না, আল্লাহর কসম, ও হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।

৪. কসমভঙ্গ হতে হবে। তাই যা ত্যাগ করার জন্যে কসম করেছিল তা করা অথবা যা স্বেচ্ছায় ও স্মরণকরত: কসম করেছিল তা না করা।

কসমের কাফফারা : যার প্রতি কাফফারা আবশ্যক তার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এখতিয়ার করা জয়েয

১. দশজন মিসকিনকে খাবার প্রদান। প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য হতে প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা' তথা প্রায় ১ কেজি ২০ গ্রাম করে খাদ্য দিবে। যেমন: গম অথবা খেজুর কিংবা চাউল ইত্যাদি। যদি দশজন মিসকিনকে দ্বিপ্রহ বা রাত্রে একবার পেট ভরে আহার করায় তবুও জায়েয।

২. দশজন মিসকিনকে সালাত আদায় করতে যথেষ্ট এমন বস্ত্র পরানো।

৩. একজন মুমিন দাস বা দাসী আযাদ করা। যদি এগুলোর কোন একটি না পারে তাহলে তিনটি রোজা রাখবে। আর উপরের তিনটির কোন একটি আদায় করতে ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য রোজা রাখা জায়েয নয়।

শপথ ভঙ্গের অগ্রিম কাফফারার হুকুম : শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরেও কাফফারা আদায় করা জায়েয। যদি পূর্বে আদায় করে তাহলে সে কসমকে হালালকারী আর যদি পরে করে তাহলে কাফফারা আদায়কারী।

শপথভঙ্গ করার কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বর্ণনা করে বলেন−

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَاتُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْكِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা শক্ত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকিনকে খাবার দিবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে পোশাক প্রদান করবে

অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথগুলো রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। [সূরা মায়েদা: ৮৯]

* যদি কোন মুসলিম ভাই তার অপর ভাইয়ের ওপর পাপ না এমন শপথ করে তাহলে তার প্রতি শপথকারীর হক হলো তা পূরণ করা।

* যদি শপথ করে কোন কাজ না করার। অত:পর ভুলে বা চাপে পড়ে কিংবা অজ্ঞতাবশত: করে বসে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না এবং তাকে কাফফারাও লাগবে না। আর তার শপথ অবশিষ্ট থাকবে।

* যদি কোন মানুষের প্রতি শপথ করে তাকে সম্মান করার ইচ্ছায়, তাহলে কোন অবস্থাতেই শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি সম্মান করা আবশ্যক করে নেয় এবং না করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

* প্রতিটি আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের ওপর শপথ করল এবং অন্তরালে অন্যটা লুকিয়ে রাখল তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী ধরা হবে শব্দ দ্বারা নয়।

শপথের রহস্য : শপথ তলবকারীর নিয়তের ওপর শপথ নির্ভর করবে। সুতরাং বিচারক সাহেব যদি কোন অভিযোগে অথবা অন্য কোন বিষয়ে শপথ করায় তাহলে বিচারকের নিয়তের ওপর নির্ভর করবে। শপথকারীর নিয়তের ওপর নয়। আর শপথ না করিয়েও যদি শপথ করে তাহলে হলফকারীর নিয়তের ওপর নির্ভর করবে।

* স্ত্রী ছাড়া হালাল কোন জিনিস নিজের প্রতি হারাম করার হুকুম: যদি কেউ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কিছুকে নিজের ওপর হারাম করে নেয় যেমন : কোন খাদ্য বা অন্য কিছু তাহলে তা তার ওপর হারাম হবে না। কিন্তু যদি সে তা করে তাহলে তার প্রতি শপথের কাফফারা আবশ্যক হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ.

হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

[সূরা–৬৬ তাহরীম:১-২]

কোন পাপকর্ম করার শপথকারীর হুকুম : যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কাজ না করার শপথ করে তার জন্য তার প্রতি জিদ করা বৈধ নয়। বরং তার হলফের কাফফারা দিবে এবং কল্যাণকর কাজ করবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেজগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন, জানেন। [সূরা বাকারা:২২৪]

১০. নজর-মান্নত

নজর-মান্নত : কোন শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় নিজের ওপর আল্লাহ্‌র জন্য কিছু করা আবশ্যক করে নেওয়া যা শরিয়তে আবশ্যকীয় না।

নজর-মান্নতের হুকুম : নজর মানা মাকরূহ; কারণ নবী করীম ﷺ এ হতে নিষেধ করেছেন। আর বর্ণনা করেছেন যে, নজর কোন কল্যাণ বয়ে আনে না এবং তাতে কোন উপকারও নেই। নজর মানা না কোন কল্যাণ আনে আর না কোন ভাগ্য পরিবর্তন করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যারা নজর মানে তাদের প্রশংসা করেননি। বরং যারা নজর মেনে পুরা করে তাদের প্রশংসা করেছেন। নজরের পরিণাম প্রশংসনীয় নয়; কারণ কখনো পূর্ণ করতে অক্ষম হলে পাপ তাকে আটক করবে। মানতকারী আল্লাহ্‌র সাথে শর্ত ও বিনিময়ের চুক্তি করে যে, যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাহলে সে যা মানত মেনেছে তা পূরণ করবে।

আর যদি হাসিল না হয় তাহলে করবে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দা ও তাদের আনগুত্য থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا .

তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের ক্ষতি হবে সুদূরপ্রসারী। [সূরা দাহার:৭]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ নজর মান্নত মানতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন: নজর মানা কিছু দূর করতে পারে না। বরং নজর মানার মাধ্যমে বখিলের সম্পদ বের হয়।

(বুখারী হাদীস নং ৬৬০৮ মুসলিম হাদীস নং ১৬৩৯)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নজর-মান্নত মানার হুকুম : নজর এক ধরনের এবাদত। তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে করা যাবে না; কারণ নজর দ্বারা যার জন্য নজর মানা হয় তাঁকে তা'যীম তথা সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করাই উদ্দেশ্য হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নজর মানল। যেমন: কোন কবর বা কবরবাসী অথবা কোন ফেরেশতা, কিংবা কোন নবী বা কোন অলি, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে বড় শিরক করল। আর ইহা বাতিল এবং পূরণ করা হারাম।

যার নজর মানা বিশুদ্ধ হবে : সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে চাই মুসলিম হোক বা কাফের এবং স্বেচ্ছায় না হলে নজর সহীহ হবে না।

নজরের প্রকারভেদ

১. সাধারণ নজর: যেমন কেউ বলে, আমি যদি এমন কাজ করি তাহলে আমার ওপর আল্লাহর জন্য এমনটা আবশ্যক। অত:পর সে তা করেই বসে তাহলে তার প্রতি হলফভঙ্গের যে কাফফারা তা জরুরি হয়ে যাবে।

২. জিদ অথবা রাগের নজর: যে নজরকে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলন্ত রাখে। আর ইহা কোন কাজ হতে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে কিংবা সত্যায়নের উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা প্রমাণের জন্যে। যেমন বলা: যদি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে আমার প্রতি হজ্ব আবশ্যক।

এমতাবস্থায় তার জন্য দু'টি কাজের মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার করতে হবে। যার নজর মেনেছে তা করা অথবা শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করা।

৩. কোন বৈধ কাজ করার জন্য নজর: যেমন: কেউ যদি তার পোশাক পরিধান করবে অথবা বাহনে আরোহণ করবে এমন নজর মানে, তাহলে সে কাজটি করা এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা এর যে কোন একটির এখতিয়ার করতে পারে।

৪. মাকরূহ নজর: যেমন তালাক ইত্যাদি দেওয়ার নজর মানা। এ অবস্থায় তার জন্য সুন্নত হলো শপথের কাফফারা দেওয়া এবং কাজটি সম্পাদন না করা।

৫. গুনাহর কাজের নজর: যেমন কাউকে হত্যা করার নজর মানা। অথবা মদপানের কিংবা যিনা করার বা ঈদের দিনে রোজা রাখার নজর মানা। এ প্রকারের নজর বিশুদ্ধ হবে না এবং পূর্ণ করাও হারাম। কিন্তু তার প্রতি কাফফারা আদায় করা আবশ্যক। কারণ নবী ﷺ বলেছেন–

لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّرَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

কোন পাপের কাজে নজর মানা না জায়েয। আর তার কাফফারা শপথ ভঙ্গের অনুরূপ কাফফারা।

(আবু দাঊদ হাদীস নং ৩২৯০, তিরমিযী হাদীস নং ১৫২৪)

৬. এবাদত করার জন্য নজর: কোন শর্ত ছাড়াই নজর মানা। যেমন: সালাত আদায় করা, রোজা রাখা, হজ্ব উমরা পালন করা, এতেকাফ ইত্যাদির আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশায় নজর মানা। এ জাতীয় নজর পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি শর্ত করে নজর মানে যেমন: যদি আল্লাহ আমার রোগ আরোগ্য দান করেন অথবা আমার মালে লাভ দেন তাহলে আল্লাহর জন্য আমার প্রতি এতো কাটা দান বা এতো দিন রোজা ইত্যাদি আবশ্যক। যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে তার প্রতি নজর পূরণ করা ওয়াজিব। নজর পূরণ করা এবাদত যা আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন যে, তারা তাদের নজর পূরণ করে।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا .

তারা নজর-মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। [সূরা দাহার: আয়াত নং ৭]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ .

এবং যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু নজর মান আল্লাহ তা জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা বাকারা: আয়াত নং ২৭০]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নজর মানে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার নজর মানে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে। (বুখারী হাদীস নং ৬৬৯৬)

* যে ব্যক্তি কোন এবাদত করা নজর মেনে পূর্ণ করার পূর্বেই মুত্যুবরণ করবে তার পক্ষ থেকে তার অলিরা তা পূর্ণ করে দিবে।

নজর পূর্ণ করতে অক্ষম ব্যক্তির হুকুম : আর যে ব্যক্তি কোন আনুগত্যের নজর মানার পর পূর্ণ করতে অক্ষম হলো তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর এমন ব্যক্তির জন্য নজর মানা মকরুহ। কারণ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ নজর মানা থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন–

اِنَّهٗ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ.

নজর মানায় কোন কিছু পরিবর্তন করে না। বরং নজর-মান্নত দ্বারা কৃপণের মাল বের হয়ে যায়। (বুখারী হাদীস নং ৬৬৯৩ মুসলিম হাদীস নং ১৬৩৯)

মানুষের প্রতি কষ্টকর এমন জিনিসের নজর মানার হুকুম : যে সকল কাজ-কর্ম ও এবাদত সম্পাদন করা বান্দার প্রতি কষ্ট হয় এমন বিষয়ে নজর মানা মাকরূহ। অতএব, যে ব্যক্তি এমন নজর মানল যা তার ক্ষমতার বাইরে এবং তাতে রয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট। যেমন: যে ব্যক্তি নজর মানে সমস্ত রাত্রি সালাত প্রতিষ্ঠা করার কিংবা

সারা বছর রোজা রাখার অথবা সমস্ত সম্পদ দান করার বা হজ্ব অথবা উমরা পায়ে হেঁটে করার। এ অবস্থায় তার নজর পূরণ করা তার প্রতি ওয়াজিব নয় বরং তার প্রতি আবশ্যক হলো কাফফারা দেওয়া।

নজর-মান্নত ব্যয়ের খাত : মানতকারীর নিয়ত অনুযায়ী আনুগত্যের নজরের খাত নির্দিষ্ট হবে। তবে পবিত্র শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে হতে হবে। যদি মান্নতকৃত বস্তু যেমন: গোশত বা অন্য কিছু গরিব-মিসকিনের জন্য নিয়ত করে, তাহলে তা হতে তার ভক্ষণ করা জয়েজ নয়। আর যদি নিয়ত করে তার পরিবার-পরিজন অথবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা সঙ্গী-সাথীরা তাহলে তার জন্য তাদেরই একজন হিসেবে খাওয়া জায়েয।

নেকিকে পাপের সাথে সংমিশ্রণ কারীর নজরের হুকুম : যে ব্যক্তি তার মানতে পাপ ও নেকির সংমিশণ্র ঘটাবে তার জন্যে নেকির কাজ করা এবং পাপের কাজ ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী করীম ﷺ একদা বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন। দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়ান। তিনি ﷺ লোকটির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন: এ হলো আবু ইসরাঈল। সে নজর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে। তখন নবী ﷺ বললেন: "তাকে নির্দেশ কর কথা বলার ও ছায়া গ্রহণের জন্যে। আর বল বসতে এবং তার রোজা পূর্ণ করতে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭০৪)

নির্দিষ্ট দিনের রোজা রাখার নজর মানার পর তা কুরবানির ঈদ অথবা রোজার ঈদের দিনে পড়লে তার বিধান : কারো জন্যে দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা জায়েয নেই। তাই যে সে দিনে রোজা রাখার নজর মানবে সে তার নজরের কাফফারা দেবে।

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : أَمَرَ اللّٰهُ بِوَافَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

যিয়াদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইবনে ওমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁকে একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করে বলল: আমি নজর মেনেছি যতদিন বাঁচব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার অথবা বুধবার রোজা রাখব। অত:পর সে দিন কুরবানির ঈদের দিনে পড়েছে। তিনি ﷺ বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে নজর পূরণ করতে নির্দেশ করেছেন এবং আমাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি আবারো পুনরাবৃত্তি করল। তিনি ﷺ একই কথা বললেন এবং তার অতিরিক্ত কিছু করলেন না।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭০৬ মুসলিম হাদীস ১১৩৯)

৫. বিচার-ফয়সালা

কুরআনের বাণী–

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ـ

আর আমি নির্দেশ দেই যে, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন–যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের আংশিক শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।

[সূরা–৫ মায়েদা : আয়াত-৪৯]

১. কাজার অর্থ ও হুকুম

কাজা তথা বিচার-ফয়সালা করা : শরিয়তের বিধান সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করা এবং তা অবধারিতকরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করা।

বিচার-ফয়সালা করা জায়েযকরণের রহস্য : আল্লাহ্ তা'আলা সকল অধিকার সংরক্ষণ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জীবন সম্পদ ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা করার জন্য বিচার-ফয়সালা করাকে জায়েয করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের একজনকে অপরজনের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। যেমন : ক্রয়-বিক্রয়, বিভিন্ন পেশা, বিবাহ-শাদি,

তালাক, ভাড়া, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি জীবনের জরুরি বিষয়াদি। এ সমস্ত জিনিসের জন্য শরিয়ত নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী প্রণয়ন করেছে যা মানুষের মধ্যকার লেনদেনের ফয়সালা করে দেয় এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তা বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু মাঝে-মধ্যে সেই সকল নীতিমালা ও শর্তাবলীর কিছু ব্যতিক্রম হয়। তা ইচ্ছা করে হোক বা অজ্ঞতাবশত হোক যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর আপোসের মধ্যে জন্ম নেয় ঝগড়া-বিরোধ ও দুশমনি- ঘৃণা। আর কখনো অবস্থা এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যার ফলে সম্পদ লুণ্ঠন জীবন নিশ্চিহ্ন ও ঘর-বাড়ীর বিনাশ সাধন। কাজেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মঙ্গলার্থে তাঁর শরিয়ত দ্বারা বিচার ফয়সালা করা বৈধ করেছেন। যার ফলে ঐ সকল ঝগড়া-বিবাদের অপসারণ ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এবং বান্দার মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়ের বিচার হয়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষাণা করেন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۔

আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যগুলোর যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর হেফাজতকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না--। [সূরা মায়েদা : আয়াত-৪৮]

বিচার-ফয়সালা করার বিধান : বিচার করা ফরজে কিফায়াহ। মানুষের জন্য প্রতিটি অঞ্চল বা শহরে প্রয়োজন অনুযায়ী একজন বা একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ফরজ। কারণ তাঁরা ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা, সকল সাজার বাস্তবায়ন, ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচারকরণ, হকসমূহের ফেরত, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ এবং মুসলমানদের মঙ্গলজনক বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজের আনজাম দিবেন। ইনসাফের সাথে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করা ফরজে কেফায়া; কারণ উদ্দেশ্য কাজটি কর্তা নয়। আর যদি উদ্দেশ্য কাজ ও কর্তা উভয়টি হতো তাহলে ফরজে আইন হত। যেমন : সালাত

ও রমজানের সিয়াম ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

হে দাউদ! আমি তোমাকে জগতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। [সূরা –সদ : আয়াত-২৬]

বিচারকের জন্য শর্ত : যে বিচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তা জন্য শর্ত হলো

১. বিচারককে শক্তিশালী ও আমানতদার হতে হবে। অবশ্যই বিচারককে তার জ্ঞানে মজবুত এবং তার কাজ বাস্তবায়নে আমানতদার হতে হবে।

২. মুসলিম হতে হবে; কারণ বিচারককে আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম দ্বারা ফয়সালা করতে হবে।

৩. সাবালক ও বিকেকবান হতে হবে; কারণ নাবালক ও পাগল দায়িত্বের বিষয়ে অপরিপূর্ণ।

৪. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; কারণ ফাসেক ব্যক্তি তার ফাসেকির জন্য জুলুম থেকে নিরাপদ নয়।

৫. শ্রবণকারী হতে হবে; কারণ বধির বাদী বিবাদীর কথা শুনতে পারবে না।

৬. কথা বলতে পারেন এমন হওয়া; যাতে করে বাদী বিবাদীর সাথে কথা বলতে পারেন।

৭. মুজতাহিদ ও আহকাম প্রসঙ্গে জানা এমন হওয়া; কারণ মুকাল্লেদ তথা দলিল ছাড়া অন্যের কথা মান্যকারী ও সাধারণ ব্যক্তি বিচার ফয়সালার জন্য উপযুক্ত নয়।

৮. পুরুষ মানুষ হতে হবে; কারণ মহিলা বিবেক অসম্পূর্ণ ও অতি দ্রুত আবেগী, যার ফলে অধিক পরিমাণে ধোকায় পড়বে।

এ শর্তগুলো সম্ভবপর পরিগণিত হবে এবং দৃষ্টিবানকে অন্ধের ওপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সর্বোত্তমের ভিত্তিতে দায়িত্বভার দেয়া ওয়াজিব।

কাজি বা বিচারক নির্বাচনকরণ : কাজি নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। তাঁর প্রতি ফরজ হলো বিচারক পদের জন্য সবচেয়ে জ্ঞানী, মোত্তাকী, চালাক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন; কারণ কিছু মানুষ সত্যবাদী আর কিছু বাতিলপন্থী এবং যাতে করে হক বিনষ্ট না করেন ও ফাজেরের ধোকায় না পড়েন। আর সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিকে চয়ন করবেন; যাতে করে হারাম না খান এবং কাউকে ভয়ও না পান। এ ছাড়া নির্বাচনে সবচেয়ে তাকওয়াবান ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিবেন; কারণ তাকওয়াতে কার্যাদি সহজ হয় এবং জটিল বিষয়াদি সহজ হয় ও সত্যকে জানা, ভালাবাসা ও তা দ্বারা ফয়সালা করাও সহজ হয়। জ্ঞানে জবরদস্ত ও কাজে আমানতদার এবং সত্যবাদী ফাকীহ ব্যক্তিকে এখতিয়ার করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষাণা করেন–

قَالَتْ إِحْدٰهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ -

বালিকাদ্বয়ের একজন বলল বাবা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে–ই উত্তম হবে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।

[সূরা কসাস : আয়াত-২৬]

২. বিচার করার ফজিলত

যে মানুষের মাঝে ফয়সালা করে তার জন্য অনেক ফজিলত রয়েছে। ইহা করতে সক্ষম এবং নিজের প্রতি জুলুম করা থেকে নিরাপদে থাকবেন তার জন্যে জায়েয। ইহা আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের এক উত্তম উপায়; কারণ এতে রয়েছে মানুষের মাঝে মীমাংসা করা, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ ও জালেমকে প্রতিহত করা, সৎকর্মের নির্দেশ, অসৎকাজের নিষেধ, সাজাসমূহের বাস্তবায়ন ও হকদারের হক পৌছানো। এ ছাড়া নবী-রাসূলগণ (আ)-এর কাজ। এ সকল মহৎ

কাজের জন্যই আল্লাহ তা'আলার এর মধ্যে ভুল হলেও নেকী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর গবেষণা করার পরে যদি বিচারকের ভুল হয় তা রহিত করে দিয়েছেন। আর যদি সঠিক করেন তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হলো গবেষণার আর অপরটি বিশুদ্ধ বিচার করার। আর যদি গবেষণা করার পর ভুল করেন তাহলে একটি নেকী। তা হচ্ছে এজতেহাদের এবং তার কোন পাপ নেই।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ۢ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

তাদের বেশির ভাগ সলা–পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট নেকী দান করব।

[সূরা নিসা : আয়াত-১১৪]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ـ

২. আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :"দু'টি জিনিসে গিবতা (অন্যের ন্যায় কামনা) করা জায়েয। একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন যা থেকে সে সত্যের পথে ব্যয় করে। আর অপরজন যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমত দান করেছেন যা দ্বারা সে বিচার করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী হাদীসঃ নং ৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৮১৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ

عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا ـ

৩. আব্দুলাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'আলার ডান হাতের পার্শ্বের নূরের মিনারার নিকটে থাকবে। আর আল্লাহর দু'টি হাতই ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে এবং যাদের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের সঙ্গে ইনসাফ করে।

(মুসলিম হা: নং ১৮২৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اَلاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفٰى حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, যেদিন আল্লাহ তা'আলার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না আল্লাহ সেদিন সাত ধরনের মানুষকে ছায়াদান করবেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্। ঐ যুবক যার যৌবন কাল লালিত-পালিত হয় আল্লাহর এবাদতে। ঐ মানুষ যার অন্তরটা মসজিদগুলোর সাথে ঝুলে থাকে। আর ঐ দু'জন মানুষ যারা একজন অপরজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে এবং এরই ভিত্তিতে একত্রিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ মানুষ যাকে কোন বড় পদের ও সুন্দরী নারী যখন যিনা করার জন্য ডাকে, তখন সে বলে : নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। ঐ মানুষ যে

দান-খয়রাত করার সময় তা গোপনে করে। এমনকি তার ডান হাত যা ব্যয় করে বাম হাত তার খবর ও রাখে না। ঐ মানুষ যে একাকী নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার দু' চোখ অশ্রুসজল করে।

(বুখারী হাদীস নং ১৪২৩ মুসলিম হাঃ নং ১০৩১)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ، وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ۔

৫. আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যখন বিচারক এজতেহাদ করে বিচার ফয়সালা করে। অত:পর সঠিক করে তার জন্যে দু'টি নেকী। আর যখন এজতেহাদ করে বিচার করে আর ভুল করে তখন তার জন্যে একটি নেকী।

(বুখারী হাদীস নং ৭৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৬)

৩. বিচার করার ভয়াবহতা

১. বিচারের বিষয় হচ্ছে মানুষের মাঝে তাদের খুন, ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ ও সকল হকের বিষয়ে ফয়সালা করা। অতএব, এর ভয়াবহতা বড় কঠিন; কারণ বাদী-বিবাদীর দু'জনের মধ্যে কোন একজনের প্রতি বিচারকের দুর্বলতার সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে সে তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু কিংবা উঁচু পদের মালিক যার উপকার কাম্য অথবা কর্তৃত্বের অধিকারী যার ক্ষমতার ভয় করা হয় ইত্যাদি। যার ফলে বিচারের সময় উপরিউক্ত কারণের প্রভাবান্বিত হয়ে জুলুম করতে পারে।

২. বিচারক শরিয়তের বিধান জানার জন্যে বড় ধরণের চেষ্টা ব্যয়, দলিল খোঁজ পরিশ্রম এবং সঠিকে পৌছার জন্য কষ্ট স্বীকার করবেন। এতে বিচারক তাঁর দেহকে করেন ক্লান্ত ও দুর্বল। আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যতক্ষণ তিনি জুলুম না করেন। আর যখন জুলুম করেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিজের প্রতি ছেড়ে দেন।

বিচারকদের প্রকার ও তাঁদের কাজ-কর্ম

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ -

হে দাউদ! আমি তোমাকে জগতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহী কর। আর খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না; তা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি; কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। [সূরা –সদ : আয়াত-২৬]

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِى النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ -

২. বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি ﷺ বলেছেন, বিচারক তিন ধরনের দু'জন যাবে জাহান্নামে আর একজন জান্নাতে। একজন সত্য জানে অত:পর তা দ্বারা বিচার করে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর একজন না জেনে বিচার করে সে যাবে জাহান্নামে। আর একজন জুলুম করে বিচার করে সেও জাহান্নামী।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৩৫৭৩, ইবনে মাজাহ হা: নং ২৩১৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وُلِىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন, যাকে মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৫৭২, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৩০৮)

বিচারকের পদ খোঁজ করার বিধান : বিচারকের পদ খোঁজ করা উচিৎ নয় এবং তার লোভ করাও ঠিক নয়; কারণ নবী করীম ﷺ বলেন-

يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! কখনো নেতৃত্ব চাইবে না; কারণ যদি চাওয়ার পর দেয়া হয় তবে তোমাকে তার প্রতিই ছেড়ে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।

(বুখারী হাদীস নং ৭১৪৭ মুসলিম হা: নং ১৬৫২)

বেদাতীদেরকে বিচারক নিয়োগ করার হুকুম : মানুষের মাঝে ফয়সালা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাই ইহা কোন বেদাতীকে দেওয়া জায়েয নেই; কারণ তাদের মধ্যে শর্ত অনুপস্থিত।

বেদাতী দুই প্রকার

প্রথম : কুফরি পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ইসলামের শর্ত অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় : ফাসেক পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত অনুপস্থিত। অতএব, না এরা আর না ওরা কোন প্রকারকেই বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া চলবে না যদিও তাদের জাতির হোক না কেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আমাদের দ্বীনে বিদআত আবিষ্কার করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত।

(বুখারী নং ২৬৯৭ মুসলিম হা : নং ১৭১৮)

৪. বিচারকের আদব-আখলাক

* সুন্নত হলো কাজি-বিচারক সাহেব কঠোরতা ছাড়াই শক্ত প্রকৃতির হওয়া; যাতে করে জালেমরা লোভ না করে। আর দুর্বলতা ব্যতীতই নরম হওয়া যাতে করে হকদার ভয় না পায়।

* বিচারককে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত যাতে করে বাদীর কথা শ্রবণ করে রাগ না হন। কারণ এতে করে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত এবং অদৃঢ়তা তাঁকে স্পর্শ করে বসবে।

* ধীরতার অধিকারী হওয়া চাই; যাতে করে তাঁর দ্রুত করা অনুচিতের দিকে না নিয়ে যায়। আর চালাক হওয়াটাও আবশ্যক; যাতে করে কোন বাদী তাঁকে ধোকা না দিতে পারে। তিনি নিজে ও তাঁর সম্পদ সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও দোষমুক্ত হতে হবে। বিচারককে আমানতদার ও তাঁর কাজে একনিষ্ঠ তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই হতে হবে। এর দ্বারা নেকী ও প্রতিদান তালাশ করবেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না। বিচার-ফয়সালার বিধি বিধান সম্পর্কে পূর্ব হতেই অভিজ্ঞ হতে হবে; যাতে করে বিচার করা তার ওপর সহজ হয়।

* বিচারকের আরো উচিত হলো তাঁর মজলিসে ফিকাহবিদ ও জ্ঞানীদেরকে হাজির করানো এবং যা তাঁর জন্য সমস্যা হয় সে বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করা।

* বিচারকের প্রতি ওয়াজিব হলো বাদী ও বিবাদী উভয়কে সর্ব বিষয়াদিতে সমানভাবে সুযোগ দেওয়া। যেমন : প্রবেশ, সামনে বসা, মনোযোগ, কথা শ্রবণ ও আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করা।

* চরম রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা বিচারকের প্রতি হারাম। অনুরূপ পেশাব-পায়খানা ধরে রেখে অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসা কিংবা দুশ্চিন্তা অথবা ক্লান্তি-অস্বস্তি বা অলসতা কিংবা তন্দ্রা নিয়ে বিচার করা হারাম। যদি এ অবস্থায় ফয়সালা করেন আর সঠিকভাবেই করেন তাহলে বাস্তবায়ন করা হবে।

* বিচারকের জন্য সুন্নত হলো একজন মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান ও ইনসাফগার কেরানি গ্রহণ করা। যিনি তাঁর জন্য ঘটনাগুলোর বর্ণনা ও মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করবে।

যা থেকে বিচারক দূরে থাকবেন : বিচারকের ওপর অন্যের ন্যায় ঘুষ নেয়া হারাম। আর কারো কোন ধরনের হাদিয়া গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যার হাদিয়া বিচারক হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করতেন সে ছাড়া। তবে গ্রহণ না করাই উত্তম; কারণ নবী করীম ﷺ এর বাণী–

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ .

কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ-চুরি বলে বিবেচিত। (হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৯৯৯, ইরওয়াউল গালিল হাঃ নং ২৬২২ দ্রষ্টব্য)

বিচারক কি তাঁর জ্ঞানানুযায়ী বিচার করবেন : বিচারক তাঁর জ্ঞানানুযায়ী ফয়সালা করবে না; কারণ ইহা তাকে অপবাদের দিকে ঠেলে দিবে। বরং তিনি যা শ্রবণ করবেন সে অনুযায়ী বিচার করবেন। আর অপবাদের ভয় না থাকলে তার জানা অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারেন। অথবা বিষয়টা তাঁর নিকটে ধারাবাহিক ও খবরটা পারস্পরিকভাবে পৌঁছছে, যার জানার ব্যাপারে তিনি ও অন্যান্যরা শরিক।

মানুষের মাঝে মীমাংসা ও তাদের প্রতি দয়া করার ফজিলত : বিচারকের প্রতি মুস্তাহাব হলো দু' জন ঝগড়া-বিবাদকারীর মাঝে মীমাংসা করা। আর শরিয়তের ফয়সালা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে তাদেরকে মাফ ও ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা।

১. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا .

তাদের বেশির ভাগ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে নির্দেশ করে তা স্বতন্ত্র যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। আমি তাকে অনেক নেকী দান করব। [সূরা নিসা : আয়াত-১১৪]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

মুমিনরা তো একে অপরকে ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। [সূরা হুজুরাত : আয়াত-১০]

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ ـ

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। [সূরা ফাত্‌হ : আয়াত-২৯]

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ ـ

৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না সেও দয়াপ্রাপ্ত হয় না।

(বুখারী হাদীস নং ৭২৭৬ মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯)

বিচারের পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করার হুকুম : বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো ফয়সালার পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করা।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ، وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهٖ مِنْ بَعْضٍ، فَاَقْضِىْ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهٗ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ، فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় বেশী পারদর্শী। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি মীমাংসা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা করে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।

(বুখারী হাদীস নং ৭১৬৯ মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩)

* বিচারক তাঁর নিজের বিষয়ে নিজেই বিধান বাস্তবায়ন করবেন না। আর যাদের সাক্ষী বিচারকের বিষয়ে কবুল করা হয় না তাদের প্রতিও হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। যেমন : নিজ বংশের বাপ-দাদা উপরের যে কেউ বা সন্তান-সন্ততি নিচের যে কেউ। অনুরূপ স্বামী- স্ত্রী একে অপরের প্রতি।

* দুই বা এর অধিক ব্যক্তি যদি তাদের মাঝে মীমাংসার জন্য কোন নেক ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য বিচারক মেনে নেয় তাহলে তাদের মাঝে তার বিচার কার্যকর করা যাবে।

আল্লাহর হুকুম ব্যতীত অন্যান্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ভয়াবহতা

আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার করা বিচারকের ওপর ফরজ। যে কোন অবস্থাতে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা তাদের মাঝে বিচার করা হারাম। কারণ আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব রচিত কোন বিধান দ্বারা বিচার করা কাফেরদের কাজ। ইসলামি শরিয়ত যখন মানব জাতির সকল বিষয়ের সর্বঅবস্থার সংশোধন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন বিচারপতির ওপর ওয়াজিব হলো তাঁর নিকটে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা আসে সেগুলোর অবস্থা যায় হোক না কেন তা পর্যবেক্ষণ করা। আর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করা; কারণ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট এবং আরোগ্যকর।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

এবং যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করে না তারা কাফের।

[সূরা মায়েদা : আয়াত-৪৪]

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ـ

আর আমি নির্দেশ দেই যে, আপনি তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।

[সূরা মায়েদা : আয়াত-৪৯]

কাজি বা বিচারপতি ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য : বিচারকের তিনটি গুণ প্রমাণ করার দিক থেকে একজন সাক্ষী। আর বিধান বর্ণনা করার দিক থেকে একজন মুফতি। আর বিধান বাস্তবায়ন করার দিক থেকে ক্ষমতার অধিকারী। একজন বিচারক ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : বিচারক শার'য়ী বিধান বর্ণনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন কিন্তু মুফতি শুধুমাত্র বিধান বর্ণনা করেন।

৫. বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি

* যখন বিচারকের নিকট বাদী ও বিবাদী দু'জনে হাজির হবে তখন বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন : তোমাদের মাঝে বাদী কে? তাদের কোন একজন শুরু করা পর্যন্ত তিনি নীরব থাকবেন। যে প্রথমে অভিযোগ করবে তাকেই বাদী হিসাব করবেন। অত:পর যদি বিবাদী তা স্বীকার করে নেয় তাহলে তার ওপর ফয়সালা করবেন।

* আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন : যদি তোমার সাক্ষী থাকে তবে উপস্থিত কর। যদি সাক্ষী উপস্থিত করে তাহলে

শুনবেন এবং সে অনুযায়ী বিচার করবেন। আর নিজের জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন না তবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া যেমন পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

* যদি বাদী বলে আমার কোন সাক্ষী নেই, তাহলে বিচারক তাকে জানাবেন যে, এখন বিবাদীর প্রতি শপথ। যদি বাদী বিবাদীকে শপথ করাতে বলে তবে বিচারক তাকে শপথ করাবেন এবং তাকে ছেড়ে দিবেন।

যদি বিবাদী শপথ করা থেকে বিরত থাকে এবং শপথ না করে তাহলে বিচারক তার নিশ্চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করবেন। কারণ নিরবতা বাদীর সত্যতার প্রতি প্রকাশ্য একটি লক্ষণ বা ইঙ্গিত। বিবাদী যখন শপথ করা থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক বাদীকে শপথ করার জন্যে বলবেন। বিশেষ করে যখন বাদীর দিকটা শক্ত প্রমাণিত হবে। কাজেই যদি বাদী শপথ করে তবে তার পক্ষে ফয়সালা করে দিবেন।

* আর যদি অস্বীকারকারী শপথ করে আর বিচারক তাকে ছেড়ে দেন। অত:পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করে তবে সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করবেন। কারণ অস্বীকারকারীর শপথ ঝগড়াকে দূর করতে পারে। কিন্তু কোন হককে দূরিভূত করতে পারে না।

* আর বিচারকের হুকুম খণ্ডন হবে না কিন্তু যদি কুরআন অথবা হাদীস কিংবা অকাট্য ইজমার বিপরীত হয় তবে।

* যতক্ষণ মুসলিমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না পায় ততক্ষণ মুসলমানদের আসল হলো ন্যায়পরায়ণতা। যদি তার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ পায় তাহলে প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে তার ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আবশ্যক; যাতে করে কাজি আল্লাহর হারামকৃত বস্তুতে পতিত না হয়।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ.

হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত : তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। [সূরা হুজুরাত : আয়াত-৬]

৬. দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ

দাবি : অন্যের হাতে আছে এমন কোন জিনিস নিজের হক বলে দাবি করা।

বাদী : হক তলবকারী। আর যদি বাদী নীরব থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে হবে।

বিবাদী : যার নিকটে হক খোঁজ করা হয়। সে চুপ থাকলে ছেড়ে দেয়া হবে না।

মামলার রোকন : মামলার রোকন তিনটি : বাদী, বিবাদী ও দাবিকৃত জিনিস।

প্রমাণ : যার দ্বারা হক বা অধিকার প্রকাশ পায়। চাই তা সাক্ষী হোক বা শপথ হোক কিংবা অবস্থা ইত্যাদির লক্ষণ বা ইঙ্গিত হোক।

প্রমাণের বিবরণ

প্রমাণ : যা কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করে দেয়। চাই তা শরিয়তের প্রমাণ হোক যেমন সাক্ষ্য যা কবুল করা ওয়াজিব অথবা লক্ষণ হোক যা গ্রহণ করা জায়েয। আর সাক্ষীদেরকে প্রমাণ বলা হয়েছে; কারণ তারা যার হক এবং যার প্রতি হক তা প্রমাণ করে।

দাবি-মামলা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী : বিস্তারিত লিখিত ছাড়া মামলা বিশুদ্ধ হবে না; কারণ ফয়সালা তার ওপর নির্ভরশীল। আর যে জিনিসের দাবি করা হবে তা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট হতে হবে। বাদীকে তার অধিকার খোঁজ করে বিবরণ দিতে হবে। আর দাবিকৃত জিনিসটি যদি ঋণ হয় তাহলে তার পরিশোধের সময় হয়েছে এমন হতে হবে।

দাবির নিয়ম : দাবি হলো কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। চাই সে জিনিস কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা উপকার কিংবা অধিকার অথবা ঋণ হোক।

নিজের জন্য সংযুক্তকরণ তিন প্রকার

প্রথম : কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে দাবী বলে যেমন বলা : অমুকের প্রতি আমার এরূপ জিনিস রয়েছে।

দ্বিতীয় : কোন মানুষ অন্যের জন্য নিজের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে স্বীকার করা বলে।

তৃতীয় : কোন মানুষ অন্যের জন্য অন্যের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত করা। একে বলে সাক্ষ্য প্রদান।

সাক্ষ্য-প্রমাণের অবস্থা

১. কখনো প্রমাণ দু'জন সাক্ষী দ্বারা আবার কখনো একজন পুরুষ আর দু' জন মহিলা দ্বারা হয়। কখনো চারজন সাক্ষী আর কোন সময় তিনজন দ্বারা হয়। আবার কখনো একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথ (যার বর্ণনা সামনে আসবে) দ্বারা।

২. সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত এবং বিচারক তা দ্বারাই মীমাংসা করবেন। বিচারক যদি সাক্ষ্য যা দিয়েছে তার বিপরীত কিছু জানতে পারেন তবে সে অনুযায়ী মীমাংসা করা জায়েয নয়। আর যার ইনসাফ অজানা তার বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন। আর যদি বিবাদী সাক্ষীদেরকে অসত্য প্রমাণিত করে তাহলে তাকে সাক্ষ্য আনার দায়িত্ব দিবেন এবং তিন দিনের সময় দিবেন। যদি সে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তবে তার প্রতি ফয়সালা করবেন।

অপবাদের বিষয়ে মানুষ তিন প্রকার

১. মানুষের নিকট তাদের দ্বীন ও পরহেজগারী এবং অপবাদের অন্তর্ভুক্ত না এমন শ্রেণী। এমন ব্যক্তিকে জেলে আটক বা মারধর করা যাবে না বরং অভিযোগকারীকে আদব দিবেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাল-মন্দ অবস্থা অজানা। এমন ব্যক্তিকে যতক্ষণ তার অবস্থা প্রকাশ না পায় ততদিন অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাকে জেলে বন্দী রাখতে হবে।

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যায়-অনাচার দ্বারা পরিচিত। এর মত মানুষ অভিযুক্ত হয়ে থাকে। এ দ্বিতীয় প্রকারের চেয়ে অধিক মারাত্মক। একে যতক্ষণ স্বীকার না করে ততক্ষণ মারধর ও আবদ্ধ করে যাচাই করতে হবে। আর ইহা মানুষের হক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মাত্র।

* যখন বিচারক সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ে জ্ঞাত হবেন তখন তা দ্বারা মীমাংসা করবেন। আর কোন ধরনের সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি ইনসাফগার না এমন জানেন তবে তার দ্বারা ফয়সালা করবেন না। আর যদি সাক্ষীদের অবস্থা অজানা হয় তবে তাদেরকে সত্যায়নকারী ন্যায়পরায়ণ দু' জন সাক্ষী হাজির করতে বলবেন।

বিচারকের বিচারের পদ্ধতি : বিচারকের সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনা হারাম হালাল হবে না আর কোন হালাল হারাম হবে না। যদি সাক্ষীরা সত্যবাদী হয় তবে বাদীর

জন্য তার হক নেওয়া জায়েয হবে। আর যদি সাক্ষীরা মিথ্যুক হয় যেমন : মিথ্যা সাক্ষ্য এবং বিচারক তা দ্বারা মীমাংসা করেন তাহলে বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা না জায়েয।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهُ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় বেশি পারদর্শী। অতএব, আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার ভাইয়ের হক ফয়সালা করে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে দেই।

(বুখারী হাঃ নং ২৬৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৩)

অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর বিচারের নিয়ম : যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর মীমাংসা করা জায়েয। তবে মানুষের হক হতে হবে আল্লাহর হক নয়। চাই অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরত্ব বেশি হোক বা কম হোক যার ফলে সে হাজির হতে পারে নাই। যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয় তাহলে তার দলিল-প্রামাণ অনুযায়ী হবে।

দাবী যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে : বিবাদীর শহরে মামলা দায়ের করা হবে; কারণ আসলে সে দোষমুক্ত। যদি সে ভেগে যায় অথবা টালবাহনা করে কিংবা কোন অযুহাত ছাড়াই হাজিরা দিতে দেরী করে তাহলে তাকে আদব দেয়া আবশ্যক।

সত্যায়ন, দোষারোপ ও বার্তার বিষয়ে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অনুবাদে একজন ন্যায়পরায়ণের কথা গ্রহণ করা যাবে। আর যদি দু' জন সম্ভব হয় তাহলে উত্তম।

এক বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকট পাঠানোর হুকুম

একজন বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকটে মানুষের হকের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য। যেমন : বেচাকেনা, ইজারা, অসিয়ত, বিবাহ, তালাক, অপরাধ, কেসাস ইত্যাদি। আর এক বিচারক অন্য বিচারকের নিকট আল্লাহর দণ্ডবিধি যেমন : যিনা, মদ ইত্যাদি বিষয়ে লিখা উচিৎ নয়; কারণ এগুলো গোপন রাখাই ভাল এবং সন্দেহ হলে ক্ষমা যোগ্য।

দাবিকৃত বস্তুর হুকুম : যদি বাদী ও বিবাদী কোন নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে উভয়ে দাবি করে তাহলে এর ৬ অবস্থা–

১. যদি বস্তুটি কোন একজনের হাতে হয় আর বিবাদীর সাক্ষী না থাকে তবে উহা যার হাতে তা তারই হলফ করলে। আর যদি উভয়েই সাক্ষী পেশ করে তাহলে যার হাতে তারই হবে যদি সে শপথ করে।

২. যদি বস্তুটি উভয়ের হাতে হয় আর কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেয় তাহলে দু'জনকেই শপথ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে ভাগ করে দিতে হবে।

৩. যদি বস্তুটি অন্য কারো হাতে হয় এবং কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে তবে দু'জনের মাঝে লটারি করে যার নাম উঠবে শপথ করিয়ে তাকেই দিতে হবে।

৪. বস্তুটি কারো হাতে না এবং কারো কোন দলিল-প্রমাণও নেই এমন অবস্থায় দু'জনকে শপথ করাতে হবে এবং অর্ধেক করে ভাগ করে দিতে হবে।

৫. প্রত্যেকের প্রমাণ আছে আর বস্তুটি কারো থেকে নেয় এমন অবস্থায় দু' জনের মাঝে সমান ভাবে ভাগ করতে হবে।

৬. যদি কোন পশু বা গাড়ি নিয়ে ঝগড়া হয় আর একজন আরোহণ করত: অপরজন তার লাগাম ধরে আছে। এ অবস্থায় ইহা শপথ করে প্রথম জনের যদি কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে।

মিথ্যা শপথ করার ভয়াবহতা : অন্যায়ভাবে কোন ভাইয়ের সম্পদ মিথ্যা শপথ করে নেওয়া হারাম; কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন–

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের হক শপথ করে গ্রহণ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে দেন। আর তার প্রতি জান্নাতকে হারাম করে দেন। একজন মানুষ বলল : যদি সামান্য জিনিসও হয় হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন : আরাক গাছের একটি ডালও যদি হয় না কেন। (মুসলিম হাঃ নং ১৩৭)

এজমালি জিনিস ভাগ করা হুকুম : একাধিক মালিকানাভুক্ত জিনিস যা ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ভাগ করা অসম্ভব তা ভাগ করা জায়েয নয়। কিন্তু শরিকদের স্বেচ্ছায় হলে জায়েয। আর যার মধ্যে ভাগ করলে ক্ষতি বা বিনিময় নেয় এমন জিনিস হলে যদি অংশীদার তার ভাগ খোঁজ করে তাহলে অন্য জনকে বাধা করতে হবে। অংশীদাররা নিজেরাই ভাগ করবে অথবা নিজেরাই একজন বণ্টনকারী নির্বাচন করবে কিংবা বিচারকের নিকট তার অংশ ও পারিশ্রমিক চাইবে মালিকানা অনুযায়ী। যখন নিজেরা ভাগ করবে বা লটারি করবে তখন ভাগ করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

দাবি প্রমাণ করার পদ্ধতি : তিনটির কোন একটি দ্বারা দাবি প্রমাণিত হয়। স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য প্রদান ও শপথ করা।

১. স্বীকারোক্তি

স্বীকারোক্তি : সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তি তার ওপর যা ওয়াজিব তা স্বেচ্ছায় প্রকাশকরণ।

যার স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ হবে : প্রতিটি সাবালক, বিবেকবান ও বারণকৃত না এমন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় স্বীকার বিশুদ্ধ হবে। আর স্বীকার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

স্বীকারোক্তির হুকুম

১. মানুষের জিম্মাদারীতে আল্লাহর হক যেমন : যাকাত ইত্যাদি বা মানুষের হক যেমন : ঋণ ইত্যাদি থাকলে তার স্বীকারোক্তি করা ওয়াজিব।

২. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর কোন শাস্তি যেমন :জেনা থাকলে তার স্বীকার করা জায়েয। কিন্তু নিজেরে ওপর তা ঢেকে রাখা এবং তওবা করাই অতি উত্তম।

৩. যদি স্বীকারোক্তি সহীহ ও প্রমাণিত হয় আর হকের সম্পর্ক মানুষের সাথে হয় তাহলে ফিরে আসা জায়েয নয় এবং কবুলও করা যাবে না। আর যদি হক আল্লাহর হয় যেমন : যিনা অথবা মদ পান কিংবা চুরি ইত্যাদির শাস্তি তাহলে তা থেকে ফিরে আসা জায়েয আছে; কারণ সংশয় ও সন্দেহের জন্য শাস্তি রহিত হয়।

২. সাক্ষ্য প্রদান

সাক্ষ্য প্রদান : যা জেনেছে তার বিষয়ে 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি' বা 'আমি দেখেছি' বা 'আমি শুনেছি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা খবর দেওয়া। ইহা আল্লাহ তা'আলার হুকুম তথা অধিকারসমূহ সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করার জন্য প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ـ

এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। [সূরা তালাক : আয়াত-২]

সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিবের শর্তাবলী : প্রয়োজন হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে তার দেহে বা ইজ্জত-সম্মানে অথবা সম্পদে কিংবা পরিবার-পরিজনে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকা।

সাক্ষ্যদানের হুকুম

১. যদি মানুষের হক হয় তবে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজে কেফায়া। আর যার ওপর দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি আদায় করা ফরজে 'আইন যদি মানুষের হক হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ

তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। [সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৩]

২. আল্লাহর হকের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যেমন : যিনা ইত্যাদির সাজার সাক্ষ্য দেয়া জায়েয। তবে না দেওয়া উত্তম; কারণ মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ওয়াজিব। কিন্তু যদি প্রকাশকারী এবং ফাসাদে পরিচিত ব্যক্তি হয় তাহলে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম; যাতে করে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জড় সমূলে শেষ হয়ে যায়।

৩. না জেনে সাক্ষ্য দেওয়া না জায়েয যা বৈধ নয়। আর জানা দেখে বা শুনে অথবা প্রচার-প্রসার দ্বারা অর্জিত হয় যেমন : কারো বিবাহ বা মৃত্যু ইত্যাদি।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হুকুম : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবিরা গুনাহ্ এবং চরম পাপ যার দ্বারা মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ হয়। আর অন্যের অধিকার বিনষ্ট এবং বিচারকদেরকে ধোকা দেওয়ার কারণ বিশেষ, যার ফলে তাঁরা আল্লাহ্র বিধান ছাড়া মীমাংসা করেন।

যার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে তার শর্তাবলী

১. সাবালক ও বিবেকবান হতে হবে। অতএব, ছোটদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তাদের মাঝে হলে চলবে।

২. কথা বলতে পারে, তাই বোবাদের সাক্ষ্য চলবে না। কিন্তু যদি লিখে সাক্ষ্য দেয় তবে চলবে।

৩. মুসলিম হতে হবে। তাই কোন মুসলিমের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষী চলবে না। কিন্তু সফর অবস্থায় মুসলিম না পাওয়া গেলে অসিয়াতে কাফেরের সাক্ষ্য চলবে। আর কাফেরদের একজনের অপরজনের বিষয়ে সাক্ষ্য চলবে।

৪. স্মরণ শক্তি পরিপূর্ণ হওয়া। কোন উদাসীনের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।

৫. ন্যায়পরায়ণতা : ইহা প্রতিটি স্থান-কাল অনুযায়ী হয়ে থাকে। এর জন্য দু'টি জিনিস হওয়া আবশ্যক : (ক) দ্বীনের মধ্যে সৎ হওয়া : এর জন্যে প্রয়োজন সকল ফরজ আদায় করা এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকা। (খ) মানবিক গুণাবলী ও চক্ষুলজ্জার ব্যবহার : এ হলো এমন সকল কাজ করা যার দ্বারা সৌন্দর্য বাড়ে যেমন : দানশীলতা, সৎচরিত্র ইত্যাদি এবং যে সকল কাজ কলুষিত করে যেমন : জুয়া খেলা, ভেলকিবাজি ও নিকৃষ্ট জিনিসের দ্বারা প্রসিদ্ধলাভ ইত্যাদি।

৬. অপবাদ মুক্ত হওয়া।

* আল্লাহ্র দণ্ড-শাস্তি ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্য কবুল করা হবে। যদি আসল সাক্ষী অপারগ হয় যেমন : মৃত্যুর কারণে বা অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত তাহলে বিচারক তার পরিবর্তে সাক্ষী কবুল করতে পারেন, যদি আসল সাক্ষী তাকে তার প্রতিনিধি বানায়। যেমন : বলে আমার সাক্ষীর প্রতিবর্তে অমুককে সাক্ষী বানালাম ইত্যাদি।

যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না

যে সকল কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না সেগুলো ৮ টি যথা

১. **জন্মসূত্রের আত্মীয়তা :** তারা হলো বাপ-দাদা যতো উপরের হোক এবং সন্তান-সন্ততিরা যতো নিচের হোক। এদের সাক্ষী একজন অপরজনের জন্য

গ্রহণ করা যাবে না; কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্ত। তবে তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর অবশিষ্ট আত্মীয় যেমন : ভাই, চাচা ইত্যাদি এদের সাক্ষী পক্ষে ও বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য।

২. **স্বামী-স্ত্রী :** স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে এবং স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষী কবুল করা যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তির যার নিজের উপকার বয়ে আনে। যেমন :তার অংশীদার বা দাস-দাসী।

৪. ঐ ব্যক্তির যে তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের ক্ষতি দূর করে।

৫. **পার্থিব শত্রুতা :** যে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি পেলে খুশী হয় বা তার দুশ্চিন্তায় আনন্দ পায় সে তার শত্রু।

৬. যে ব্যক্তি বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর খেয়ানত ইত্যাদি কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৭. **পক্ষপাতিত্ব :** যার স্বজনপ্রীতির বিষয় প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না।

৮. যদি যার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সে সাক্ষীর মালিক হয় বা সাক্ষী তার খাদেম হয়।

যার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার প্রকার ও সাক্ষীর সংখ্যা : ইহা সাত প্রকার–

১. **যিনা ও সমকামিতা :** এর জন্য চার জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

যারা সতী-সাধ্বী মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।

[সূরা নূর : আয়াত-৪]

২. যাকাত প্রদান না করার জন্যে কোন পরিচিত ধনী ব্যক্তি যদি ফকির বলে দাবি করে তাহলে এর পক্ষে তিন জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক।

৩. যা কেসাস ফরজ করে বা যিনা ছাড়া অন্য সাজা কিংবা সাধারণ শাস্তির জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক।

৪. সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন : বেচাকেনা, ধার, ইজারা ইত্যাদি এবং হকুক তথা অধিকারসমূহ। যেমন : বিবাহ, তালাক, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণ ইত্যাদি। আর সাজা ও কেসাস ব্যতিরেকে যত আছে তাতে দু' জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু' জন নারীর সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বিশেষ করে সম্পদের বিষয়ে একজন পুরুষ ও বাদীর হলফনামা গ্রহণযোগ্য যদি সাক্ষী পূর্ণ করতে অক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (সূরা–২ আল বাক্বারা : আয়াত-২৮২)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শপথ ও একজন সাক্ষী দ্বারা মীমাংসা করেছেন। (মুসলিম হাঃ নং ১৭১২)

৫. যে সকল বিষয়ে সাধারণত পুরুষরা জানতে পারে না। যেমন : দুধ পান, সন্তান প্রসব, মাসিক ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষরা উপস্থিত হয় না। এ সকল বিষয়ে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী কিংবা চারজন নারীর সাক্ষী কবুল করা হবে। একজন ন্যায়পরায়ণা নারীর সাক্ষী কবুল করাও জায়েয তবে দু'জন অধিকতর নিরাপদ বা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ। আর পরিপূর্ণ হলো যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. রমজান ও অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখার বিষয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।

৭. পশুর রোগ ও মাথায় আঘাত এবং হাড় ভাংচুরের ইত্যাদি ব্যাপারে একজন ডাক্তার ও একজন পশু চিকিৎসকের (যার বিকল্প না পাওয়ায়) সাক্ষী কবুল করা যাবে। যদি কোন ওজর না থাকে তবে দু' জন হতে হবে।

* বিচারকের জন্য জায়েয আছে শাস্তি ও কেসাস ছাড়া অন্য বিষয়ে একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথ (যদি তার সত্যতা প্রকাশ পায়) দ্বারা মীমাংসা করা।

* যদি একজন সাক্ষী ও শপথ দ্বারা বিচারক মীমাংসা করেন। অত:পর সাক্ষী ফিরে আসে তাহলে সাক্ষীকে সমস্ত সম্পদের জরিমানা দিতে হবে।

সাক্ষী তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসলে তার হুকুম : যদি সম্পদের সাক্ষীরা বিচারের পর ফিরে আসে তাহলে মীমাংসা খণ্ডন হবে না। আর তাদেরকে জামানত দেওয়া আবশ্যক হবে। তবে সাক্ষীদেরকে যারা সত্যায়ন করেছে তাদের প্রতি জামানত আসবে না। আর যদি সাক্ষীরা ফয়সালার পূবেই ফিরে আসে তবে রহিত হয়ে যাবে কোন বিচার হবে না এবং জামানতও লাগবে না।

৩. হলফ-শপথ-কসম

"ইয়ামীন" আরবী শব্দ যার অর্থ আল্লাহ্ বা তাঁর কোন নাম কিংবা তাঁর কোন গুণ দ্বারা হলফ-শপথ বা কসম করা।

হলফ করা বৈধকরণ : মানুষের হকের দাবির বিষয়েই কেবলমাত্র শপথ করানো জায়েয। আর আল্লাহর হকে যেমন সমস্ত এবাদত ও শাস্তি এগুলোতে শপথ করানো যাবে না। সুতরাং, যদি কেউ বলে আমি আমার সম্পদের যাকাত প্রদান করেছি এমতাবস্থায় তাকে শপথ করানো যাবে না। অনুরূপ কেউ আল্লাহর সাজা যেমন : যিনা ও চুরি অস্বীকার করে তাকে শপথ করানো যাবে না; কারণ ইহা গোপন রাখা এবং ইশারা-ইঙ্গিতে তা থেকে ফিরে আসাই মুস্তাহাব (উত্তম)।

দাবিতে কসম করার হুকুম : বাদী যখন অন্যের ওপর তার হকের সাক্ষ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে এবং বিবাদী অস্বীকার করবে তখন বিবাদীর শপথ ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। আর ইহা শুধুমাত্র মাল ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট কেসাস ও সাজার বিষয়ে জায়েয নয়। হলফ করাই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয় কিন্তু হক তথা অধিকার রহিত হয়ে যায় না। বাদীর প্রতি সাক্ষী আর যে অস্বীকার করবে তার প্রতি শপথ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ، وَلٰكِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, যদি মানুষকে তাদের দাবি অনুযায়ী দেওয়া হতো তাহলে কিছু মানুষ অবশ্যই কিছু পুরুষের রক্ত ও সম্পদ দাবি করত। তাই বিবাদীর প্রতি শপথ করা শরিয়াতের হুকুম। (বুখারী হাদীস নং ৪৫৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১১)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ـ

২. আমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত তিনি তার বাবা থেকে, বাবা তার দাদা থেকে নবী করীম ﷺ বলেছেন বাদীর ওপর সাক্ষী উপস্থিত করা আর বিবাদীর ওপর শপথ করা শরিয়াতের বিধান। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৪১)

শপথ করানোতে শক্তকরণের হুকুম : বিচারকের জন্য যাতে ভয়াবহতা মারাত্মক যেমন :কেসাস ফরজ না এমন অপরাধে শক্ত করে শপথ করানো জায়েয। অনুরূপ অধিক সম্পদ ইত্যাদি হলে আর সে সম্পদ চাইলে তার প্রতি শক্ত হলফ করানো। সময়ে হলফ শক্ত করানো যেমন :আসরের পর। আর স্থানে শক্ত শপথ করণ যেমন : মসজিদের মেম্বারের নিকটে। যদি বিচারক শপথ শক্তকরণ ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করেন তাতে তিনি সঠিক করবেন। আর যে শপথ শক্তকরণ অস্বীকার করবে সে শপথ থেকে মুক্তি পাবে না। আর যার জন্যে আল্লাহর নামে কসম করা হবে সে যেন মেনে নেয়।

প্রতিটি বিবাদীর জন্য শপথ করানো জায়েয। চাই সে মুসলিম হোক বা ইহুদি-খ্রীষ্টান হোক। যদি বাদীর সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে তবে আল্লাহর নামে শপথ করাতে হবে। আর আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদেরকে শপথ করাতে হবে। ইহুদিকে এ বলে–

أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ نَجَّاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ، وَاَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى، وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى -

(আল্লাহর নামে তোমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছি, যিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে নাযাত দান করেছেন। তোমাদেরকে সাগর পার করিয়েছেন। তোমাদের প্রতি মেঘমালার ছায়া দান করেছেন। তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছেন। তোমাদের নবী মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন।----)

(হাদীস সহীহ, আবু দাঊদ হাদীস নং ৩৬২৬)

সবচেয়ে জঘন্য মানুষ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : নিশ্চয় সবচেয়ে জঘন্য মানুষ দ্বি-চেহারার মানুষ। যে এ দলের নিকটে আসে এক চেহারা নিয়ে আর অপর দলের নিকটে আসে আর এক চেহারা নিয়ে।

(বুখারী হাদীস নং ৭১৭৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২৫২৬)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ : اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বেলন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেশি ঝগরাটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ।

(বুখারী হাদীস নং ৭১৮৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২৬৬৮)

৬. ফরায়েজ

আল্লাহর বাণী–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ص نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ـ

পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। [সূরা নিসা : আয়াত-৭-৮]

১. মিরাসের আহকাম

ফরায়েজ বিষয়ের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব : ফরায়েজ বিষয়ক জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রতিদানের দিক থেকে অনেক উচ্চ ও মহান। এর গুরুত্বের ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, ধন-সম্পদ ও তার ভাগ–বণ্টন মানুষের কাছে এক লোভনীয় বিষয়। আর মিরাস সাধারণত: নারী-পুরুষ, ছোট-বড় দুর্বল–সবল সকল প্রকৃতির লোকদের মাঝেই হয়ে থাকে; যেন এক্ষেত্রে খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ না ঘটে। তাই মহান আল্লাহ্ নিজেই এর সুস্পষ্টভাবে ভাগ–বণ্টন করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় কিতাব

কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনসাফ ও নিজ জ্ঞানানুযায়ী সকলের কল্যাণ ভিত্তিক সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

মহানবী ﷺ ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব বিবেচনায় বলেছেন–

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ.

তোমরা ইলমে ফারায়েয শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক।

মানুষের অবস্থাসমূহ

মানুষের দুটি অবস্থা : জীবন আর মরণ। ফরায়েজ বিদ্যায় বেশির ভাগ বিধি-বিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইহা জ্ঞানের অর্ধেক এবং প্রতিটি মানুষই এ জ্ঞানের মখাপেক্ষী।

জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে মিরাস দিত। এভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার দিত। আর বর্তমানের জাহেলিয়াত নারীদেরকে তাদের অধিকারের উপরে পদ, কাজ ও সম্পদ দিয়েছে। এর ফলে অনিষ্ট বেড়েছে ও ফাসাদ-বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারী জাতিকে ইনসাফের ভিত্তিতে অধিকার দিয়েছে, উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে এবং অন্যান্যদের মতো তার উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফরায়েজ বিদ্যার পরিচয় : এটি এমন বিদ্যার নাম যা দ্বারা উত্তরাধিকার কোন্ ব্যক্তি পাবে, আর কে পাবে না এবং কে কী পরিমাণ পাবে তা জানা যায়। ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝে নির্ধারিত অংশে ভাগ করে দেওয়ার শাস্ত্রকে ফরায়েজ বলে।

এর বিষয়বস্তু : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত (স্থাবর ও অস্থাবর) সমস্ত সম্পদ।

এর উপকারিতা : উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের নিকট যার যার অধিকার পৌঁছে দেয়া।

ফারীযা : (সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ) ইহা হচ্ছে সেই নির্ধারিত অংশ যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেমন : তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ : পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার মোট পাঁচটি। ইহা বিদ্যমান থাকলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকার ৫টি নিম্নরূপ

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

২. ঐসব অধিকারসমূহ আদায় করা যা সরাসরি পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : বন্ধক ইত্যাদির সাহায্যে সংঘটিত ঋণ।

৩. সাধারণ ঋণ, চাই তা আল্লাহর হোক যেমন : জাকাত, কাফ্ফারা ইত্যাদি অথবা মানুষের হোক।

৪. এরপর অসিয়ত।

৫. পরিশেষে উত্তরাধিকার।

উত্তরাধিকারের ভিত্তিসমূহ : উত্তরাধিকারের ভিত্তি তিনটি

১. উত্তরাধিকারের মূল মালিক (মৃত ব্যক্তি)।

২. উত্তরাধিকারীগণ।

৩. মিরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পদ।

উত্তরাধিকারের কারণসমূহ : উত্তরাধিকারের কারণ তিনটি :

১. সঠিক বিবাহ বন্ধন, যার ফলে স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হবে।

২. বংশীয় সম্পর্ক, ইহা মূল নিকটাত্মীয়তার সূত্রে হতে পারে যেমন : মাতা-পিতা, শাখাগত নিকটাত্মীয় যেমন : সন্তান-সন্ততি, পার্শ্বের আত্মীয়তা যেমন : ভাই, চাচা ও তাদের সন্তান-সন্ততি।

৩. অনুগ্রহের সম্পর্ক, এটি এমন এক সম্পর্ক যা কোন মনিব স্বীয় দাসমুক্তির অনুগ্রহ দ্বারা অর্জন করে থাকে, ফলে উক্ত দাস-দাসীর বংশীয় কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে পূর্বের মনিব তার ওয়ারিস হবে।

উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলি : মৃতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত

১. মৃত্যু সাব্যস্ত হওয়া।

২. মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ।

৩. উত্তরাধিকারী বানানোর কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন যেমন : বংশ বা বিবাহ কারণ কিংবা গোলাম আজাদ করার ওয়ালা তথা অধিকার।

উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ : উত্তরাধিকার হওয়াতে বাধা মোট তিনটি জিনিস

১. **দাসত্ব :** এর ফলে দাস-দাসী উত্তরাধিকার পাবে না এবং অন্যকেও উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না; কেননা সে নিজ মনিবের অধীন।

২. **অন্যায়ভাবে হত্যা করা :** এর ফলে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হলেও সে তার মিরাস পাবে না।

৩. **ধর্মের ভিন্নতা :** এর ফলে মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৬৪ মুসলিম হাদীস নং ১৬১৪)

তালাকপ্রাপ্তার মিরাস

১. রাজ'য়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত তার ও স্বামীর মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।

২. যে স্ত্রীকে স্বামী "তালাকে বায়েনা কুবরা" তথা চিরবিচ্ছেদ যোগ্য তালাক দিয়েছে যদি তা সুস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে কোনরূপ উত্তরাধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে, আশঙ্কাপূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় যদি হয়ে থাকে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ স্বামীর উপর না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায়ও উত্তরাধিকার পাবে না। তবে যদি স্বামীর উপর এ অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে।

উত্তরাধিকারের প্রকার

১. **নির্ধারিত :** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে যেমন : অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

২. **অনির্ধারিত :** এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে কোন উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত থাকে না।

কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬ টি : অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ, এক-তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ ও সেই সাথে অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ, ইহা এজতেহাদ দ্বারা সাব্যস্ত।

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা

পুরুষ উত্তরাধিকারীরা বিস্তারিতভাবে মোট ১৫ জন : ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে ইত্যাদি, পিতা, দাদা, দাদার পিতা, তার পিতা ইত্যাদি, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তান, তার সন্তান, তার সন্তান ইত্যাদি, স্বামী, আপন চাচা, তার চাচা, তার চাচা-- , বৈমাত্রেয় চাচা, তার চাচা, তার চাচা----, আপন চাচার সন্তান ও বৈমাত্রেয় চাচার সন্তান তাদের সন্তান, তাদের সন্তান, কেবল দাস মুক্তকারী পুরুষ সন্তানগণ ও তার অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ। এসব পুরুষ ব্যতীত অন্য আর যারা রয়েছে তারা সবাই আত্মীয় যেমন : মামারা, বৈপিত্রেয় ভাতিজা, বৈপিত্রেয় চাচা ও বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই ইত্যাদি।

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস সর্বমোট ১১ জন : মেয়ে, ছেলের মেয়ে তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে----, মা, নানী, নানীর মা, তার মা এভাবে উপর পর্যন্ত, দাদী, দাদীর মা, তার মা যদিও এভাবে মহিলানুক্রমে আরো উপরে যায়, দাদার মা, আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রীয় বোন, স্ত্রী ও দাস-দাসীমুক্তকারিণী।

নোট : এ ছাড়া যত মহিলা আছে সবাই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কিন্তু ওয়ারিস নয়। যেমন : খালা ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ط نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ـ

"মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। এমনিভাবে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা কম বা বেশি নির্ধারিত অংশ। [সূরা নিসা :৭]

২. উত্তরাধিকারীদের প্রকার

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

উত্তরাধিকারের প্রকার : ইহা দুই প্রকার : নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। এই দুইয়ের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মোট ৪ প্রকার

১. **যারা কেবল নির্ধারিত অংশ পাবে এরা মোট ৭জন :** মা, বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রীয় বোন, নানী, দাদী, স্বামী ও স্ত্রী।

২. **যারা কেবল অনির্ধারিত অংশ পাবে তারা মোট ১২ জন :** ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, তার ছেলে---, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে, তাদের ছেলে, তাদের ছেলে---, আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচা, তাদের চাচা, তাদের চাচা-----,আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্রেয় চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই, তাদের চাচাত ভাই---, দাস-দাসী মুক্তকারী ও দাস-দাসী মুক্তকারিণী।

৩. **যারা কখনো নির্ধারিত এবং কখনো অনির্ধারিত আবার কখনো উভয় প্রকার দ্বারা উত্তরাধিকার লাভ করে এরা মোট ২ জন :** পিতা ও দাদা। তাদের একেক জন শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে নির্ধারিতভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তার সাথে শাখাজাত উত্তরাধিকারী না থাকলে সে এককভাবে অনির্ধারিত অংশ পাবে। নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে মহিলা শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে উত্তরাধিকার পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের পর ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকবে। যেমন : কোন ব্যক্তি মেয়ে, মাতা ও পিতা রেখে মারা গেল এক্ষেত্রে মোট অংশ ৬ থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মাতা ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট দুই অংশ নির্ধারিত ও অনির্ধারিতভাবে পিতা পেয়ে যাবে।

৪. **যারা কখনো নির্ধারিত আর কখনো অনির্ধারিতভাবে উত্তরাধিকার পায় এবং কোন সময়ই উভয় প্রকার এক সাথে পায় না, তারা মোট ৪ জন :** মেয়ে (এক বা ততোধিক), ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক), তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে------, এক বা ততোধিক আপন বোন ও এক বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। এরা শুধু নির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে না। সে হচ্ছে তাদের ভাই। আর যখন তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ

দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে তখন অনির্ধারিত অংশ লাভ করবে। যেমন : মেয়ের সাথে ছেলে, বোনের সাথে ভাই ও মেয়েদের সাথে বোনেরা থাকলে তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হিসাবে অংশ পাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সংখ্যা

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা ১১ জন : স্বামী, এক বা একাধিক স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, এক বা একাধিক দাদী, মেয়েরা, ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয় বোনেরা এবং বৈপিত্রীয় ভাই ও বৈপিত্রীয় বোনেরা। তাদের উত্তরাধিকার নিম্নরূপ।

১. স্বামীর মিরাস

স্বামীর মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. স্বামী তার স্ত্রীর অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে, যদি স্ত্রীর শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর শাখাজাত উত্তরাধিকারীরা হচ্ছে : ছেলে বা মেয়ে সন্তানরা এবং ছেলেদের সন্তানরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধর। আর এখানে মেয়েদের সন্তানরা হলো যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকারী না তারা।

২. স্বামী তার স্ত্রীর এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হবে যদি স্ত্রীর কোন সন্তানাদি থাকে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ -

তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ আদায়ের পরে।

[সূরা নিসা : আয়াত-১২]

উদাহরণ

১. স্বামী, মা ও একজন সহোদর ভাই রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ, আর ভাই আসাবা হিসেবে বাকিটুকু পাবে।

২. স্বামী ও ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে এক-চতুর্থাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

২. স্ত্রীর মিরাস

স্ত্রীর মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. স্বামীর শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

২. যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে শাখাজাত উত্তরাধিকারী (ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনি) থাকে তবে স্ত্রী তার স্বামীর এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ -

আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে। [সূরা নিসা : আয়াত-১২]

একাধিক স্ত্রী হলে তারা সবাই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশের অংশীদার হবে।

উদাহরণ

১. স্ত্রী, মা ও সহোদর একজন চাচা রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। এর মধ্যে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মা এক-তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচা পাবে।

২. স্ত্রী ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি পাবে ছেলে।

৩. তিনজন স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। তিনজন স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি ছেলে-মেয়ে–পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ হিসেবে।

৩. মায়ের মিরাস

মায়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. **তিনটি শর্তে এক-তৃতীয়াংশ** : ইহা তিনটি শর্তে উত্তরাধিকার পাবেন : শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকা, ভাই–বোনদের সাথে অংশিদারিত্বে শামিল না হওয়া এবং বিষয়টি দুই উমারিয়ার মাসয়ালার কোন একটি না হয়। (ফরায়েজ শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির মাতা–পিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকলে, তাকে "উমারিয়াহ"-এর মাসয়ালা বলে; কারণ এ দ্বারা উমর ফারুক (রা) এ মাসয়ালার ফয়সালা করেছিলেন।)

২. **অষ্টমাংশ** : যদি মৃত ব্যক্তির শাখাজাত (সন্তান-সন্ততি) উত্তরাধিকারী থাকে কিংবা ভাই অথবা বোনদের কয়েকজন বিদ্যমান থাকে।

৩. **অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ** : যদি দুই উমারিয়া যাকে 'গারাওয়াইন'ও বলা হয় এর মাসয়ালা হয়।

উমারিয়ার মাসয়ালা দু' টি হলো

ক. **স্ত্রী, মা ও বাবা** : অংকটি ৪ দ্বারা হবে : অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ৪ ধরে নিলে স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মায়ের জন্য অবশিষ্ট (স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর) অংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পিতার জন্য।

খ. **স্বামী, মা ও বাবা** : অংকটি ৬ দ্বারা হবে, অর্থাৎ সর্বমোট অংশ ৬ ভাগ ধরে করতে হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক তথা ৩, মায়ের জন্য (স্বামীর অংশ বন্টনের পরে) অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ তথা ১ এবং অবশিষ্ট ২ পিতার জন্য।

মাকে অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ এ জন্য দেয়া হবে যাতে করে ইহা পিতার অংশের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়; কারণ উভয় জন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। আর একজন পুরুষ দুজন মহিলার অংশের সমান অংশ যেন পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۔

আর মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রতিজন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মাতা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার কৃত অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর তার মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১১]

উদাহরণ

১. একজন মানুষ মা ও চাচা রেখে মালা গেল। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

৪. পিতার মিরাস

পিতার মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. পিতা নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন : এর জন্য শর্ত হলো : পুরুষ জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকা যেমন : ছেলে কিংবা ছেলের ছেলে এভাবে যদিও আরো নিচের হয়।

২. শাখাজাত উত্তরাধিকারী কোন মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি হলে, পিতা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশের মিরাস পাবেন। যেমন : মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ে থাকা অবস্থায় তিনি নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ অনির্ধারিতভাবে লাভ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৩. মৃত ব্যক্তির শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী থাকলে, পিতা অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকার পাবেন।

আপন ভাইয়েরা কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভাইদের কেহই পিতা ও দাদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মিরাসের কোন অংশ পাবে না।

উদাহরণ

১. একজন মানুষ বাবা ও ছেলে রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মানুষ মা ও বাবা রেখে মারা গেল। মার জন্য এক-তৃতীয়াংশ আর বাকি বাবার জন্য।

৩. একজন মানুষ বাবা ও মেয়ে রেখে মারা গেল। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৪. একজন মানুষ বাবা ও সহোদর ভাই কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবেন বাবা এবং বাবার কারণে ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে।

৫. দাদার উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকারী দাদা তিনি যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন নারীর সম্পর্ক থাকবে না যেমন : পিতার পিতা। সুতরাং নানা উত্তরাধিকারী হবেন না; কারণ তার মাধ্যম মা নারী দ্বারা। দাদার উত্তরাধিকার পিতার মতোই কেবল উমারিয়ার দুটি প্রসঙ্গ ছাড়া; কেননা সে দুটিতে মা দাদার সাথে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবেন। কিন্তু পিতার সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। এটি হবে স্বামী–স্ত্রী হিসাবে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরের ব্যাপার যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

দাদার মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. দাদা দুটি শর্তসাপেক্ষে এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন যথা : মৃতব্যক্তির শাখাজাত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা ও পিতা না থাকা।

২. দাদা উপরোক্ত অবস্থায় অনির্ধারিত অংশ পাবেন যখন মৃত ব্যক্তির কোন শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে না এবং যখন পিতাও থাকবেন না।

৩. দাদা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশ দ্বারা একই সাথে উত্তরাধিকার পাবেন। ইহা যখন মৃত ব্যক্তির মহিলা জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে যেমন : মেয়ে ও ছেলের মেয়ে ইত্যাদি।

উদাহরণ

১. একজন দাদা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য।

২. একজন মা ও দাদা ছেড়ে মারা গেল। অংক ৩ দ্বারা হবে। মার জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি দাদার জন্য।

৩. একজন মারা গেল দাদা ও মেয়ে রেখে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ফরজ হিসেবে আর দাদার জন্যে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে।

৬. দাদী ও নানীর উত্তরাধিকার

দাদী, নানী বলতে সেই উত্তরাধিকারিণী উদ্দেশ্য যিনি হবেন মায়ের মা নানী কিংবা পিতার মা দাদী ও দাদার মা (বড় দাদী) যদিও কেবল মহিলাদের মাধ্যমে আরো উপরে যায়। পিতার দিক থেকে তারা দুইজন ও মাতার দিক থেকে একজন।

মাতার জীবদ্দশায় দাদী–নানীরা কোন প্রকার উত্তরাধিকার (মিরাস) পাবেন না।

মা না থাকালে এক বা একাধিক দাদী–নানী হলে তাঁরা সকলে মিলে এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদী বা নানীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য।

২. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, মা ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য এবং দাদী বা নানী মার জন্য বাদ পড়ে যাবে।

৭. মেয়েদের উত্তরাধিকার

মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. এক বা একাধিক মেয়ে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারিণী হবে যখন তাদের সাথে ভাই থাকবে। এক পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে।

২. মেয়ে একা হলে (ছেলে বা অন্য মেয়ে না থাকলে) অর্ধেক অংশ পাবে।

৩. মেয়েরা দুই বা ততোধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। শর্ত হলো : যদি অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীতে পরিণতকারী তাদের ভাই না থাকা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔

আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। তবে তারা দুয়ের উর্ধ্বে মেয়ে সন্তান হলে তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১১]

উদাহরণ

১. একজন ব্যক্তি দাদী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। দাদীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলে ও মেয়ের জন্য–পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুণ হিসেবে।

২. এক ব্যক্তি মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, দু' জন মেয়ে ও দাদা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর দু' মেয়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ।

৮. ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার

ছেলের মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. এক বা একাধিক ছেলের মেয়ে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হবে, যখন তার সাথে তার সমপর্যায়ের কোন ভাই থাকবে। আর সে হচ্ছে ছেলের ছেলে।

২. একজন ছেলের মেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকারিণী হবে যদি তার কোন ভাই-বোন এবং মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৩. ছেলের মেয়েরা একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। তবে শর্ত হলো : তাদের ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে না থাকা।

৪. একাধিক ছেলের মেয়েরা তাদের ভাই না থাকলে এক-ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি মৃতের কোন ছেলে না থাকে এবং একটি মাত্র মেয়ে থাকে যে অর্ধেকের মালিক।

নোট : এমনিভাবে ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়ের সাথে উপরোক্ত নিয়মে অংশ পাবে।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পাবে।

২. এক ব্যক্তি ছেলের মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল। অংক ২ দ্বারা হবে। ছেলের মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি দুইজন ছেলের মেয়ে ও সহোদর ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা ৩ দ্বারা হবে। দুই ছেলের মেয়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ আর বাকি সহোদর ভাইয়ের জন্য।

৪. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ও ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্য।

৯. আপন বোনদের উত্তরাধিকার

সহোদর বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. আপন বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। যদি তার ভাই না থাকে এবং মৃতের মূল তথা পিতা বা দাদা ও ভাই-বোন না থাকে।

২. আপন বোন একের অধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো : তাদের কোন ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল তথা বাবা-দাদা না থাকা।

৩. এক বা একাধিক আপন বোন অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। এমতাবস্থায় এক ভাই দুই বোনের সমান অংশ পাবে। এমনিভাবে তারা ভাই-বোন মৃতের মেয়েদের সাথে হলেও একইভাবে অংশ পাবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ

তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তুমি বল : আল্লাহ্ তোমাদেরকে 'কালালাহ্' সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন : যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। [সূরা নিসা : আয়াত-১৭৬]

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মা, সহোদর বোন ও দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, সহদর বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈমাত্রেয়া দুই বোনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুইজন সহোদর বোন ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি স্ত্রী, একজন সহোদর বোন, একজন সহোদর ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৪ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ আর বাকি ভাই ও বোনের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

৪. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মেয়ে ও সহোদর বোন রেখে মারা গেল। অংক ৮ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ, মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি সহোদর বোনের জন্য।

১০. বৈমাত্রেয় বোনদের উত্তরাধিকার

বৈমাত্রেয় বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত হলো : সাথে তার কোন ভাই-বোন এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

২. বৈমাত্রেয় একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে : শর্ত হলো : সাথে তার কোন ভাই এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন না থাকা।

৩. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন মৃতের শুধু আপন এক বোনের সাথে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের কোন ভাই এবং মৃতের আপন ভাই, মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়ে না থাকে।

৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন তাদের ভাইয়ের সাথে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী হবে। (এমতাবস্থায় এক পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ হবে।) মৃতের মেয়েদের সঙ্গেও তারা অনুরূপ অংশ পাবে।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় বোনের জন্য অর্ধেক আর বৈপিত্রেয় দুই ভাইয়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে রেখে মারা গেল। অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা, বৈপিত্রেয় বোন, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় দুই-বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ আর সহোদর বোনের জন্য অর্ধেক।

৪. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি দুই বোন ও তাদের ভাইয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

৫. একজন মহিলা স্বামী, মেয়ে ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। অংক হবে ৪ দ্বারা। স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মেয়ের জন্যে অর্ধেক আর বাকি বোনের জন্যে।

১১. বৈপিত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকার

বৈপিত্রেয় ভাইদের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের কোন প্রাধান্য নেই এবং তাদের মধ্যকার পুরুষ মহিলাদেরকে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী বানাতে

পারবে না, ফলে ভাই-বোন সবাই সমান অংশের উত্তরাধিকারী হবে। এদের পুরুষকে নারীরা টেনে এনে ওয়ারিস বানায়। এরা যার দ্বারা বারণ হয়ে কম পায়।

বৈপিত্রেয় ভাইদের মিরাসের অবস্থাসমূহ

১. বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বৈপিত্রেয় বোন একজন হলে এক-ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো : মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

২. বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোনরা একাধিক হলে এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো : মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা দাদা থাকবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْاُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি একাধিক হয় তবে তারা এক-তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে কৃত অসিয়ত পূরণের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর কারও অনিষ্ট না করে। ইহা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। [সূরা নিসা : আয়াত-১২]

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি স্ত্রী ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং সহোদর চাচার ছেলে রেখে মারা গেল। এ অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ আর বাকি সহোদর চাচার ছেলের জন্যে।

২. একজন মহিলা স্বামী, দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই ও সহোদর চাচা রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক, দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি চাচার জন্য।

৩. এক ব্যক্তি মা-বাবা ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ এবং বাকি বাবার জন্যে। আর বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা বাবার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মাসায়েল : নির্ধারিত অংশ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রসঙ্গগুলো মোট তিন প্রকার

১. অংশগুলো মূল অংকের সমান হলে একে " 'আদিলাহ্' " বলা হয়।

উদাহরণ : স্বামী ও বোন, অংকটি দুই দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসেবে এক ও বোনের জন্য অর্ধেক হিসেবে অপর এক থাকবে।

২. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা কম হলে একে "নাক্বিসাহ্" বলা হয়। এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা পাবে। যদি এতে অনির্ধারিত অংশগুলো পূর্ণ সম্পত্তি শামিল না করে এবং কোন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তারাই এর অগ্রাধিকার যোগ্য হকদার হবে। আর তাদের অনির্ধারিত অংশ অনুপাতে গ্রহণ করবে।

উদাহরণ : স্ত্রী ও মেয়ে, অংকটি ৮ দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে এক থাকবে এবং মেয়ের জন্য অনির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্ট ফেরতযোগ্য অংশ হিসেবে সাত ভাগ থাকবে।

৩. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা বেশি হলে একে " 'আয়িলাহ্ " বলা হয়।

উদাহরণ : স্বামী ও বৈমাত্রেয়ী দুই বোন, এক্ষেত্রে স্বামীকে অর্ধেক দেয়া হলে বোনদ্বয়ের অধিকার দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে না; তাই মূল অংক ছয় দ্বারা হবে যা বেড়ে সাতে দাঁড়াবে : স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে তিন এবং দুই বোনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ হিসেবে চার, ফলে যার যার অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের ভাগে কম পড়বে।

৩. আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা হলো : যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়া উত্তরাধিকারী হয়।

অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ দুই প্রকার :

১. বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

২. কারণসাপেক্ষে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত।

১. বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট তিন প্রকার

১. **অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ :** এরা পুরুষ জাতীয় উত্তরাধিকারী কিন্তু স্বামী, বৈপিত্রেয় ভাই, দাস মুক্তকারী ব্যতীত যথা : ছেলে, ছেলের ছেলে যদিও নিচে যায়, পিতা, দাদা যদিও উপরে যায়, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে যদিও নিচে যায়।

এদের মধ্যে যে একা থাকবে সে পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর যখন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সাথে থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা গ্রহণ করবে, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শামিল করে নিলে বাদ পড়ে যাবে।

অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারদানকারী পক্ষগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা নিকটবর্তী। পক্ষগুলো পর্যায়ক্রমে পাঁচটি : সন্তান পক্ষ, অত:পর পিতৃপক্ষ, এরপর ভাই ও ভাইয়ের সন্তান পক্ষ, অত:পর চাচারা ও তাদের সন্তান পক্ষ এবং সবশেষে দাস মুক্তকারী পক্ষ।

দু'জন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত এক সাথে হলে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে যেমন–

ক. প্রথম অবস্থা এই যে, তার পক্ষ, স্তর ও ক্ষমতা সমান হবে যেমন : দুই ছেলে অথবা দুই চাচা। এমতাবস্থায় উভয়জন সমানভাবে অংশীদার হবে।

খ. দ্বিতীয় অবস্থায় এই যে, তারা পক্ষ ও স্তরে সমান হবে কিন্তু ক্ষমতায় ভিন্ন থাকবে যেমন : আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচা, এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রাধান্য

দেওয়া হবে, ফলে আপন চাচা উত্তরাধিকারী হবেন এবং বৈমাত্রেয় চাচা হবেন না।

গ. তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে এক হবে, তবে স্তরে ভিন্ন হবে যেমন : ছেলে ও ছেলের ছেলে, এক্ষেত্রে স্তরের প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে পূর্ণ সম্পত্তি ছেলের জন্য হয়ে যাবে।

ঘ. চতুর্থ অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগতভাবে ভিন্ন হবে, এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারে পক্ষগতভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দূরবর্তী ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে, যদিও সে স্তরের দিক থেকে দূরবর্তী হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি নিকটবর্তী হয়, ফলে ছেলের ছেলে পিতার উপর প্রাধান্য পাবে।

২. **অন্যের মধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ** : এরা মোট চারজন নারী যথা–

ক. এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায় এক অথবা ততোধিক মেয়ে, এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায়।

খ. এক অথবা একাধিক মেয়ের মেয়ে, এক অথবা একাধিক আপন ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

গ. এক অথবা একাধিক আপন বোন, এক অথবা একাধিক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যস্থতায়।

ঘ. এক অথবা একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন। এরা উত্তরাধিকারে একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ হিসেবে পাবে এবং নির্ধারিত অংশের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু যদি নির্ধারিত অংশ সবটুকু সম্পত্তি শেষ করে ফেলে তবে তারা বাদ পড়ে যাবে।

৩. **অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ** : এরা দুই প্রকার মানুষ যথা :

ক. এক অথবা একাধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ের সাথে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা একাধিক আপন বোন।

খ. এক অথবা ততোধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের মেয়ে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। বস্তুত: বোনেরা সব সময়ই মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়েদের সাথে তারা যতই নিচে যায় না কেন অনির্ধারিত অংশের অধিকারী হয়ে থাকে, তাই তারা নির্ধারিত

অংশের পরের অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শেষ করে ফেললে তারা বাদ পড়ে যাবে।

২. কারণসাপেক্ষে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ

এরা পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে দাস মুক্তকারী ও তারা সরাসরি অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ।

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

আর যদি তারা পুরুষ ও নারী ভাই-বোন হয় তবে পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। আল্লাহ্ তোমাদের উদ্দেশ্যে এ জন্য বর্ণনা করেছেন, যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [সূরা নিসা : আয়াত-১৭৬]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ ـ

২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন : তোমরা উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটবর্তী পুরুষ লোকদের জন্য।

(বুখারী হাদীস নং ৬৭৩২ মুসলিম হাদীস নং ১৬১৫)

মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা

১. **উসূল-মূল :** প্রতিটি নিকটাত্মীয় যারা উপরের স্তরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয় যদি একই শ্রেণীর হয়। যেমন : বাবা দাদাকে বাদ করে দেয়, মা দাদী-নানীকে বাদ করে। আর মা দাদাকে বাদ করে দেয় না এবং বাবা দাদীকে বাদ করে না; কারণ একই শ্রেণীর না।

২. **ফরূ'-শাখা :** প্রতিটি পুরুষ যারা তার নিচের স্তরকে বাদ করে দেয়। চাই একই শ্রেণীর হোক বা ভিন্ন শ্রেণীর হোক। যেমন : ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়েকে বাদ করে দেয়। আর নারীরা তাদের নিচের স্তরকে বাদ করে না। তাই ছেলের মেয়ে মেয়ের সাথে মিরাস পাবে।

৩. হাওয়াশী-পার্শ্ববর্তী আত্মীয় : এদেরকে উসূল ও ফরূ'র প্রতিটি পুরুষ মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন বাবা ভাই ও বোনদেরকে বাদ করে দেয় এবং ছেলে ভাই ও বোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। আর প্রতিটি নিকট পার্শ্ববর্তী আত্মীয় সর্বদা দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই ভাই ভাইয়ের ছেলেকে বাদ করে দেয়। আর নারীদের পার্শ্ববর্তীর মধ্যে বোনরা ছাড়া আর কেউ মিরাস পায় না।

৪. ফরূ'দের মিরাসের নীতিমালা : কোন নারীর মাধ্যম দ্বারা যেন সম্পর্ক না হয়, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। সুতরাং ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়ে দুই জনেই মিরাস পাবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে মিরাস পাবে না; কারণ এদের সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে।

৫. উসূল-মূলের প্রত্যেকেই যারা ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক তারা মিরাস পাবে যেমন : দাদার মাগণ।

৬. দাদা সকল প্রকার ভাই-বোনদেরকে বাদ করে দেবে, চাই তারা সহোদর হোক বা বৈমাত্রেয় হোক কিংবা বৈপিত্রেয় হোক। আর চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। দাদা সম্পূর্ণ বাবার মতোই।

৭. দাদী-নানীরা শাখা ওয়ারিস থাক বা না থাক অথবা ভাই-বোনরা থাক বা না থাক কিংবা আসাবার সাথে হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় শুধুমাত্র এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবেন।

৮. প্রতিটি দাদী-নানী যে ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক সে মিরাস পাবে যেমন : বাবার মা ও মার মা।

৯. স্ত্রীরা ও দাদী-নানীরা এক হোক বা একাধিক মিরাস একই হবে। তাই স্ত্রীগণ চতুর্থাংশে বা অষ্টমাংশে শরিক হবে এবং দাদী-নানীরা ষষ্ঠাংশে শরিক হবে।

১০. চারজনের ফরজ অংশ তাদের সংখ্যা বেশির কারণে বেড়ে যাবে না : তারা হলেন : স্ত্রীগণ, দাদী-নানীগণ, ছেলের মেয়েরা মেয়ের সাথে ও বৈমাত্রেয় বোনেরা সহোদর বোনের সাথে।

১১. যখন একই স্তরে নারী ও পুরুষ একত্রে জমা হবে তখন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। যেমন : ছেলে ও মেয়ে অথবা বাবা ও মা উমারিয়ার দুই অংকতে (স্বামী ও বাবা-মা) ছয় থেকে এবং (স্ত্রী ও বাবা-মা) চার থেকে মায়ের জন্য বাকিরা এক তৃতীয়াংশ।

১২. ফরায়েজের বিধানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনরা ছাড়া আর কোন নারী-পুরুষ বরাবর হবে না। তাদের পুরুষ ও নারীরা মিরাসে সমান সমান।

১৩. বোনেরা সর্বদা মেয়েদের সাথে আসাবা হবে।

৪. বঞ্চিতকরণ

ইহা হলো : কারো পক্ষে উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে পূর্ণ কিংবা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করার নাম।

বঞ্চিতকরণ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক অধ্যায়। যে এ সম্পর্কে অবগত থাকবে না সে কখনো উত্তরাধিকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিবে অথবা এমন ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে দিবে যে তার অধিকারী নয়। আর এই দুই অবস্থাতেই রয়েছে পাপ ও জুলুম।

আসাবার পক্ষগুলো : ছেলে যদিও নিচের স্তরে চলে যায় যেমন : ছেলের ছেলে-----, সহোদর ভাই---, বৈমাত্রেয় ভাই---, সহোদর ভাইয়ের ছেলে---, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে----, সহোদর চাচা----, বৈমাত্রেয় চাচা---, সহোদর চাচার ছেলে----, বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে। এরা সকলে মানুষের আসাবা। এদের কেউ একাকী হলে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে নেবে। আর ফরজ অংশীদের সাথে বাকি অংশ তাদের হবে। যদি একজন মানুষ মারা যায় আর সহোদর ভাই ছাড়া আর কেউ না থাকে, তাহলে তারই জন্যে সমস্ত সম্পদ হবে।

উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ : উত্তরাধিকারীরা এক সাথে হলে তাদের মোট ৩টি অবস্থা

১. যখন সব পুরুষরা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল তিনজন উত্তরাধিকার পাবে যথা : পিতা, পুত্র ও স্বামী। এদের অংক হবে ১২ দ্বারা : পিতার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ হিসেবে দুই, স্বামীর জন্য এক-চতুর্থাংশ হিসেবে তিন। আর অবশিষ্ট সাত ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে।

২. যখন সমস্ত মহিলারা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকার পাবে যথা : স্ত্রী, মা, মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও আপন বোন। আর অন্যান্যরা সকলে বাদ পড়ে যাবে। এদের অংক হবে ২৪ দ্বারা ; স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৩। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪। মেয়ের জন্য অর্ধেক হিসেবে ২৪ থেকে ১২।

ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। আর আপন বোনের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ২৪ থেকে থাকবে অবশিষ্ট মাত্র ১।

৩. যখন সকল পুরুষ ও সমস্ত মহিলা এক সাথে হবে তখন কেবল পাঁচজন উত্তরাধিকারী হবে যথা : পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রীর যে কোন একজন। এর দুই অবস্থা; যথা–

ক. তাদের সাথে স্ত্রী থাকলে অংকটি ২৪ দ্বারা হবে : পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৪। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসেবে ২৪ থেকে ৩। আর অবশিষ্ট ২৪ থেকে ১৩ অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

খ. তাদের সাথে স্বামী থাকলে অংকটি ১২ দ্বারা হবে : পিতার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ১২ হতে ২। মায়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসেবে ১২ হতে ২। স্বামীর জন্য চতুর্থাংশ হিসেবে ১২ হতে ৩। আর অবশিষ্ট ১২ হতে ৫ অনির্ধারিত অংশ হিসেবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে বণ্টন হবে।

২. উসূল-মূল, ফরূ'-শাখা ও হাওয়াশী-পার্শ্ববর্তী আত্মীয় : আত্মীয়রা মূল, শাখা ও পার্শ্ব।

মূল হলো : যাদের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো সকল বাবা ও মায়েরা।

শাখা হলো : যারা নিজের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো ছেলে ও মেয়েরা।

পার্শ্ব হলো : যারা নিজের মূল থেকে শাখা। এদের মধ্যে সকল ভাই-বোন ও চাচা ও মামারা প্রবেশ করবে।

মূল থেকে যারা আত্মীয় : প্রতিটি পুরুষ যার ও মৃত ব্যক্তির মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন : মায়ের বাবা অর্থাৎ নানা।

শাখা থেকে যারা আত্মীয় : প্রতিটি পুরুষ যার ও মৃতু ব্যক্তির মাঝে নারীর মাধ্যম যেমন : মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে।

বঞ্চিত হওয়ার প্রকার

বঞ্চিত হওয়া মোট দুই ভাগে বিভক্ত

১. **বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বঞ্চিত হওয়া :** এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে জড়িয়ে পড়ার নাম; যথা : দাসত্ব হত্যা ও ভিন্ন ধর্মের হওয়া। আর এটি প্রত্যেক

উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অতএব, যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি দ্বারা ভূষিত হবে সে উত্তরাধিকার পাবে না এবং তার থাকাকে না থাকা বলে বিবেচিত হবে।

২. **ব্যক্তি বিশেষের কারণে বঞ্চিত হওয়া :** এখানে যা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির কারণে বারণ করার নাম।

এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত : কম জাতীয় বারণ ও পূর্ণ বঞ্চিত জাতীয় বারণ এর বিবরণ নিম্নরূপ

১. কম জাতীয় বঞ্চিত : এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে বড় অংশ থেকে বারণ করা তথা বারণকারীর কারণে বারণকৃত ভাগে কম পড়ার নাম।

এটি আবার দুই প্রকার

প্রথম প্রকার : কম জাতীয় বঞ্চিত যার কারণ স্থানান্তর, ইহা চার প্রকার :

১. বঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারিত অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হবে। এরা মোট পাঁচ জন : স্বামী, স্ত্রী, মা, ছেলের মেয়ে ও বৈমাত্রেয়ী বোন। যেমন : স্বামীর অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে স্থানান্তরিত হওয়া।

২. অনির্ধারিত অংশ থেকে তদাপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা কেবল পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩. নির্ধারিত অংশ থেকে তদাপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অর্ধেকের অধিকারীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরা হচ্ছে মেয়ে, ছেলের মেয়ে, আপন বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন যখন তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বীয় ভাই থাকবে।

৪. অনির্ধারিত অংশ থেকে তার চেয়ে কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। আর ইহা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে আপন অথবা বৈমাত্রেয়ী বোন মেয়ে অথবা ছেলের মেয়ের সাথে অবশিষ্ট অংশ পাবে যা হবে অর্ধেক, তবে তার সাথে তার ভাই থাকলে অবশিষ্ট অংশ তাদের দুইজনের মধ্যে বন্টন হবে। এতে পুরুষের জন্য দুই মহিলার অংশের সমান থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার : যার কারণ একাধিক অংশের সংমিশ্রণ, ইহা তিন প্রকার–

১. এটি নির্ধারিত ফরজ অংশে হবে যা সাত জন উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যথা : দাদা, স্ত্রী, একাধিক মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয়ী বোনেরা, বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা।

২. **অনির্ধারিত অংশে সংমিশ্রণ** : ইহা প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ক্ষেত্রে হবে যেমন : ছেলেরা, ভাইয়েরা, চাচারা ও আরো অন্যান্য।

৩. মূল অংকের চেয়ে অংশ বেশি হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক অংশের সংমিশ্রণ। আর এটি হবে নির্ধারিত অংশ প্রাপকগণের ক্ষেত্রে যখন তারা এক সাথে সবাই অংশীদার হবে।

২. **পূর্ণ জাতীয় বঞ্চিত :** এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম। এটি ছয়জন ব্যতীত অন্য সব উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরা হলো ছয়জন : পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে।

ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা

১. প্রত্যেক মূল উত্তরাধিকারী তার উপরের মূলকে বঞ্চিত করবে, ফলে পিতা দাদাদেরকে বঞ্চিত করবেন ও মাতা নানীদেরকে বঞ্চিত করবেন ইত্যাদি।

২. প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সন্তান তার নিচের স্তরকে বঞ্চিত করবে, চাই সে সজাত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ফলে ছেলে ছেলের ছেলে-মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। আর মেয়েরা দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় তাদের নিচের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি মেয়েদেরকে কোন পুরুষ অনির্ধারিত অংশের অধিকারিণী বানায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ পুরুষরা অনির্ধারিত অংশ হিসেবে পেয়ে যাবে।

৩. প্রত্যেক মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক শাখা তথা আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ও তাদের সন্তানাদি এবং বৈপিত্রেয় ভাই, অনুরূপ আপন ও বৈমাত্রেয় চাচা ও তাদের ছেলেদেরকে বঞ্চিত করবে। আর নারীর মূল তথা মা ও দাদী অথবা মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা শুধুমাত্র বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে বঞ্চিত করবে অন্যান্যদেরকে না।

৪. পার্শ্ববর্তী তথা ভাই-বোন কিংবা চাচারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে একজন অপর জনের সমতুল্য। অতএব, তাদের মধ্যে যে কেউ অনির্ধারিত অংশে

উত্তরাধিকারী হবে সে নিচের ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। নিচ দিক বা নিকট কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়। তাই বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বোনের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন ভাইয়ের ছেলে, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বৈমাত্রেয় বোনের কারণেও বঞ্চিত হবে। আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে পূর্বোক্ত চারজন ও আপন ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচা পূর্বোক্ত পাঁচজন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় চাচা পূর্বোক্ত ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। আপন চাচার ছেলে পূর্বোক্ত সাতজন ও বৈমাত্রেয় চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে পূর্বোক্ত আটজন ও আপন চাচার ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পুরুষের মূল তথা বাবা-দাদা ও ভাই-বোনদের উত্তরাধিকারীর কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. মূল উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল মূল উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। আর শাখা উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল শাখা উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী (ভাই-বোন ও চাচা ও তাদের সন্তানাদি) উত্তরাধিকারীদেরকে মূল, শাখা ও পার্শ্ববর্তী সবাই বঞ্চিত করতে পারবে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৬. **বঞ্চিত উত্তরাধিকারীরা মোট চার ভাগে বিভক্ত :**

   ক. যারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে কিন্তু তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করবে না যথা : মাতা–পিতা ও ছেলে-মেয়ে।

   খ. যাদেরকে বঞ্চিত করা হবে কিন্তু তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তারা হচ্ছে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা।

   গ. যারা না কাউকে বঞ্চিত করে আর না তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে, তারা হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী।

   ঘ. যারা অন্যকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকেও অন্যরা বঞ্চিত করে, তারা হচ্ছে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ।

৭. দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও আজাদকারিণী মহিলা সে দাস-দাসীর নিকটবর্তী প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশীদারের কারণে বঞ্চিত হবে।

৫. অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয়

মূল সংখ্যা নির্ণয় করা : সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয়করণ যার দ্বারা কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই মাসয়ালার অংক নির্দিষ্ট করা যাবে।

মূল সংখ্যা নির্ণয়করণের উপকারিতা : বন্টন করার মূল সংখ্যাগুলো জানা যাবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে সহজ হবে।

উত্তরাধিকারীদের অংকগুলোর তিন অবস্থা : প্রত্যেক অংকের মূল সংখ্যা উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন হবে :

১. যদি তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হয় তবে মূল সংখ্যা তাদের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে। এর নিয়ম হলো : পুরুষের জন্য দুই মহিলার সমান অংশ থাকবে। যেমন : কেউ এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলে অংকটি তিন দ্বারা সংঘটিত হবে : ছেলের জন্য দুই ও মেয়ের জন্য এক থাকবে।

২. যদি মূল অংকে নির্ধারিত এক অংশের অধিকারী ও অনির্ধারিত অংশের অধিকারীরা থাকে তবে মূল অংক নির্ধারিত এক অংশের উৎস দ্বারা হবে। যেমন : কেউ স্ত্রী ও ছেলে রেখে মারা গেলে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশ হিসেবে এক-অষ্টমাংশ তথা এক থাকবে এবং ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি সাত থাকবে।

৩. যখন মূল অংকে কেবল নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে অথবা তাদের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের প্রতি নিম্নলিখিত চারটি সম্বন্ধ অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে।

সম্বন্ধগুলো যথা : সদৃশ, পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক, অনুকূল জাত ও বৈপরীত্য মূলক। ফলটি হবে অংকের মূল সংখ্যা। আর নির্ধারিত অংশ যেমন : অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-অষ্টমাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ। এতে দুই সদৃশ্যের ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করা হবে, দুই পরস্পর অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে বড় সংখ্যাকে গ্রহণ করা হবে, অনুকূল জাত দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির অনুকূল সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ বা গুন দিতে হবে এবং বৈপরীত্য পূর্ণ দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির পূর্ণ সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ বা গুন দিতে হবে। যেমন : সদৃশ ($\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৩}$) অংশ পরস্পর

অনু প্রবেশ মূলক ($\frac{1}{2}, \frac{1}{6}$) অনুকূল মূলক (৮ ভাগে ১, ৬ ভাগের ১) ও বৈপরীত্য মূলক (২ ভাগের ৩, ৪ ভাগের ১) ইত্যাদি।

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের অংকের মূল সংখ্যা মোট সাতটি যথা : ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।

নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর কোন অনির্ধারিত অংশ প্রাপক না থাকে তবে স্বামী–স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের ওপর সেই অনুপাতে তা ফেরত আসবে। যেমন : স্বামী ও মেয়ে, অংকটি চার দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসেবে এক থাকবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি নির্ধারিত অংশ ও ফেরত হিসেবে মেয়ের জন্য থাকবে। এভাবেই অন্যান্যগুলো করতে হবে।

৬. পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন

পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাই তা মাল-সম্পদ হোক বা অন্য কিছু।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পন্থাসমূহ : পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে :

১. **সম্বন্ধ করণের পদ্ধতি : ইহা হলো :** প্রত্যেক অংশীদারের মূল অংক থেকে তার পাওনাকে তার প্রতি সম্বন্ধ করবে এবং সে অনুপাতে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে। যদি কেউ মরণকালে (স্ত্রী, মা ও চাচা) রেখে যায়, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১২০ হয়, তবে ১২ দ্বারা অংক হবে, স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ হিসেবে তিন থাকবে, মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চার থাকবে এবং চাচার জন্য অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে। ফলে অংকের সাথে স্ত্রীর তিনের সম্বন্ধ হচ্ছে এক চতুর্থাংশের। অতএব, সে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ হিসেবে ত্রিশ পাবে, মায়ের চারের সম্বন্ধ হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চল্লিশ পাবেন। চাচার পাঁচের সম্বন্ধ হচ্ছে এক-চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠাংশের। অতএব, তিনি সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠমাংশ হিসেবে পঞ্চাশ পাবেন।

২. ইচ্ছা করলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পূরণ বা গুন দিয়ে অত:পর গুনফলকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে তার সম্পত্তির অংশ বেরিয়ে আসবে। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে স্ত্রীর এক-চতুর্থাংশ হিসাবে প্রাপ্তিকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০) দ্বারা পূরণ বা গুন দিলে গুনফল (৩২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করলে তার অংশ হবে (৩০)। অনুরূপ বাকিগুলোতেও।

৩. ইচ্ছা করলে সম্পত্তিকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগ ফলকে অংকের প্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অংশ দ্বারা পূরণ করতে হবে। আর এ গুনফল হবে সম্পত্তি থেকে তার অংশ। অতএব, পূর্বোক্ত অংকে পূর্ণসম্পত্তি (১২০)-কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল (১০)-কে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশের সাথে পূরণ দিতে হবে। ফলে পূর্বোক্ত অংকে মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে চারকে দশ দ্বারা গুণ দিলে (১০ × ৪=৪০) ইহা সম্পত্তিতে মায়ের পাওনা অংশ। অনুরূপ বাকিরাও।

মিরাছ বন্টনের সময় যারা হাজির হবে তাদের কিছু দেওয়ার বিধান : মিরাছ বন্টনের সময় যদি মৃতের যারা উত্তরাধিকারী নয় তারা বা এতিমরা কিংবা যাদের কোন সম্পদ নেই তারা হাজির হয়, তাহলে মিরাছ বন্টনের পূর্বে তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব।

আল্লাহ তা"আলার বাণী

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .

আর যখন মিরাছ বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন ও এতিম এবং মিসকিনরা হাজির হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দান কর। আর তাদেরকে উত্তম কথা বল।

[সূরা নিসা : আয়াত-৮]

উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলোর প্রকার

উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলো তিন প্রকার

প্রথম : মাসয়ালা আদিলা : এ হলো প্রত্যেকের অংশের যোগফল মূল অংকের সাথে সমান হওয়া। যেমন : স্বামী ও সহোদর বোন যার অংক হবে ২ দ্বারা। প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে। সুতরাং দুই অংশ মূল অংকের সমান।

দ্বিতীয় : মাসয়ালা নাকিসা : এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংক থেকে কম হওয়া। যেমন : স্ত্রী ও বৈপিত্রেয়া বোন যার অংক হবে ১২ দ্বারা। স্ত্রীর জন্যে এক-চতুর্থাংশ (৩) ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২)। অতএব, যোগফল (৩ + ৫=৮) যা মূল অংক (১২)-এর চেয়ে কম।

তৃতীয় : মাসয়ালা 'আয়িলা : এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংকের চেয়ে বেশি হওয়া। যেমন : মা, বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ও সহোদর বোন দুইজন। অংক ৬ দ্বারা এর মধ্যে মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ। (১) বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ। (২) এবং দুই সহোদর বোনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ (৪)। যোগফল (৭) যা মূল অংক (৬) হতে অধিক। তাই মাসয়ালা 'আয়িলা (৭) দিয়ে।

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রকারভেদ

ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীরা পাঁচ প্রকার

১. শুধুমাত্র ফরজ অংশীদারগণ। এরা হলো : স্বামী-স্ত্রী, মা ও মায়ের সন্তানরা।

২. শুধুমাত্র আসাবা অংশীদারগণ। এরা হলো : ছেলেরা ও ছেলেদের ছেলেরা, ভাইয়েরা ও ভাইদের ছেলেরা ও চাচারা ও চাচাদের ছেলেরা।

৩. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং আবার আসাবা অংশীদারও যেমন : বাবা ও দাদা।

৪. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং অন্যের দ্বারা আসাবা। যেমন : বোনেরা মেয়েদের সাথে।

৫. যারা না ফরজ অংশীদার আর না আসাবা অংশীদার। এরা হলো আত্মীয়-স্বজন।

৭. 'আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া

'আওল বলে : অংশ বেড়ে যাওয়া ও হিস্সা কমে যাওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

অংশীদারগণের প্রতি অংশ বেড়ে যাওয়ার প্রভাব : মাসয়ালাতে 'আওল তথা অংশ বেড়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারের হিস্সা কমে যাবে।

'আওল হিসেবে মূল মাসায়ালাগুলোর প্রকার : মাসায়ালাগুলোর মূল সাতটি : (২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪)। 'আওল হওয়া না হওয়ার দিক থেকে মাসায়েলগুলোর মূল দুই প্রকার :

প্রথম : যেসব মূল মাসায়ালাগুলোতে 'আওল হবে না সেগুলো চারটি : (২, ৩, ৪, ৮)।

দ্বিতীয় : যেসব মূল মাসায়ালাগুলোতে 'আওল হবে সেগুলো তিনটি : (৬, ১২, ২৪)।

মূল মাসায়েল-এর 'আওলের শেষ

১. মূল (৬)-এর 'আওল হবে চারবার :

ক. সাত পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী এবং দুইজন সহোদর বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (৬) দ্বারা হবে এবং (৭) পর্যন্ত 'আওল তথা বেড়ে যাবে। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩) এবং দুই বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ- (৩+৪=৭)।

খ. আট পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : যদি একজন মহিলা তার স্বামী, একজন সহোদর বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোন রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে ৬ দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (৮)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), সহোদর বোনের জন্যে অর্ধেক (৩) এবং বৈপিত্রেয় দুই বোনের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৩+২=৮)।

গ. নয় পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা স্বামী, দুইজন সহোদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে পৌছবে (৯)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), দুই সহোদর বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) এবং দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৪+২=৯)

ঘ. দশ পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা স্বামী, মা, দুইজন সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা 'আওল হয়ে দাঁড়াবে (১০)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১), দুই সহোদর বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৪) এবং বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ- (৩+১+৪+২=১০)

২. মূল (১২)-এর 'আওল হবে তিনবার :

ক. তেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে ছেড়ে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা 'আওল তথা বেড়ে হবে (১৩)। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৬) অর্থাৎ–(৩+২+২+৬=১৩)।

খ. পনেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা (১২) দ্বারা হবে যা 'আওল হয়ে (১৫) দাঁড়াবে। স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং দুই মেয়ের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৮) অর্থাৎ–(৩+২+২+৮=১৫)।

গ. সতেরো পর্যন্ত 'আওল হবে। যেমন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা, দুইজন বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা বেড়ে হবে (১৭)। স্ত্রীর জন্যে এক-চতুর্থাংশ (৩), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), দুইজন বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৮) ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ (৪) অর্থাৎ–(৩+২+৮+৪=১৭)।

৩. **মূল (২৪)-এর 'আওল হবে মাত্র একবার (২৭) পর্যন্ত :** উদাহরণ : যদি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে (২৪) দ্বারা যা 'আওল হয়ে (২৭) পর্যন্ত দাঁড়াবে। স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪), মায়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪) ও দুই মেয়ের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ (১৬) অর্থাৎ– (৩+৪+৪+১৬=২৭)।

৮. রদ্দ-ফেরত দেওয়া

রদ্দ বলে : মাসয়ালার বাকি অংশ ফরজ অংশীদারদের মাঝে যারা হকদার তাদেরকে ফেরত দেওয়া। অর্থাৎ– পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ বাকি থেকে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা।

রদ্দ–এর কারণ : অংশে কম ও হিস্সায় বেশি হওয়া। ইহা 'আওলের বিপরীত।

রদ্দ–এর প্রভাব : রদ্দ তথা ফেরত দেওয়ার ফলে অংশীদারগণের হিস্সা বেড়ে যাবে।

যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে : স্বামী-স্ত্রী, বাবা ও দাদা ছাড়া সকল ফরজ অংশীদারগণের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে। এরা হলো আটজন : মেয়ে, ছেলের মেয়ে, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী-নানী, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

রদ্দ-ফেরত দেওয়ার শর্তাবলি : রদ্দ-ফেরত দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা-

১. ফরজ অংশীদারগণ যেন মাসয়ালা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত না করে ফেলে; কারণ পরিব্যপ্ত করলে বাকি কিছুই থাকবে না যা ফেরতযোগ্য হবে।

২. কোন আসাবা যেন না থাকে; কারণ আসাবা ব্যক্তি বাকি অংশ নিয়ে নেবে, যার ফলে বাকি থাকবে না যা রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে।

৩. ফরজ অংশীদারগণের উপস্থিত থাকা।

রদ্দ-ফেরতের মাসয়ালার অংক করার পদ্ধতি : যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকবে অথবা থাকবে না।

১. **যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন না থাকে তাহলে তাদের তিন অবস্থা :**

প্রথম অবস্থা : তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন থাকবে। যেমন : মেয়ে বা বোন। সে ফরজ ও রদ্দ-ফেরত হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকবে। যেমন : মেয়েরা বা বোনেরা। এদের সংখ্যা দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে। যেমন যদি মৃত ব্যক্তি তিনজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের সংখ্যা তিন দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা : তাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার উপস্থিত থাকবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক ফরজ অংশীদারকে তার ফরজ অংশ দিতে হবে। আর মাসয়ালা এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোন রদ্দ-ফেরত না থাকে। রদ্দ-ফেরতের সকল মাসয়ালার মূল (৬) দ্বারা হবে। অত:পর ফরজ অংশগুলো একত্র করতে হবে যা রদ্দের মূল দাঁড়াবে।

উদাহরণ : একজন মানুষ একজন মেয়ে ও একজন ছেলের মেয়ে রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা রদ্দের মাধ্যমে দাঁড়াবে (৪)। সুতরাং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৩) আর ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) এবং বাকি (২)। তাই মূল মাসয়ালার ফরজ অংশগুলোর মোট (৪)-কে রদ্দের মূল

মাসয়ালা করা হবে। অতএব, মেয়ে পাবে (৩) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে এবং ছেলের মেয়ে পাবে (১) ফরজ ও রদ্দ হিসেবে। এভাবে রদ্দের মাসয়ালা করতে হবে।

২. **যদি তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকে :** এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন তার ফরজ অংশ মূল সম্পত্তি থেকে নেবে। আর বাকি ফরজ অংশীদারগণ তাদের মাথাপিছু পাবে। চাই তারা একই শ্রেণীর হোক। যেমন : এক মেয়ে অথবা একাধিক যেমন : তিন মেয়ে অথবা একাধিক শ্রেণীর হোক যেমন : মা ও মেয়ে।

৯. আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ

আত্মীয়-স্বজন : ঐ সকল আত্মীয় যারা না নির্ধারিত অংশ দ্বারা আর না আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশ হিসেবে মিরাছ পায়।

আত্মীয়-স্বজনরা দু'টি শর্তে মিরাছ পাবে : (এক) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ না থাকা। (দুই) আসাবাগণ (যাদের মিরাছ অনির্ধারিত অংশ)-এরা না থাকা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

বস্তুত: যারা আত্মীয়-স্বজন, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে অবগত। [সূরা আনফাল :৭৫]

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছের নিয়ম : যারই সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে সে মিরাছ পাবে না যেমন : মা, মেয়ের ছেলে, বোনের মেয়ে। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজন। আর তাদের তিনটি দিক : পুত্রত্ব, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব।

আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ প্রত্যেককে তার স্থানে অবতারণ করে করতে হবে। তাই প্রত্যেক আত্মীয়কে যার দ্বারা সে প্রকাশ পায় তার স্থানে অবতারণ করতে

হবে। অত:পর যাদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাদের প্রতি সম্পত্তি বন্টন করে প্রত্যেকের জন্য যা হবে তাই প্রত্যেক আত্মীয় গ্রহণ করবে যেমন–

১. মেয়েদের সন্তান ও ছেলেদের মেয়েদের সন্তানরা তাদের মায়ের স্থানে।
২. ভাইদের মেয়েরা ও তাদের ছেলেদের মেয়েরা তাদের বাবাদের স্থানে। আর বৈমাত্রেয় ভাইদের সন্তানরা বৈমাত্রেয় ভাইদের স্থানে। আর সকল বোনদের সন্তানরা তাদের মাগণের স্থানে।
৩. মামারা ও খালারা এবং নানা মায়ের মতোই।
৪. ফুফুরা ও বৈমাত্রেয় চাচারা বাবার ন্যায়।
৫. মায়ের অথবা বাবার পক্ষের ঝরে যাওয়া নানী ও দাদীরা। যেমন : নানার মা ও দাদার বাবার মা। প্রথম জন নানীর স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।
৬. বাবা অথবা মায়ের পক্ষের ঝরে যাওয়া দাদাগণ। যেমন : বাবার মায়ের বাবা ও মায়ের বাবার বাবা। প্রথম জন মায়ের স্থানে আর দ্বিতীয় জন দাদীর স্থানে।

যে কেউ পূর্বে উল্লেখিত কোন একটি বিভাগের দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে যার দ্বারা সম্পৃক্ত হবে তারই স্থানে হবে যেমন : ফুফুর ফুফু ও খালার খালা ইত্যাদি।

১০. পেটের বাচ্চার মিরাছ

মায়ের পেটের বাচ্চাকে আরবিতে "হামল" ও "জানীন" বলা হয়।

পেটের বাচ্চা যখন মিরাছ পাবে : পেটের বাচ্চা মিরাছ পাবে যদি সে আওয়াজ করে মার পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে। আর উত্তরাধিকারকের মৃত্যুর সময় যেন মায়ের গর্ভে থাকে যদিও নুতফা তথা ভ্রূণ হোক না কেন। জন্মগ্রহণ আওয়াজ করে বা হাঁচি দিয়ে কিংবা কেঁদে ইত্যাদি ভাবে হতে পারে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার জন্মের সময় স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে চিল্লিয়ে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (রা:) ও তাঁর সন্তান (ঈসা (আ) ব্যতীত। (বুখারী হাদীস নং ৩৪৩১ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ২৩৬৬)

যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মাঝে পেটের বাচ্চাও আছে তাদের দুই অবস্থা

১. হয়তো পেটের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও বাচ্চার অবস্থা প্রকাশ পাবে, এরপর সম্পদ বন্টন করবে।

২. অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই বন্টন করবে। এ অবস্থায় পেটের বাচ্চার জন্য দুইজন ছেলে বা মেয়ের মিরাছের চেয়ে বেশি রেখে বাকিরা বন্টন করে নেবে। আর যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন সে তার অধিকার নেবে আর যা বাকি থাকবে তা তার হকদাররা গ্রহণ করবে। আর যাকে পেটের বাচ্চা বারণ করে না যেমন : দাদা তিনি তার পূর্ণ হক নিয়ে নেবে। আর যার হক কমিয়ে দেয় যেমন : স্ত্রী ও মা তারা কম নিবে। আর যে পেটের বাচ্চার কারণে বাদ পড়ে যায় তাকে কিছুই দেওয়া হবে না যেমন ভাইয়েরা। এর অংশ বিরত রাখতে হবে যতক্ষণ বাচ্চা না জন্মে।

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, দাদী ও সহোদর ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা (২৪) দ্বারা হবে। দাদীর জন্যে ষষ্ঠাংশ চাই স্ত্রীর পেটের বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে কিংবা মৃত্যু হোক। আর স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ যদি বাচ্চা জীবিত জন্মগ্রহণ করে এবং এক-চতুর্থাংশ মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করলে। স্ত্রীকে যা একিন তথা অষ্টমাংশ দেবে। আর সহোদর ভাই যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে বাকি অংশ পরে পাবে। আর যদি মৃত্যু জন্মগ্রহণ করে বাকি অংশ নেবে। তাই তার মিরাছ দেওয়া বিরত থাকবে।

১১. হিজড়াদের মিরাছ

খুনছা তথা হিজড়া বলা হয় যাদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ থাকে।

খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছের নিয়ম

১. খুনছার অবস্থা যদি অস্পষ্ট হয় তবে পুরুষের অর্ধেক ও মহিলার অর্ধেক মিরাছ পাবে।

২. যদি খুনছার অবস্থা প্রকাশ হওয়ার আশা করা যায় তবে তার বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা না করে ভাগ-বন্টন করতে

চায় তবে খুনছা ও তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সাথে ক্ষতি তথা কম দ্বারা কাজ সারতে হবে। আর বাকিগুলো আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ খুনছার অবস্থা পার্থক্য না করা যায়। এ অবস্থায় খুনছাকে পুরুষ ধরে কাজ করতে হবে। অত:পর আবার তাকে মহিলা হিসেবে ধরতে হবে। আর খুনছা ও তার সঙ্গের ওয়ারিছদেরকে দুই অংশের কমটা দিতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার অবস্থার পার্থক্য না করা পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে।

খুনছার অবস্থা জানার আলামত : খুনছার অবস্থা কিছু বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যেমন : দুই লিঙ্গের কোন একটি লিঙ্গ দিয়ে পেশাব অথবা বীর্য বের হওয়া। যদি দু' টি দিয়েই পেশাব বের হয় তবে যেটি দ্বারা আগে হবে সেটি ধরা হবে। আর যদি দুইটি হতে এক সাথে বের হয় তবে যেটি দ্বারা বেশি সেটি পরিগণিত হবে। এ ছাড়া যৌন আকর্ষণ , দাড়ি গজানো, মাসিক ঋতু, গর্ভবতী হওয়া, বুকের স্তন বড় হওয়া, স্তন থেকে দুধ বের হওয়া ইত্যাদি দ্বারাও বুঝা যাবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং ছোট একটি খুনছা সন্তান রেখে মারা গেল। পুরুষ হলে মাসয়ালা হবে (৫) দ্বারা : ছেলের জন্যে দুই, মেয়ের জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (২)। আর নারী হলে মাসয়ালা (৪) দ্বারা : ছেলের জন্যে (২), মেয়েরে জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (১)।

ছেলে ও মেয়ের জন্য খুনছা পুরুষ হলে ক্ষতি। তাই তাদেরকে পুরুষ মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। আর খুনছার জন্য সে নারী হলে ক্ষতি। তাই তাকে নারী মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। অত:পর বাকি অংশ বিরত রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট না হয়ে যায়।

১২. হারানো ব্যক্তির মিরাছ

হারানো ব্যক্তিকে আরবিতে 'মাফকূদ' তথা যার সর্বপ্রকার খবর বন্ধ হয়ে গেছে তাকে বলে। যার অবস্থা জানা যায় না, সে কি জীবিত আছে না মারা গেছে।

হারানো ব্যক্তির আহকাম

হারানো ব্যক্তির দুই অবস্থা : জীবিত অথবা মৃত্যু। আর প্রতিটি অবস্থার রয়েছে বিশেষ বিধান। তার স্ত্রীর বিধান, অন্যদের থেকে তার মিরাছ পাওয়ার বিধান, অন্যরা তার থেকে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান, অন্যরা তার সঙ্গে ওয়ারিছ হবার

বিধান। সুতরাং, যদি দুইটি অবস্থার কোন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য না পায় তবে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। সে সময়ের মধ্যে তালাশ করার অবকাশ পাওয়া যাবে এবং তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর ঐ সময় সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা বর্তাবে বিচারক সাহেবের ইজতিহাদের উপরে।

হারানো ব্যক্তির অবস্থাসমূহ

১. হারানো ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী রেখে গেছে এমন হয়, তাহলে তার অপেক্ষার সময় সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি তার ব্যাপারটা স্পষ্ট না হয়, তবে সে মারা গেছে বলে হুকুম জারি করা হবে এবং তার নিজস্ব সম্পদ বন্টন করা হবে। আর যে তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে তার সম্পদ থেকে যা তার জন্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও তার মৃত্যুর হুকুম জারির সময় যারা উপস্থিত উত্তরাধিকার ছিল তাদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কিন্তু যারা তার অপেক্ষার সময় মারা গেছে তারা ব্যতীত।

২. আর যদি হারানো ব্যক্তি উত্তরাধিকার হয় এবং তার সাথে কেউ না থাকে, তবে তার সম্পদ তার জন্য আটক করে রাখতে হবে যতক্ষণ না তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। অথবা অপেক্ষার সময় সীমা শেষ না হয়। আর যদি তার সাথে উত্তরাধিকারীরা থাকে ও বন্টন চায়, তবে কম দ্বারা তাদের সঙ্গে সমাধা করতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার ব্যাপারটা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি জীবিত থাকে তাহলে তার অংশ গ্রহণ করবে নতুবা তার হকদারের নিকট ফেরত দেবে।

অতএব, হারানো ব্যক্তিকে জীবিত ধরে মাসয়ালাটি ভাগ করতে হবে। অত:পর তাকে মৃত ধরে ভাগ করতে হবে। এরপর যে ব্যক্তি দু' টি অংকতে কম ও বেশি অংশ পাচ্ছে তাকে কমটা দিতে হবে। আর যে দু' টি মাসয়ালাতে সমান সমান অংশ পাচ্ছে তাকে তার সম্পূর্ণ অংশ দিতে হবে। আর যে শুধুমাত্র একটি অংকতে অংশ পাচ্ছে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আর বাকি অংশ আটকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারানো ব্যক্তির খবর সুস্পষ্ট না হয়।

১৩. ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাছ

এমন ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : ঐ সকল দল যারা একে অপরের উত্তরাধিকার কোন এক দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা গেছে। যেমন : ডুবে, পুড়ে, হত্যা, বিধ্বস্ত, গাড়ি বা বিমান কিংবা রেল গাড়ি দুর্ঘটনা ইত্যাদি।

ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের অবস্থাসমূহ : ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের পাঁচটি অবস্থা–

১. যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে পরে মারা গেছে তাহলে যে আগে মারা গেছে তার উত্তরাধিকার হবে এর বিপরীত হবে না।

২. যদি জানা যায় যে, তারা একই সঙ্গে সবাই মারা গেছে তবে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৩. যদি তাদের মৃত্যুর অবস্থা অজানা হয়, তারা কি পর্যায়ক্রমে মারা গেছে না একই সঙ্গে মারা গেছে। তাহলে কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৪. যদি জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু পর্যায়ক্রমে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে তাদের মাঝে কে পরে মারা গেছে অজানা হয় তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না।

৫. যদি জানা যায় কে পরে মারা গেছে কিন্তু ভুলে গেছে তাহলেও কেউ কারো মিরাছ পাবে না। পরের এই চারটি মাসয়ালাতে কেউ কারো মিরাছ পাবে না। এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের রেখে যাওয়া সম্পদ শুধুমাত্র যারা জীবিত আছে তারাই পাবে। আর যারা তাদের সঙ্গে মারা গেছে তারাও পাবে না।

উদাহরণ : দুই ভাই ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় এক সাথে মারা গেল। প্রথম ভাই তার স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে গেল। আর দ্বিতীয় ভাই রেখে গেল স্ত্রী ও ছেলে এবং মা রেখে গেল মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও চাচা। মৃতদের শুধু জীবিত ওয়ারিছদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে।

প্রথম মাসয়ালা (৮) দ্বারা : স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলে ও মেয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয় মাসয়ালা (৮) দ্বারা : স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে।

তৃতীয় মাসয়ালা (৬) দ্বারা : মেয়ের জন্যে অর্ধেক (২), ছেলের মেয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) আর বাকি (২) চাচার জন্যে আসাবা হিসেবে।

১৪. হত্যাকারীর মিরাছ

হত্যাকারীর মিরাছের বিধান : হত্যাকারীর দুই অবস্থা–

১. যে উত্তরাধিকার তার পূর্বসূরিকে একাকী বা অন্যদের সাথে সরাসরি শরিক হয়ে কিংবা কারণ হয়ে কোন অধিকার ছাড়া হত্যা করে সে তার মিরাছ পাবে না। আর কোন অধিকার ছাড়া হত্যা হলো : যাতে জামানত রয়েছে কিসাস অথবা দিয়াত কিংবা কাফফারা। যেমন : ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, ভুল করে হত্যা। আর যা ভুলে হত্যার হুকুমে আসবে যেমন : হত্যার কারণ ঘটানো, ছোট বাচ্চা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং পাগল ব্যক্তির হত্যা। সুতরাং ইচ্ছা করে হত্যাকারী মিরাছ পাবে না। এর হেকমত হলো : সে এর দ্বারা অগ্রিম মিরাছ পেতে চেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস তার সময়ের পূর্বে পেতে চায় তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিতে হয়। এ ছাড়া আরো কারণ হলো : হত্যার দরজা বন্ধকরণ এবং রক্তের হেফাজত করার জন্য; যাতে করে লোভ-লালসা রক্তপাতের কারণ না হয়। আর যদি হত্যা ইচ্ছা করে না হয় তবে তাকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

হত্যা যদি কিসাস স্বরূপ হয় বা দণ্ড হিসাবে কিংবা জীবন রক্ষা ইত্যাদি হয় তাহলে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

মুরতাদ ও কুড়ানো শিশুর মিরাছ

১. মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কারো উত্তরাধিকার হবে না এবং কাউকে সে উত্তরাধিকারও বানাবে না। যদি সে মুরদাত অবস্থায় মারা যায় তবে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

২. কুড়ানো শিশুর যদি কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে তার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে।

১৫. অমুসলিমদের মিরাছ

কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের মিরাছ পাবে না। অনুরূপ কোন কাফের মুসলিমের মিরাছ পাবে না; কারণ তাদের দ্বীন ভিন্ন এবং কাফের প্রকৃতপক্ষে মৃত আর মৃত ব্যক্তি কারো মিরাছ পায় না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন : মুসলিম কোন কাফেরকে উত্তরাধিকার বানাবে না এবং কাফেরও কোন মুসলিমকে উত্তরাধিকার বানাবে না। (বুখারী হাদীস নং ৬৭৬৪ ও মুসলিম হাদীস নং ১৬১৪)

অন্যান্য ধর্মের মানুষের মিরাছ

১. অমুসলিমরা একে অপরের মিরাছ পাবে যদি তাদের দ্বীন একই হয়। কিন্তু ভিন্ন হলে হবে না। কাফেররা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কেউ ইহুদি, কেউ খ্রিষ্টান আর কেউ অগ্নি পূজক ইত্যাদি।

২. ইহুদিরা একে অপরের মিরাছ পাবে। অনুরূপ খ্রিষ্টানরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। সেভাবে অগ্নি পূজকরাও একে অপরের মিরাছ পাবে। আর অন্যান্য বাকি ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ভিতরে একে অপরের মিরাছ পাবে। কিন্তু কোন ইহুদি খ্রিষ্টানের মিরাছ পাবে না। বাকিদের ব্যাপারটাও অনুরূপ।

যার বাবার পরিচয় নাই তার মিরাছ : জেনার সন্তান, স্বামীর পক্ষ থেকে লি'আন করত: মহিলার সন্তান। এরা ও তাদের বাবার মাঝে কেউ কারো মিরাছ পাবে না; কারণ এদের মধ্যে শরিয়তের বংশ সম্পর্ক নেই। তবে এদের ও মায়েদের এবং মায়ের আত্মীয়দের একে অপরের মাঝে মিরাছ পাবে। কেননা বাবার পক্ষের বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এবং মায়ের পক্ষের সম্পর্ক সুসাব্যস্ত।

উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা গেল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ ও ফেরত হিসেবে শুধু মায়ের জন্যে। আর ছেলের জন্যে কিছুই থাকবে না।

২. একজন অবৈধভাবে জন্মগ্রহণকারী সন্তান তার মা, বাবা ও ভাই রেখে মারা গেল। সব সম্পত্তি মায়ের জন্যে। আর বাবা ও ভাইয়ের জন্যে কিছুই নেই; কারণ এরা দুইজন সাধারণ আত্মীয় মাত্র।

১৬. নারীদের মিরাছ

ইসলাম নারীদেরকে সম্মান প্রদান করে তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে ও তাদের অবস্থার জন্য উপযুক্ত মিরাছ দান করেছে। আর তা হচ্ছে–

১. কখনো পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করে যেমন : বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনরা একত্রে হলে সবাই সমান সমান মিরাছ পায়।

২. আবার কখনো নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কিছু কম। যেমন : মা বাবার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানরা বা ছেলে ও মেয়েরা হলে মায়ের ষষ্ঠাংশ এবং বাবারও ষষ্ঠাংশ। আর যদি তাদের দু' জনের সাথে শুধুমাত্র মৃতের মেয়েরা হয় তবে মায়ের ষষ্ঠাংশ ও বাবার অংশও ষষ্ঠ এবং বাকিগুলো আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকলে বাবার জন্য।

৩. আর কখনো পুরুষ যা পাবে তার অর্ধেক পাবে। আর ইহাই বেশির ভাগ হয়ে থাকে।

নারীরা পুরুষদের পাঁচটি জিনিসে অর্ধেক : মিরাছ, সাক্ষী, আকিকা, দিয়াত ও আজাদ।

নারীর চাইতে পুরুষকে অধিক মিরাছ দেওয়ার হেকমত : ইসলাম পুরুষের প্রতি এমন কষ্ট ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে যা নারীর প্রতি করে নাই। যেমন : বিবাহের মোহর প্রদান, ঘরবাড়ি নির্মাণ, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ ও সগোত্রীয় কেউ হত্যা করলে তার দিয়াত প্রদান। কিন্তু নারীর প্রতি কোন প্রকার খরচ করা বাধ্য নয়। না নিজের প্রতি আর না সন্তানদের প্রতি।

আর ইসলাম এভাবেই নারীকে সম্মান প্রদান করেছে যার ফলে না আছে তার উপর কষ্টকর কোন শক্ত কাজ আর না আছে খরচাদির দায়িত্ব। বরং সবকিছুই উঠিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাঁধে। এরপরেও দিয়েছে তাকে পুরুষের অর্ধেক। নারীর সম্পদ বাড়ে আর পুরুষের সম্পদ নিজের ও স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি খরচ করে কমে। আর ইহাই হচ্ছে দুই শ্রেণীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা।

স্মরণ রাখুন! প্রতিপালক মহান আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি জুলুম করেন না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

১. আল্লাহর বাণী–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।

[সূরা নিসা : আয়াত-৩৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ করেন ইনসাফ, ইহসান ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে দেওয়ার জন্যে। আর নিষেধ করেন অশ্লীল ও নোংরা কাজ এবং সীমালঙ্ঘন করা থেকে। তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা স্মরণ করতে পার।

[সূরা নাহ্ল : আয়াত-৯০]

৭. বিবিধ

১. মহানবী ﷺ-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত

মহানবী ﷺ-এর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল পাঁচটি–

১. গণীমত, ২. ফাই, ৩. যাকাত, ৪. যিযিয়া, ৫. খারাজ।

১. গণীমতের মাল কেবল যুদ্ধে জয়ের ক্ষেত্রেই লাভ করা যেত। আরবের রীতি মতে গণীমতের মাল সেনাপতি পেত এক–চতুর্থাংশ। অবশিষ্ট মালে গণীমত যে যা কিছু হস্তগত করতে সক্ষম হতো সে তাই লাভ করত। কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– হে মুসলমানগণ! জেনে রাখ, যে মালে গণীমত তোমাদের হস্তগত হবে, তার এক–পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য, প্রতিবেশী আত্মীয়দের জন্য, এতীমের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। (সূরা আনফাল) এরপর কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক গণীমতের মাল বিতরণ করা হতো।

২. যুদ্ধশেষে অথবা বিনা যুদ্ধে যে স্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ফাই হিসেবে গণ্য। এই মাল সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত না হয়ে বরং সরাসরি সম্পত্তি হিসেবে দেশের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহার করা হয়।

৩. যাকাত শুধু মুসলমানদের উপরই ফরজ। যাকাত চারটি শ্রেণীতে আদায় করা হতো। ১. টাকা ২. ফল ও উৎপাদিত শস্য ৩. গৃহপালিত পশু (ঘোড়া ছাড়া ৪. তেজারতের মাল-আসবাব। দু'শ দেরহাম চান্দি, বিশ মিছকাল সোনা এবং পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ধরা হতো না। যাকাতের অর্থ খরচ করা হতো আটটি খাতে।

   ১. ফোকারা ২. মাসাকীন ৩. নও মুসলিম ৪. গোলাম– যাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে হবে। ৫. ঋণগ্রস্ত ৬. মুসাফির ৭. যাকাত আদায়কারীর বেতন ৮. অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে।

   যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেবে।"

৪. **যিযিয়া :** অমুসলিম প্রজাদের কাছে থেকে তাদের হেফাজতের ও জিম্মাদারীর বিনিময়ে এই কর তাদের নিকট হতে আদায় করা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জমানায় প্রত্যেক সামর্থ্যবান বালেগ পুরুষ হতে এক দীনার আদায় করার হুকুম ছিল।

৫. **খারাজ :** মুসলিম কৃষকদের নিকট হতে মালিকানা হকের বিনিময়ের জমিনের উৎপাদিত ফসলের যে নির্দিষ্ট অংশ উভয়পক্ষের সমর্থিত চুক্তির ভিত্তিতে আদায় করা হতো, একে বলা হয় খারাজ। যিযিয়া এবং খারাজের অর্থ সৈনিকদের বেতন ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় ও যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা হতো।

তথ্য : সীরাতুন্নবী : শিবলী নোমানী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা : ৫২৩

২. মহানবী ﷺ-এর রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা

মহানবী ﷺ-এর বয়স ষাট বছর অতিক্রম না করতেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বেড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হল। একে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন বিভাগ খুলে দিয়ে বিভিন্নজনকে তা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে যে সমস্ত কাজের আঞ্জাম তিনি নিজে দিতেন অর্থাৎ যে সমস্ত বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে তার নিকট ছিল তা হচ্ছে–

১. প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ,
২. মুয়াযযিন নির্বাচন,
৩. ইমাম নির্ধারণ,
৪. যাকাত আদায়কারী নিয়োগ,
৫. যিযিয়া আদায়কারী নিয়োগ,
৬. ভিন্ন ধর্মের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা,
৭. মুসলমানদের মধ্যে জমি বণ্টন করা,
৮. সেনাপতি নিয়োগ,
৯. মামলা মোকদ্দমা ফায়সালা করা,
১০. গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা,
১১. বেতন নির্ধারণ করা,
১২. অপরাধীর শাস্তি বিধান জারী করা,
১৩. নও মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা,
১৪. ফতোয়দান,
১৫. রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান,
১৬. কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন বিধান করা,
১৭. গভর্নর ও ওয়ালী নিয়োগ করা।

এছাড়া তিনি বদর, ওহুদ, খায়বার, ফতেহ মক্কা ও তাবুকের যুদ্ধ তিনি নিজেই ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান। খেলাফতে ইলাহিয়ার এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক আরাম আয়েশের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবসর তাঁর কখনও মিলত না।*

বিচার বিভাগ : বিভিন্ন মোকদ্দমার ফয়সালা যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করতেন তবুও কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে আবু বকর (রা), ওমর (রা) ওসমান (রা), আলী (রা) আবদুর রহমান (রা), মায়াজ (রা) এবং উবাই বিন কায়াব (রা) বিচার কাজ পরিচালনা করতেন।

---

* তথ্য : সীরাতুন্নবী, শিবলী নোমানী, ২য় খন্ড, তাজ কোম্পানী, ঢাকা, পৃঃ ৫১৬-২০

৩. মহানবী ﷺ-এর সচিবালয়

রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে মহানবী ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী জনকল্যাণমূলক সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে ছিল একটি সুসংগঠিত সচিবালয়। সচিবালায়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

বিভাগ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১. রাষ্ট্রপ্রধানে ব্যক্তিগত বিভাগ–	১. হানযালা ইবন আল রবী (রা)। রাসূল ﷺ-এর একান্ত সচিব। ২. শুরাহবিল ইবন হাসান (রা) সচিব। ৩. আনাস ইবন মালেক (রা)।[১]
২. সীল মোহর বিভাগ–	১. মুকার ইবন আবি ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীলমোহর করার আংটিটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত থাকত।[২]
৩. অহী লিখন বিভাগ–	১. যায়েদ ইবন সাবিত (রা), ২. আবু বকর সিদ্দীক (রা), ৩. ওমর ফারুক (রা), ৪. ওসমান (রা), ৫. আলী (রা), ৬. উবাই ইবন কাব (রা), ৭. আব্দুল্লাহ ইবন সারাহ (রা), ৮. যোবায়ের ইবন আল আওয়াম (রা), ৯. খালেদ ইবন সাঈদ (রা), ১০. আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়া (রা), ১১. খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা), ১২. মুগীরা ইবন শোবা (রা), ১৩. মুআ'বিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)।
	অহী লিপিবদ্ধ করার কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[৩]

---

১. তথ্য ঃ আল জাহশিয়ারী ; কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুতবাত, কায়রো, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১২

২. তথ্য ঃ সিরাজাম মুনিরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৭

৩. তথ্য ঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, তফসীরে নূরুল কুরআন, ১ম খন্ড আল বালাগ পাব ঃ ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৭

৪. পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ– ১. যায়েদ ইবন সাবিত আনসারী (রা), ২. আব্দুল্লাহ ইবন আকরাম (রা) শেষের দিকে মুআ'বিয়া (রা) ও এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[১]

৫. অভ্যর্থনা বিভাগ– ১. আনাস ইবন মালেক (রা), ২. বারাহ্ (রা)।

নবুওতের প্রথম হতেই বেলাল (রা) মেহমানদারীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৬. দাওয়াত ও শিক্ষা বিভাগ– এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রাসূল ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাহাবীগণও যথাযথ দায়িত্ব পালন করতেন। কুরআনে হাফিজ ও কারীদিগকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো।

৭. জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বিভাগ–

১. মুগীর ইবন শোবা (রা) ২. হাসান ইবন নুসীরা (রা)।[২]

৮. প্রতিরক্ষা বিভাগ– মদীনা রাষ্ট্রের কোন বেতনভোগী নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে যুদ্ধের মাঠে উপস্থিত হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। প্রয়োজনের সময় তিনি বিভিন্ন সাহাবীগণকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন সময় মনোনিত কয়েকজন সেনাপতির নাম নিম্নরূপ–

১. আবু বকর সিদ্দীক (রা), ২. ওমর ফারুক (রা), ৩. আলী মুর্তজা (রা), ৪. যোবায়ের ইবন আল আওয়াম (রা), ৫. আবু ওবায়দা ইবন যাররাহ (রা), ৬. উবাদা ইবন সামেত (রা), ৭. হামজা ইবনে মুত্তালিব (রা), ৮. মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা), ৯. খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা), ১০. আমর ইবনুল আস (রা), ১১. ওসামা ইবন যায়েদ (রা)।

---

১. তথ্য ঃ সিরাজুম মুনিরা, ১৪০৪ হিজরী, পৃঃ ৪৫

২. তথ্য ঃ সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৪০৫ হিজরী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ও অশ্ব চালনা শিখতেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশলও তাদের শিখানো হতো।[১]

৯. নিরাপত্তা বিভাগ– মদীনা রাষ্ট্রে নিয়মিত কোন পুলিশ বাহিনী ছিল না। স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবী ও বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল হতে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হতো। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবন সায়াদ (রা)।[২]

১০. জল্লাদ বিভাগ– প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের শিরচ্ছেদ করার কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে যোগদান করলেন যোবায়ের (রা), আলী (রা), মেকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা), মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (রা), আসেম ইবন সাবিদ (রা) এবং দাহহাক ইবন সুফিয়ান কেলবী (রা)।[৩]

১১. বিচার বিভাগ– এই বিভাগের প্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে। প্রাদেশিক কিংবা মদীনায় তিনি নিজেই বিচারপতিদের নিয়োগ দান করতেন। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আব্দুর রহমান ইবন আওফ, মুয়াজ ইবন জাবাল, আবু ওবায়দা ইবন জাররাহ, উবাই ইবন কাব রাসূল ﷺ কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৪]

১২. হিসাব সংরক্ষণ ও অর্থ বিভাগ (বায়তুল মাল)–

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারকি করতেন। মুয়ানকী ইবন আবি ফাতিমাও এ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৫]

---

১. তথ্য : এ, কে, এম, নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ১৬
২. তথ্য : এ, কে, এম, নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ঢাকা ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ২৬
৩. তথ্য : সীরাতুন নবী : শিবলী নোমানী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা : ৫১৬-৫২০
৪. তথ্য : মাওলানা আমিনুল ইসলাম, আল বালাগ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ২৩
৫. তথ্য : বুখারী ও মুসলিম শরীফ। আল-জাহশিয়ার কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুত্তবাত, কায়রো, ১৯৩৮ পৃষ্ঠা-১২]

১৩. যাকাত ও সাদকাহ্ বিভাগ- যাকাত ও সাদাকাহ্ বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হতো তার হিসাব কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন যোবাইয়ের ইবন আল আওয়াম ও যুহাহির ইবন আল সালাত (রা)। অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র আদায়কারী হিসেবে যথাক্রমে ছিলেন।

১. ওমর-মদীনা, ২. আবু উবায়দা ইন জাররাহ্-নাজরান, ৩. আমর ইবনুল আস-বনু ফাজারা, ৪. আদী ইবন হাতেম তাই-বনু তাই ও বনু আসাদ, ৫. আব্দুল্লাহ্ ইবন লাইতাই-বনু জাবয়ান, ৬. উব্বাত ইবন বিশর-বনু সুলাইম ও বনু মাজায়না, ৭. দাহ্হাক ইবন সুফিয়ান-বনু কিলাব, ৮. আবু জাহ্‌ম ইবন হুজায়ফা-বনু লাইস, ৯. বোরায়দা ইবন হোসাইন-বনু গেফার ও বনু আসলাম, ১০. বসুর ইবন সুফিয়ান-বনু কাব।

এ ছাড়া আরও কতিপয় আদায়কারী ছিলেন।

প্রয়োজনে আদায়কারীদিগকে পারিশ্রমিক দেয়া হতো।[১]

১৪. জনস্বাস্থ্য বিভাগ- নাগরিকদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য এ সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হারিস ইবন সালাহ্ ও আবি রাদার পুত্রকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা বায়তুল মাল হতে ভাতা পেতেন। লোকেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেতেন।[২]

১৫. শিক্ষা বিভাগ- শিক্ষাবিভাগ ছিল রাসূল (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আকরাম ইবন আবুল আকরাম (রাঃ)-এর বাড়িতে মুসলিম উম্মার প্রথম শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞানদানের জন্য আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ ইবনুল

---

১. তথ্য : মাওঃ মোঃ আমিনুল ইসলামঃ মাসিক আল বালাগ, ৪র্থ বর্ষ ৫মে সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০

২. তথ্য : সিরাজুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৩

আস (রা)-কে নিয়োগ করা হয়েছিল। উম্মাহাতুল মোমেনীনরা বিশেষ করে আয়েশা (রা) শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁদের গৃহগুলো ছিল নারী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র।[১]

১৬. পরিসংখ্যান বিভাগ– রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার আদমশুমারী করেছিলেন এবং রেজিষ্টার বইতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন।[২]

১৭. কৃষি ও বন বিভাগ– বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যার নিকট চাষাবাদযোগ্য জমি থাকবে অবশ্যই তাতে তার চাষাবাদ করা উচিত। অনথ্যায় তা অন্য ব্যক্তিকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা উচিত। কুতায়বা ইবন সাঈদ আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করে কিংবা কোন ফসল চাষাবাদ করে আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষে সাদকা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩]

১৮. নগর প্রশাসন বিভাগ– নগর প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল শহরে নগরে যাতে করে কোন প্রকার অবৈধ প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয় না হয় তা নিশ্চিত করা। ওমর (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৪]

---

১. তথ্য : নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, পৃষ্ঠা-১৬ তথ্য: মাওলানা মুশহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ, এস, এম, ওমর আলী অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৬।

২. তথ্য : মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মহান রাষ্ট্রনায়ক : হযরত রসূলে করিম ﷺ আল বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৪

৩. তথ্য : বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৯৫, হাদীস নং ২১৬৩

৪. তথ্য : সিরাজুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৬

১৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ- রাসূল ﷺ প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাসূল ﷺ-এর সময় মদীনা রাষ্ট্রে ছিল ৮টি ওয়ালী শাসিত প্রদেশ।

প্রদেশের নাম	প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ
১. মদীনা	১. রাসূল ﷺ স্বয়ং
২. মক্কা	২. ইত্তাব ইবন উসাইদ (রা)
৩. নাজরান	৩. ক. আমর ইবন হাজাম (রা)
	খ. আলী (রা)
	গ. আবু সুফিয়ান (রা)
৪. ইয়েমেন	৪. বায়ান ইবন সামান (রা)
৫. হাজরা মাউত	৫. যিয়াদ ইবন লবীদুল (রা)
৬. আম্মান	৬. আমর ইবনুল আস (রা)
৭. বাহরাইন	৭. আলী ইবন হাযরাম (রা)
৮. তাইমা	৮. ইয়াজিদ ইবন আবু সুফিয়ান (রা)
৯. জুন্দে আলজানাদ	৯. জাবাল (রা)

প্রাদেশিক প্রশাসন ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের উপর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন 'আমির'। মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে এরূপে ২২টি আমিল শাসিত অঞ্চল ও গোত্র ছিল। রাসূল ﷺ স্বয়ং আমিলদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তালিম দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে প্রেরণ করতেন।[১]

---

১. তথ্য : ক. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্র নায়ক: হযরত রাসূলে করিম, আল বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২০।

খ. মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ, এস, এম, ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৫।

গ. এম, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, অক্সফোর্ড, ১৯৬২, পৃঃ ৩৫৭

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই সমূহ		
১.	THE HOLY QURAN (তিন ভাষায়)	১০০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	রাসূলুল্লাহ (স.) হাসি কান্না ও জিকির	২১০
৪.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	১৫০
৫.	রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	১৪০
৬.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	১৫০
৭.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	৭০
৮.	জান্নাতী ২০ বিশ রমণী	২০০
৯.	জান্নাতী ২০ সাহাবী	২০০
১০.	রাসূল (স.) সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	১৪০
১১.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	২২০
১২.	রাসূল (স.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা করতে যেভাবে	২২৫
১৩.	রাসূল (স.) জানাযা পড়াতেন যেভাবে	১৩০
১৪.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	২২৫
১৫.	কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা	২২৫
১৬.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	১৫০
১৭.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস	৩০০
১৮.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
১৯.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
২০.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণ ভিত্তিক জবাব	৬০
২১.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার -আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
২২.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
২৩.	আল কুরআন ও আল্লাহর বাণী	৫০
২৪.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদে কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
২৫.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ	৪৫
২৬.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
২৭.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
২৮.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০

২৯.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা	৫০
৩০.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য	৫০
৩১.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩২.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৩.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.) নামায	৬০
৩৪.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৩৫.	ধর্মগ্রন্থ সমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৩৬.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
৩৭.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৩৮.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৩৯.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪০.	পোষাকের নিয়মাবলী	৪০
৪১.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪২.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.)	৫০
৪৩.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৪৪.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
৪৫.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৪৬.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৪৭.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৪৮.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৪৯.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫০.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৫১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
৫২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০
৫৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৫৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৫৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
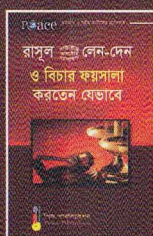
পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫